প্রকাশক :
শ্রীপ্রেমময় মজুমদার
৪৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৭ আশ্বিন, ১৩৬৭

মুদ্রক :
শ্রীবিভাষকুমার গুহঠাকুরতা
ব্যবসা ও বাণিজ্য প্রেস
৯।৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা :
শ্রীকমল শেঠ

বেঁধেছেন :
সারদা বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১০, সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

আমার শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক

শ্রীবিভূতি চৌধুরী

শ্রীচরণেষু

নিবেদন

কলিকাতা এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় তিন বছরের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের পাঠক্রমে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের অধ্যয়ন আবশ্যিক বলে নির্দেশ করে বাঙালী মাত্রের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থটি ছাত্রদের প্রতি দৃষ্টি রেখে লেখা।

গ্রন্থটিকে তথ্যভারে ভারাক্রান্ত করি নি, অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ কোন তথ্য যাতে বাদ না পড়ে সে-দিকে লক্ষ্য রেখেছি। পূর্বসূরীদের নিকট থেকে তথ্য সঙ্কলিত হয়েছে। বিষয়-বিন্যাস, যুগ-বিভাগ প্রভৃতি ব্যাপারে একালের সাহিত্যের ইতিহাসের আলোচকগণের মধ্যে মতৈক্য আছে; সে বিষয়েও বর্তমান লেখকের মৌলিকতার দাবি নেই। তবে পূর্বাপর ঐতিহাসিক যোগসূত্র অনুসন্ধানে এবং ঐতিহাসিক সমস্যাগুলি তুলে ধরবার চেষ্টায় লেখকের স্বাধীন ভাবনার পরিচয় মিলতে পারে।

রবীন্দ্রপর্ব পর্যন্ত ইতিহাসের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের (অর্থাৎ ১৯৩০-য়ের পরবর্তী পর্বের) আলোচনা সে তুলনায় অনেক সংক্ষিপ্ত। সাম্প্রতিক কালের দিক্‌দর্শনের চেষ্টা মাত্র এ-গ্রন্থে আছে; ঘটমান কালের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার ভার কিছু ভবিষ্যৎকে দিতে হবে।

আলোচনার সংক্ষিপ্ততা সবক্ষেত্রে সাহিত্যিকের গুরুত্বের যথার্থ প্রতিফলন নয়। ইতিহাসে কোন সাহিত্যিক কতটা প্রাধান্য পাবেন তার মাপকাঠি দুটি। এক। শিল্পী হিসেবে তাঁর সাফল্যের পরিমাণ। দুই। ইতিহাসের ধারায় তাঁর প্রভাবের গুরুত্ব। বিহারীলালের ন্যায় কোন কোন লেখক দ্বিতীয় কারণেই বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। কিন্তু হেম-নবীনাদির ন্যায় কোন কোন কবি এবং অনেক নাট্যকার এর কোন সর্ত পালন না করেও শুধুমাত্র রচনার প্রাচুর্য এবং পূর্বকালে আহরিত খ্যাতির জোরে ইতিহাসের বিস্তৃত জমি অধিকার করে আছেন। শিল্পোৎকর্ষ সত্ত্বেও অনেক গীতিকবি তার সামান্যতম অংশেও আসন পান নি। কিন্তু এই নীতি অনুসরণ করা সম্ভব হয় নি। আন্তরিক দ্বিধা সত্ত্বেও প্রথার প্রতি অনুগত থেকেছি; ছাত্রদের এই সমস্যায় টেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত মনে করি নি।

এই গ্রন্থ রচনায় বন্ধুবর অধ্যাপক শঙ্খ ঘোষ, অধ্যাপক নিরঞ্জন চক্রবর্তী, অনুজপ্রতিম অধ্যাপক কুমারেশ চক্রবর্তী, অধ্যাপক অচিন্ত্য ভট্টাচার্য,

অধ্যাপক দেবী মিশ্র আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছেন। অধ্যাপিকা জ্যোৎস্না গুপ্ত পরিকল্পনায়, তথ্যসংগ্রহে এবং গ্রন্থরচনায় আদ্যন্ত সাহায্য করেছেন। বন্ধুবর চিন্ময় মজুমদার মুদ্রণ প্রভৃতির ব্যাপারে বিশেষ যত্ন নিয়েছেন।

সিটি কলেজ

ক্ষেত্র গুপ্ত

বিষয়-সূচী

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নব মূল্যায়ন।
কুমুদরঞ্জনের কাব্যবিচার।
বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয়)
মধুসূদনের কবিআত্মা ও কাব্যশিল্প।

প্রথম অধ্যায়

॥ ভূমিকা ॥

পূর্বতন সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হল। জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন এল, পরিবর্তন এল চিন্তাধারায়, সাহিত্যিক সৃষ্টিতেও। এই নবীনের রথে পশ্চিম পৃথিবীর পতাকার লেখা নিশ্চয়ই দৃষ্টি এড়ায় না। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পিছনেও প্রায় আটশত বৎসরের সাহিত্যিক ঐতিহ্য আছে বাংলাদেশের। সে সাহিত্যের পরিমাণ যেমন সামান্য নয়, তেমনি মূল্যও একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়। একালের সাহিত্যের পরিচয় দেওয়ার আগে সেকালের গৌরচন্দ্রিকা তাই করা প্রয়োজন। একথা মনে রাখবার মত যে কোন জাতির ইতিহাসে কোন যুগে যত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনই ঘটুক না কেন পুরানো কালের সঙ্গে সব যোগ সে হারিয়ে ফেলে না। পুরানো বলেই তা শেলেটের লেখার মত সহজে মুছে ফেলবার নয়।

পাল-পর্ব থেকে আরম্ভ করে ইংরেজ বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা-দেশের যে অর্থনৈতিক কাঠামো তার বিশেষ পারিভাষিক নাম হল সামন্তবাদ। গ্রামকে কেন্দ্র করে আর কৃষিকে আশ্রয় করেই এর বিকাশ। এই অবস্থায় বাংলাদেশের গ্রামগুলি হয়ে পড়েছিল আত্ম-নির্ভরশীল আত্মসংভরণদক্ষ এবং সম্পূর্ণ আত্মকেন্দ্রিকও। গ্রামের প্রয়োজন গ্রামেই মিটত, বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল সংকীর্ণ, সুযোগ-সুবিধা সংকীর্ণতর।

এই জাতীয় অর্থনীতি বাংলাদেশে এক বিশেষ ধরনের সমাজব্যবস্থার জন্ম দিল। গ্রাম-প্রধান ও কৃষিনির্ভর এই ব্যবস্থায় ধর্মের প্রভাব সঞ্চারিত ছিল জীবনের গভীর অন্তর্দেশ পর্যন্ত। তার মধ্যে কুসংস্কারের পরিমাণও নেহাৎ সামান্য ছিল না। এই সমাজে মানুষের ব্যক্তিসত্তার মূল্য স্বীকৃতি পেত না। বংশগত মাপকাঠির সম্মুখে ধর্মীয় কুসংস্কারের মোহে ব্যক্তিত্বের চরম লাঞ্ছনা সহানুভূতি আকর্ষণ করত না।

এই একই সমাজব্যবস্থা বাংলার বুক জুড়ে দীর্ঘকাল জয়ধ্বনি তুলেছে। রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন হয়েছে, বক্তিয়ারের আক্রমণে বাংলাদেশের হিন্দু-প্রাধান্য বিলুপ্ত হয়েছে, অনেক রক্তপাত, অনেক হানাহানি বাংলাদেশের মাটিকে সিক্ত করেছে, আকাশ বাতাসকে করে তুলেছে ক্রন্দনমুখর; কখনও আবার বর্গীর বর্বর আঘাতে গ্রাম-বাংলা বিধ্বস্ত হয়েছে—কিন্তু মূল অর্থনৈতিক কাঠামোকে সেই সব ঘটনা পারে নি আদৌ পরিবর্তিত করতে। তাই পারে নি সমাজব্যবস্থার মধ্যেও কোন মৌল পরিবর্তন আনতে। সেই কৃষিপ্রধান ও আত্মকেন্দ্রিক গ্রামীণ ব্যবস্থা, চিন্তার জগতে সেই ধর্মের একচ্ছত্র আধিপত্য, রাজায়-প্রজায় সেই একই ধারার সম্বন্ধ। সেই উচ্ছ্বাসপ্রবণ, পরিহাসরসিক, প্রণয়ানুরাগী বাঙালীচরিত্র, জীবনচর্চার সেই একই পথে পরিক্রমা—খণ্ডিত জীবনবোধ, সংকীর্ণ পরিপ্রেক্ষিত আর প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে বিক্ষত মানুষের ক্রন্দনরোল।

ইংরেজ আগমনের পূর্বে এই সমাজব্যবস্থার মূল ভিত্তি অর্থনীতিতে কোন আঘাত পড়ে নি। কখনো কখনো রাষ্ট্রনৈতিক সংঘর্ষে গ্রাম বিপর্যস্ত হয়েছে, দল বেঁধে এক গ্রামের মানুষ গ্রামান্তরে পালিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সংঘর্ষের ভারকেন্দ্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবার তারা ফিরে এসেছে, পূর্বতন জীবনযাত্রার কোন মৌল পরিবর্তন ঘটে নি। এ বিপর্যয় অনেকটা প্রাকৃতিক বিপদপাতেরই মত।

তাই সাধারণ ভাবে বলতে পারা যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ আটশত বৎসর একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পৌনঃপুনিকতার যুগ। ফলে মনন ও মানসসৃষ্টির দিক থেকেও এই যুগ স্বভাবতই একই সুর ধারণ ও বহন করবে।

সেকালীন বাংলা সাহিত্যের মূল লক্ষণগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

এক ॥ সাহিত্যে অনুকরণ ধর্ম ॥ একালের সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল বৈচিত্র্যের অভাব। মোটামুটি দুটি ধারায়ই বাংলা সাহিত্য চলেছে—পাঁচালী কাব্যের ধারা আর পদাবলী। একের পর এক কবির দল ঐ কাব্য-কাঠামোকেই অনুসরণ করেছেন দ্বিধাহীন ভাবে। ভাববস্তুতেও বৈচিত্র্যের অভাব লক্ষণীয়। হয় মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, না হলে রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ। একই কাহিনী, একই ধরনের পয়ার আর ত্রিপদীতে একই ঢঙে বলা। পদাবলীর ক্ষেত্রেও

অন্তহীন, একঘেয়েমী। অবশ্য চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম বা ভারতচন্দ্রের মত বড় কবি এই বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে বিশিষ্টতা আনতে কতকাংশে সমর্থ হয়েছেন। তবে এরূপ উদাহরণ বেশি নেই। তেমনি মুসলমানী রোমান্টিক কাব্য এবং পূর্ববঙ্গ-গীতিকার ন্যায় প্রথাবিরোধী রচনার আয়োজনও সমগ্রের তুলনায় নেহাৎ সামান্য।

দুই ॥ ধর্মের প্রভাব ॥ ধর্মকে কেন্দ্র করে সে-যুগের অধিকাংশ সাহিত্য রচিত; স্পষ্টত ধর্মমত প্রচারই এর প্রধানতম অংশের প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য। মঙ্গলকাব্যে নানা লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তন এবং পূজাপ্রচারই লক্ষ্য; বৈষ্ণবপদাবলীর প্রেমগীতিও ভক্ত কবির লীলাকীর্তন, প্রেমরস আস্বাদন—এ কবিতা তাই "বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য"। বাঙ্গালীর ধর্ম-প্রাণতার আধিক্য মহামানব রামচন্দ্র ও কৃষ্ণকে কাব্যানুবাদ কালে ভগবানে রূপান্তরিত করেছে। এমন কি ভারতচন্দ্রের একান্ত লৌকিক প্রণয়কাব্যও কালীমাহাত্ম্যকীর্তনের নামাবলীতে আবৃত। সেকালীন বাংলা সাহিত্যে এই প্রবণতার দুটি মাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিদের রচিত আখ্যায়িকা কাব্যে এবং মৈমনসিংহ অঞ্চলে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রেমগীতিকায়।

তিন ॥ ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য ॥ বাঙালীর সাধনভজনে ইন্দ্রিয়ালু ভাবাবেগের প্রাধান্য সবাই লক্ষ্য করেছেন। বাংলার সেকালীন সাহিত্যেও মননের স্থান সংকীর্ণ, হৃদয়াবেগেরই প্রাধান্য। ভক্তিতে কিংবা প্রীতিতে যেখানে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার বেশি সুযোগ পেয়েছে সেখানেই বাঙালী সার্থক ভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছে।

চার ॥ কবিতার একাধিপত্য ॥ আদি ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সবটাই কবিতার আয়োজন। জাতীয় চরিত্রে ভাবোচ্ছ্বাসের অতিরেকই সম্ভবত এর প্রধান কারণ। এমন কি চৈতন্যভাগবতের মত সমাজসচেতন জীবনীগ্রন্থ বা চৈতন্যচরিতামৃতের মত তত্ত্ববহুল দার্শনিক গ্রন্থও পয়ারে রচিত হয়েছে। সাহিত্যে গদ্যের ব্যবহার সমকালীন অন্য কোন ভারতীয় ভাষায় এতটা অচলিত ছিল না।

পাঁচ ॥ জীবনমুখিতা ॥ ধর্মকে আশ্রয় করে সে-যুগের বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠলেও সে-ধর্ম এমনই ধর্ম যা মানবতার প্রকাশে বাধা দেয় নি। "বাংলা-দেশে এই মানবের মধ্যেই সাধনা, প্রেমই হল ধর্মের প্রাণ। এই সব কথাই বাংলার যোগমতে, বাংলার তান্ত্রিক সাধনায়, বাংলার প্রাকৃত

শানে চলে আসছে। বাংলাদেশের সাধনার এইটেই প্রাণবস্তু।…এই স্বাধীনতার জন্য বাংলাদেশকে অন্য প্রদেশের সনাতনপন্থীরা কোনদিনই সুচক্ষে দেখতে পারেন নি। অথচ বাংলার বাউলদের এই সব হল সাধনার মূল তত্ত্ব। বাংলাতে বৌদ্ধধর্ম এই সবের সঙ্গে মিশে গিয়ে মহাযান হয়ে দাঁড়াল। প্রেমের সাধনায় অনেক দুঃখ অনেক বিপদ আছে, তবু বাংলা তাকেই স্বীকার করেছে, তবু শুষ্ক আচার ও জ্ঞানের পথে যায় নি।" —[ক্ষিতিমোহন সেন। বাংলার সাধনা]। বৈষ্ণবপদাবলীর ভগবত প্রেম-লীলার মধ্যেও মানবপ্রেমের বাণীই ভাষাবদ্ধ হয়েছে; মঙ্গলকাব্যের সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যের চারপাশে তৎকালীন মানুষের জীবনের যে বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা লক্ষ্যকে ছাপিয়ে উঠেছে। মঙ্গলকাব্যের দেবতারা পর্যন্ত মানুষের ক্রোধ-ক্ষোভ-লোভের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে মনুষ্যপদবাচ্য হয়ে পড়েছে। শাক্তসঙ্গীতে বাংলার মাতা-কন্যার আনন্দ-বেদনার সুরই বেজেছে: চর্যাগীতির তত্ত্বগুলিও সমকালীন সমাজজীবন ও বঙ্গপ্রকৃতিকেই রূপকের আধাররূপে বরণ করে নিয়েছে।

এই আটশত বছর ধরে বাংলা সাহিত্যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটে নি, একথা অবশ্য ঠিক নয়। কিন্তু বাঙালীর জীবনে বা সাহিত্যসৃষ্টিতে কোনরূপ মৌলিক রূপান্তর ঘটে নি। মুসলমানদের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে ও ধর্মান্দোলনে কিংবা মুসলমান শাসনের অবক্ষয়ের যুগে নানা রূপগত পরিবর্তন (quantitative changes) দেখা দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ইংরেজ সংস্পর্শের পূর্ব পর্যন্ত গুণগত পরিবর্তন (qualitative changes) সম্ভব হয় নি।

ইংরেজ সংস্পর্শের সাংস্কৃতিক ফলাফল

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের জয় হল। বাংলাদেশের প্রকৃত রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা এই সময় থেকেই তাদের হাতে এসে গেল। কিন্তু সাংস্কৃতিক জীবনে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য প্রভাব অনুভূত হয় নি। প্রধানত ইংরেজদের শিক্ষা ও সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটার মধ্য দিয়ে এই শতকের বাঙালী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী য়ুরোপের সংস্কৃতির নিকটবর্তী হল। এর ফলে এদেশবাসীর চিন্তায়, কর্মে ও সৃষ্টিতে যে-সব নবত্ব সূচিত হল তাকেই বাংলার নবজাগৃতি নামে আখ্যাত করা হয়ে থাকে।

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের যে সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিচ্ছেদ তাকেই নবজাগৃতি বা রেনেসান্স নাম দেওয়া হয়। য়ুরোপের রেনেসান্স ঘটে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের ইতালীতে ফ্লোরেন্স নগরে। প্রায় একশত বছর পরে ইংলণ্ডে এর লক্ষণগুলি দেখা দেয়। বাংলাদেশের রেনেসান্সের কাল আরও আড়াইশ-তিনশ বছর পরে। এই কালের ব্যবধানে দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গিয়েছিল য়ুরোপে। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লব সারা য়ুরোপের জীবন-যাত্রায় এবং জীবনাদর্শে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এল। দ্বিতীয়ত, পশ্চিমদেশে সাহিত্য-শিল্পের ক্ষেত্রে রোমান্টিক আন্দোলন নামে একটা অত্যন্ত প্রভাবশালী আন্দোলনের জন্ম হল। আমাদের দেশের নবজাগৃতি রেনেসান্সের সুরকে বরণ করবার সঙ্গে সঙ্গে এই দু'টি ঘটনার তাৎপর্যকেও আয়ত্ত করতে চাইল।

বাংলা দেশের নবজাগৃতির প্রধান লক্ষণগুলি সংক্ষেপে বিবৃত হল।

এক ॥ মানববোধ ॥ রেনেসান্সের ফলে মানুষের মহিমা ঘোষিত হল। ঈশ্বর থেকে দৃষ্টি মানুষের দিকে ফিরে এল। মানুষের জীবন ও ভাগ্যই হল আলোচ্য। এ পৃথিবীকে মধ্যযুগে দু'দিনের প্রবাস বলে মনে করা হত, জীবন ছিল শুধুমাত্র পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত—এযুগে সেই পৃথিবীরূপ 'চিত্রিত পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে র'ল'। মুহূর্তের জলবিন্দুর বর্ণবিকিরণে দৃষ্টি হল উল্লসিত। রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখের সমাজসংস্কার, রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তা, শিক্ষাসংস্কার ও শিক্ষাবিস্তারের উৎসে এই মানববাদই সর্বদা সক্রিয় ছিল। মধুসূদনের কাব্যে, বঙ্কিমের উপন্যাসে, দীনবন্ধুর নাটকে সর্বত্র এই মানববাদের প্রতিষ্ঠা হল নবজাগৃতির প্রধানতম দান।

দুই ॥ যুক্তিবাদ ॥ ঈশ্বর, স্বর্গ, ধর্ম থেকে মানুষ ও পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হলে ভক্তি দিয়ে আর কাজ চলে না, যুক্তির আশ্রয় নিতে হয়। যুক্তিবাদ তাই একালের অন্যতম প্রধান লক্ষণ হয়ে দাঁড়াল। এই শতকের প্রধান চিন্তানায়কেরা প্রায় সকলেই অল্পাধিক যুক্তিবাদী। একদল যুক্তি দেখিয়ে প্রাচীনকে অস্বীকার করতে চেয়েছেন, একদল যুক্তি দেখিয়েই বরণ করেছেন। বিধবাবিবাহের সমর্থনে যেমন যুক্তি এসেছে তেমনি যুক্তি এসেছে এর বিরুদ্ধতায়ও। এমন কি হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কোনও কোনও কাব্যের মধ্যেও একটি যুক্তির ক্রম লক্ষ্য করা যায়।

তিন ॥ ঐতিহ্য-উদ্ধার ॥ য়ুরোপের সর্বত্র রেনেসান্স প্রাচীন গ্রীক-লাতিন-ক্লাসিক সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিকে পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। মধ্য-যুগের

ধর্মাধিপত্য ও কুসংস্কারের তমসাগর্ভ থেকে তাকে উদ্ধার করে মানব-মূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড় করান হল। বাংলাদেশের নবজাগৃতি একদিকে য়ুরোপের অনুসরণে ঐ দেশের প্রাচীন শাস্ত্র ও সাহিত্যলোকের নৈকট্য কামনা করল, তেমনি আবার এদেশীয় প্রাচীন ঐতিহ্যের দিকে তাকাবার তাগিদও অনুভব করল। রামমোহন-বিদ্যাসাগর-দেবেন্দ্রনাথ-কালীপ্রসন্ন-ভূদেব-বঙ্কিমের মত মনীষীগণ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থাদি উদ্ধারের চেষ্টা করলেন। প্রাচীন সাহিত্যিক ঐতিহ্য থেকেই কাব্য-কাঠামো গ্রহণ করে অগ্রসর হলেন এই শতকের ক্লাসিক ধারার বাঙালী কবিরা।

চার ॥ নবধর্মান্দোলন ॥ বাংলাদেশে ধর্মসংস্কার আন্দোলনও প্রবল হয়ে উঠল এই পর্বে। প্রাচীন ঔপনিষদিক আদর্শে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা হল। হিন্দুধর্মের মধ্যেও নানাবিধ সংস্কার-প্রয়াস এবং নবজাগরণের লক্ষণ দেখা দিল। এর সঙ্গে য়ুরোপের রিফর্মিজমের কিছু তুলনা করা চলে।

পাঁচ ॥ দুই ধারার দ্বন্দ্ব। বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রচারের ফলে একটি শ্রেণীর মধ্যে বিদেশীয় ভাবধারা গ্রহণ করবার অতি-উৎসাহ নির্বিচার পরানুকরণে পরিণত হল। আচার-আচরণে আহারে-বিহারে এঁরা দেশীয় ভাবধারার বিরোধী হয়ে উঠলেন। এঁদের সাধারণত "ইয়ং বেঙ্গল" নামে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। আবার এর প্রতিবাদী অপর একদল বুদ্ধিজীবী দেশীয় ঐতিহ্যকে গ্রহণের পক্ষেই মত দিলেন। "হিন্দু রিভাইভ্যালিষ্ট" নামেই এঁরা পরিচিত। এঁদের অবশ্য বাংলার নবজাগৃতির বিরুদ্ধপন্থী বলা সঙ্গত হবে না; কারণ বিদেশী চিন্তাধারার প্রতি এঁদের অন্ধ বিতৃষ্ণা ছিল না এবং রেনেসান্সের অনেক মন্ত্রই এঁরা গ্রহণ করেছিলেন।

ছয় ॥ স্বদেশচেতনা ॥ স্বাধীনতা-চেতনা, স্বদেশভক্তি প্রভৃতিও নবজাগৃতির দান। মধ্যযুগের রাজানুগত্য বা কুলগৌরব-চেতনার সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য ছিল। য়ুরোপের জাতীয়-চেতনার সংস্পর্শ এবং দেশীয় ঐতিহ্যচর্চা, ভারতীয় ঐক্যবোধ প্রভৃতির মধ্যে এই স্বদেশ-বোধের জন্ম হল। একালের সাহিত্যে নানাভাবে স্বদেশচেতনা প্রকাশিত হয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতকে শাসকদের প্রতি এদেশীয় চিন্তাবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বিধামুক্ত ছিল না। তাঁদের যুগপৎ শোষকরূপে এবং নূতন ধারার উদ্গাতারূপে এঁরা দেখেছেন। কাজেই এঁদের স্বাধীনতা-বাসনা ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব একসূত্রে বাঁধা পড়েনি।

সাত ॥ বাংলার নবজাগৃতির সীমা ॥ সর্বশেষে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন, আমাদের নবজাগৃতি রোমান্টিক আন্দোলন ও শিল্পবিপ্লবের মনন ও কল্পনার দিকটা যতটা আয়ত্ত করেছে, বাস্তবজীবনের মুক্তিতে তার সামান্যতম অংশও অনুভব করতে পারে নি। চিন্তার সুনীল আকাশে সে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু বাস্তবজীবনযাত্রায় পরাধীন পশ্চাৎপদ দেশের বন্ধন তাকে নিয়ত পীড়িত করেছে ॥

বাংলা সাহিত্যের নূতন দিক্‌দর্শন

বাংলাদেশে নবজাগৃতির ফলে ভাব-ভাবনায়, চিন্তা ও উপলব্ধিতে যে সব নবত্ব সঞ্চারিত হয়েছে সাহিত্যে তার প্রতিফলন পড়েছে ; ফলে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের যে স্বরূপ ছিল উনবিংশ শতক থেকে তাতে বড় বড় এবং মূলগত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

এক ॥ মানবপ্রাধান্য ॥ এ যুগের সাহিত্যের কেন্দ্রে এল মানুষ, তার জীবন, ভাগ্য ও চরিত্র, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা। পুরাণ, ধর্ম প্রভৃতির নবরূপায়ণেও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিই প্রাধান্য পেল। ধর্মের একাধিপত্য ঘুচে গেল, যুক্তির সঙ্গে তাকে সন্ধি করতে হল।

দুই ॥ গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ॥ বাঙালী তার চরিত্রগত ভাবোচ্ছ্বাস ও হৃদয়-ধর্ম বিসর্জন না দিলেও চিন্তা ও জ্ঞানের নানা দিগন্ত তার কাছে উন্মোচিত হল। কবিতার ভাষা তাই অপর্যাপ্ত বোধ হল। শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারের কাজে প্রথম সাহিত্যিক গদ্য আত্মনিয়োগ করল ; ক্রমে প্রয়োজন ছাপিয়ে সাহিত্যিক সৌন্দর্য-সৃষ্টির রাজ্যও সে অধিকার করে বসল। সাহিত্যিক গদ্যের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য বহুমুখী বিচিত্রতা পেল।

তিন ॥ সাময়িকপত্রের আবির্ভাব ॥ মধ্যযুগে সাহিত্য ছিল রাজসভা কিংবা মঠ মন্দিরের সীমানায় আবদ্ধ। নবযুগে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও আনন্দ বিতরণের উদ্দেশ্যে সাহিত্য সাময়িকপত্রের আশ্রয় গ্রহণ করল।

চার ॥ সাহিত্যে বিচিত্র ভঙ্গি ॥ উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ প্রভৃতি বিচিত্র ভঙ্গির ও আস্বাদের গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ঘটল।

পাঁচ ॥ নাট্যসাহিত্যের জন্ম ॥ য়ুরোপীয় পদ্ধতির রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হল এবং প্রধানত ইংরেজী নাটকের আদর্শে নাটক রচনার সূত্রপাত ঘটল।

ছয় ॥ কাব্যসাহিত্যে নবত্ব ॥ পুরাতন একঘেয়েমীর স্থানে অজস্র বৈচিত্র্য

এবং অভিনবত্বের সূত্রপাত হল। কাব্যরূপের দিক থেকে মহাকাব্য, নূতন ধরনের আখ্যায়িকা কাব্য, সনেট, গীতিকবিতা প্রভৃতির আবির্ভাব ঘটল। পুরানো মঙ্গলকাব্য বা পদাবলীধারা দ্রুত লুপ্ত হয়ে গেল; কবিতায় জীবনী লিখবার কথা লোকে আর কল্পনা করতেও পারল না॥

সাত ॥ প্রকৃতিবোধ ॥ বিশ্বপ্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য সাহিত্যে নানারূপে দেখা দিতে আরম্ভ করল।

এই যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা কালে, আমরা উপরে নির্দেশিত লক্ষণগুলির বিস্তৃততর পরিচয় পাব।

পর্ববিভাগের যুক্তি

মোটামুটি ভাবে ধরলে ১৮০০ সাল থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই দেড়শত বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাস বর্তমান গ্রন্থে আলোচিত হবে। এই যুগকে সাধারণ ভাবে আধুনিক যুগ বলা চলে। এই যুগকে কয়েকটি পর্বে সুস্পষ্টভাবে ভাগ করে পাঠ করা চলে। তবে সাহিত্যের ইতিহাসে পর্ববিভাগ সংক্রান্ত সাল তারিখগুলিকে খুব কড়াকড়ি ভাবে মেনে নেওয়া কিছু কঠিন।

এই যুগের ইতিহাসে চারটি সুস্পষ্ট সাহিত্যিক পর্বের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা চলে—

এক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১৮০০ থেকে ১৮৫০ সাল 'নব-জাগৃতির প্রস্তুতি' নামে এই পর্বকে অভিহিত করা যায়।

দুই। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ অর্থাৎ ১৮৫০ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপর্যন্ত। 'নবজাগৃতির সৃষ্টি উল্লাস' নামে একে আখ্যাত করা হবে।

তিন। রবীন্দ্র পর্ব। রবীন্দ্রনাথের তাবৎ সাহিত্য এবং তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত সমকালীন ও পরবর্তী সাহিত্যিকদের এই পর্বান্তর্গত করা উচিত।

চার। সাম্প্রতিক সাহিত্য। ১৯৩০ থেকে ১৯৫০ সাল। রবীন্দ্র ভাবমণ্ডলের বাহিরের কবি-সাহিত্যিকদের এই পর্বে আলোচনা করব।

নবজাগৃতির প্রস্তুতি॥ এই পর্বের কাল নির্ধারণ খুব কঠিন নয়। এ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে নূতন ধরনের সৃষ্টিমূলক প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয় নি। কবিতা এখনও লেখা চলেছে। তা কতকটা পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি, আর কতকটা পুরাতন ও নবীন ধারার মধ্যবর্তী একটি স্বল্পস্থায়ী রচনাভঙ্গী। এই পর্বের প্রধান সৃষ্টি বিচিত্র গদ্য রচনা। সাহিত্যিক গদ্যের উদ্ভব ঘটেছে এই পর্বে, এবং পুষ্টিও। অবশ্য উপন্যাসাদির জন্ম ঘটে নি এখনও। সাময়িকপত্রের

জন্ম, বিভিন্ন সমাজ-সংস্কার ও ধর্মকেন্দ্রিক বিতর্কে এই সময়ে নবজাত বাংলা সাহিত্যিক গদ্য যেমন পুষ্ট হয়েছে তেমনি বিভিন্ন বিষয়ক জ্ঞান ও চিন্তায় বাঙালীর মনকে নূতন যুগ-ভাবনার উপযোগী করে তুলেছে।

নবজাগৃতির সৃষ্টি উল্লাস ॥ উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে এই পর্বের স্থিতি। এবং এই শতকের শেষভাগ রবীন্দ্ররচনায় সমৃদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে এই পর্বের বাহিরে রাখা হয়েছে। এই পর্বে নাটক, নূতন ধরনের কাব্য-কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি বিচিত্র সৃজনধর্মী সাহিত্যরূপের জন্ম এবং সবিশেষ পুষ্টি ঘটেছে। প্রবন্ধ-সাহিত্য বিস্ময়কর উন্নতিলাভ করেছে, সাময়িক পত্রিকায় এসেছে গুণগত উৎকর্ষ। পূর্ব পর্বে বুদ্ধি ও জ্ঞান চর্চায় যে ভিত্তিকে দৃঢ় করা হয়েছে এই পর্বে তাই-ই যেন বিচিত্র সৌন্দর্যমূর্তিতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। রচনার প্রাচুর্যে, উদ্যোগ-আয়োজনের বহুলতায় সমগ্র জাতির জীবনের কর্মচাঞ্চল্য সাহিত্যের তটে সুগভীর আলোড়ন তুলেছে। একথা অবশ্য ঠিক যে এই পর্বের স্বল্পসংখ্যক লেখকই উচ্চ প্রতিভার অধিকারী বলে স্বীকৃত হয়েছেন; কিন্তু প্রথম স্তরের প্রতিভা কখনও অজস্র সংখ্যায় জন্মান না। সাফল্যের পরিমাণ যাই-ই হোক না কেন সৃষ্টির উল্লাসে বাংলার সাহিত্যিককুল সেদিন মেতে উঠেছিলেন। তার গুরুত্ব অস্বীকার করার নয়।

রবীন্দ্র পর্ব ॥ রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিকাল উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে আমৃত্যু বিস্তৃত। বিংশ শতাব্দীর একটা বড় অংশ জুড়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে একচ্ছত্র আধিপত্যে স্থিত ছিলেন। তাঁকে তাই উনবিংশ শতাব্দীর অন্তর্ভুক্তি রূপে নিঃসংশয়ে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত নয়। বিশেষ করে রচনার প্রাচুর্যে, বিচিত্রতায় এবং উৎকর্ষে, সমকালের সাহিত্যিকদের উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করায় তাঁর প্রতিভার স্থান এতই অনন্য যে তাঁর নামে একটি স্বতন্ত্র পর্বকে চিহ্নিত করা অবশ্য কর্তব্য।

সাম্প্রতিক সাহিত্য ॥ কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবৎকালেই (১৯৩০ সালের কাছাকাছি সময় থেকে) রবীন্দ্রপ্রভাবোত্তীর্ণ একটি নব্য ধারার স্পষ্ট সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। এই সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় বাংলা সাহিত্যের একালের ইতিহাসের আলোচনায় একরূপ অপরিহার্য ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ : নবজাগৃতির প্রস্তুতি ॥

নূতনের আবির্ভাবে পুরানোকে পথ ছেড়ে দিতেই হয়, যেমন জীবনে তেমনি সাহিত্যেও। তবে সাংস্কৃতিক জীবনে এই পরিবর্তন রাতারাতি ঘটে না। নানাবিধ জটিলতা দেখা দেয়। বুদ্ধি, চিন্তা ও জ্ঞানের রাজ্যে প্রথমত নানাবিধ সংঘাতের সৃষ্টি হয়। বুদ্ধির পথ ধরেই নবীন প্রথম মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে। হৃদয়ধর্মের সঙ্গে বিজড়িত হতে তার অপেক্ষাকৃত কিছু বেশি সময় লাগে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে শিক্ষাবিস্তার, সমাজসংস্কার, নব্য মানবকেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চা, ধর্মান্দোলন প্রভৃতির তরঙ্গে বাংলাদেশ আন্দোলিত হয়েছে। এই সব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা চিন্তা-চেতনা ও জ্ঞানের রাজ্যে নব যুগধর্মে দীক্ষিত হয়েছি। লক্ষণীয়, এই পর্বেই চিন্তা, বুদ্ধি ও জ্ঞানের ভাষা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভাবিত হয়েছে। ইতিহাস নানাভাবে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়েছে। কিন্তু অনুভূতি-উপলব্ধির ক্ষেত্রে নবীনকে আয়ত্ত করতে আরও কিছু সময় লেগেছে। এই পর্বের কবিতায় তাই কতকাংশে প্রাচীনের অনুবর্তন চলেছে, কতকাংশে যুগসন্ধির লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। পুরাতন কাব্যধারা বাঙালীর অস্থিমজ্জায় জড়িয়েছিল, তাকে বিসর্জন দেওয়ার বাসনা জাগা সহজ, কিন্তু সর্বাংশে পরিহার করা তত সহজ নয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে সেকালীন কাব্য-কবিতার প্রচলন দীর্ঘকাল অব্যাহত ছিল। কিন্তু শিক্ষিত লেখকদের হাতে পুরানো কবিতার যথাযথ অনুসরণ ঘটল না। নবীনের দ্বারদেশে পৌঁছবার চেষ্টা তাঁরা করলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু সত্যকার সৃজনশীল রচনার আবির্ভাব ঘটে নি দ্বিতীয়ার্ধের পূর্বে। এক্ষেত্রেও কারণটি একই। বুদ্ধি-চিন্তা-জ্ঞান রাজ্যের বাহন হিসেবে গদ্য-সাহিত্য বিকশিত হয়েছে, ধীরে ধীরে রস-সৃষ্টির ক্ষমতাও সে সংগ্রহ করেছে। কিন্তু রসসৃষ্টির অনুকূল মনের জন্ম হতে কিছুকালের পশ্চাৎভূমির প্রয়োজন হয়েছে।

॥ এক ॥

গদ্যসাহিত্য

ভূমিকা

সাধারণভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে আমরা নবজাগৃতির প্রস্তুতি-কাল বলে অভিহিত করেছি। কিন্তু সাহিত্য মনোরাজ্যের সৃষ্টি বলেই সাল মিলিয়ে এর কাল-ভাগ করা পুরোপুরি সফল হবার নয়। খোলা মন নিয়ে এদিক দিয়ে আমাদের অগ্রসর হতে হবে। গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসের বিচার করলে দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাব এ রাজ্যে গুণগত পরিবর্তন নিয়ে এল। সৃষ্টির উৎসবে নির্দ্বন্দ্বভাবে বাংলা গদ্যের পদার্পণ হল। কাজেই গদ্যসাহিত্যের দিক থেকে বঙ্কিমের পূর্ব পর্যন্ত প্রস্তুতি যুগের মধ্যে গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত। তার ফলে কালমাপ ১৮৫০ থেকে আরও কিছু সামনের দিকে সরে এলে তাকে মেনে নিতে হবে। এ বিষয়ে আরও একটি দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রস্তুতি যুগের অনেক গদ্যলেখকই বঙ্কিমের আবির্ভাব এবং সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠার পরেও গ্রন্থ রচনা করেছেন। সেই সব গ্রন্থকারদের রচনাগুলিকে সাল ধরে প্রাক্-বঙ্কিম এবং বঙ্কিম যুগে দু'ভাগ করে দেওয়া চলে না। যাঁদেরই ব্যক্তিত্ব প্রাক্-বঙ্কিম যুগে বিকশিত, এবং কিছু কিছু প্রধান রচনা এই কালে প্রকাশিত তাঁদের এই পর্বের লেখক বলেই আমরা গ্রহণ করব।

প্রথম যুগের বাংলা গদ্যসাহিত্যের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ এবং সমস্যা সতর্ক পাঠকের দৃষ্টিতে অবশ্যই পড়বে।

এক ॥ বাংলা গদ্যের উদ্ভব ও বিকাশে বিদেশী লেখকদের অবদান বিষয়ে পণ্ডিত-গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় দেখা যাবে গদ্যসাহিত্যের লেখক হিসেবে তাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে বাংলা গদ্যের সংগঠক এবং পরিকল্পনা রচনার দিক দিয়ে কেরী সাহেব, মার্শম্যান প্রমুখ ইংরেজ মিশনারীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এঁদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা এবং পরিকল্পনা ছাড়া বাংলা গদ্যের বিকাশ যে ব্যাহত হত তাতে সন্দেহ নেই। গ্রন্থকার হিসেবে এঁদের মধ্যে কেরীই উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভাষার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর বাংলা গ্রন্থগুলি অন্যের রচনা, তিনি সেখানে সম্পাদক মাত্র। কিন্তু ফোর্ট উইলিয়মের বিভাগীয় পরিচালকরূপে

এবং মিশন প্রেসের কর্মকর্তারূপে, উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়ে, পরিকল্পনা রচনা করে বাংলা গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টিকে তিনি সহজ করে তুলেছেন। ইংরেজ মিশনারীদের স্থাপিত ছাপাখানা এবং প্রচারিত সাময়িক পত্রের কথাও এদিক দিয়ে বিবেচ্য।

দুই ॥ বাংলা গদ্যের আদিরূপের মধ্যে চারটি রীতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। মিশনারীদের বাইবেল অনুবাদের মধ্য দিয়ে ইংরেজী ধরনের পদবিন্যাসপুষ্ট দুর্বোধ্য একটি রীতি দেখা দিল। "সাহেবী বাংলা" নামে এদের অভিহিত করা চলে। মুসলিম যুগের ফার্সী শিক্ষার ঐতিহ্যবাহী মুনসীদের রচনায় ফার্সীবহুল একটি গদ্যভঙ্গী অনুসৃত হল। এটিকে বলা হয় "আদালতী বাংলা"। এ ছাড়া সংস্কৃত ভাষার আদর্শে গম্ভীর তৎসম শব্দাদি যোগে প্রচলিত "সাধুরীতি" এবং লোকপ্রচলিত কথ্য ভাষার উদাহরণ হিসেবে "কথ্যরীতি"ও গ্রন্থাদিতে স্থান পেয়েছিল। সাহেবী এবং আদালতী বাংলা খুবই স্বল্পস্থায়ী হয়েছে। বাংলা ভাষার প্রাণধর্মের সঙ্গে এদের যোগ সামান্য বলে এই দুই ধারা একেবারেই লুপ্ত হয়েছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে পুষ্ট, বিদ্যাসাগরের দ্বারা পরিণত, অক্ষয়কুমারের দ্বারা সংহত সংস্কৃতানুগ "সাধুরীতি" বাংলা গদ্যের প্রধানতম ভাষাভঙ্গি হিসেবে দীর্ঘকাল প্রচলিত থেকেছে। জ্ঞানচর্চা এবং শিল্প-সৌন্দর্য উভয়ের প্রকাশেই এই ভাষা আপন যোগ্যতাকে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করেছে। "কথ্যরীতি" প্রথমে 'কথোপকথন' প্রভৃতি গ্রন্থে উদাহরণরূপে সঙ্কলিত হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে সংলাপের ভাষা হিসেবে কথ্যভাষা প্রাণবন্ত ও মার্জিত রূপ ধারণ করেছে। পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ সরল, সুবোধ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছেন। অবশ্য এদিক থেকে বৈপ্লবিক অভিনবত্ব এনেছেন কালীপ্রসন্ন। পূর্ববর্তী কথ্যরীতির কাঠামোটি ছিল সাধু, কালীপ্রসন্ন উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যসহ পূর্ণাঙ্গ চলিত ভাষার প্রয়োগ করলেন। তবে সাধারণভাবে এই যুগ সাধুরীতির যুগ।

তিন ॥ গল্পাদির অনুবাদ দিয়ে গদ্যসাহিত্যের সূত্রপাত ঘটলেও এই যুগে অতি দ্রুত প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব ও অনেকখানি বিকাশ ঘটেছে। দর্শন-বিজ্ঞান, সাহিত্যসমালোচনা, ইতিহাস, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় অবলম্বনে প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। যুক্তি তথ্য প্রমাণের সাহায্যে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছানই প্রবন্ধের লক্ষ্য। প্রবন্ধ জ্ঞানবিস্তার করে, তবে স্কুল-কলেজের শিক্ষকের ভূমিকা প্রবন্ধ গ্রহণ করে না; জ্ঞানচর্চা, চিন্তা ও চেতনার নব নব দ্বারোদ্ঘাটনেই এর যথার্থ সার্থকতা। এই জাতীয় প্রবন্ধকে "বিষয়

গৌরবী" (objective) নামে আখ্যাত করা চলে) অপর শ্রেণীর প্রবন্ধকে সাহিত্যিক প্রবন্ধ, রসরচনা বা "আত্মগৌরবী" (subjective) প্রবন্ধ বলা চলে। জীবনস্মৃতি, ভ্রমণকাহিনী, চিঠিপত্র, ডায়েরী, নকসা—আত্মগৌরবী প্রবন্ধও নানা জাতের হতে পারে। যে-কোন বিষয়বস্তু অবলম্বন করে এ ধরনের রচনা লেখা চলে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে লেখক এখানে শিক্ষাদাতাও নন ; জ্ঞান-চিন্তার চর্চাও তাঁর কাজ নয়। যুক্তি তথ্য সহযোগে তিনি কিছুই প্রমাণ করতে চান না। তিনি মূলত সৌন্দর্যস্রষ্টা, পাঠককে আনন্দ দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। এখানে লেখক আপন উপলব্ধির কথা বলেন, নিজের হৃদয়ের গোপন কথা ব্যক্ত করেন, ভাষা দিয়ে ছবি আঁকেন, ব্যঙ্গ কৌতুকের স্পর্শে রচনাকে আস্বাদ্য করে তোলেন। বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম যুগেই প্রবন্ধ-সাহিত্যের উদ্ভব ঘটেছে। রামমোহনকে বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের স্রষ্টা বলা উচিত। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাংলা প্রবন্ধ ক্রমেই পরিণতি লাভ করে। আত্মগৌরবী প্রবন্ধের সূত্রপাত ভবানীচরণের নকসায় ; বিদ্যাসাগরের কয়েকটি লেখার মধ্য দিয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নকসা'য় এবং দেবেন্দ্রনাথের রচনায় তা বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে।

সমালোচনা প্রবন্ধসাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ। প্রাক্-বঙ্কিম বাংলা গদ্যে সমালোচনা-প্রবন্ধ কিছুটা বিকাশ লাভ করে। ১৮২৪-২৫ সাল থেকে "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। সেগুলি অবশ্য সমালোচনা-প্রবন্ধ নামের যোগ্য নয়। ১৮৩০ সালে কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইংরেজীতে বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখলেন। ঐ বছরেই তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয় সমাচার দর্পণে। সমালোচনামূলক প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে এ প্রবন্ধের কিছু মূল্য আছে। ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাঙালী তরুণদের সাহিত্যরুচি বেড়ে যায় ; "বেঙ্গল রিভিউ" পত্রিকায় ইংরেজীতে সমালোচনা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৫১ সালে বিদ্যাসাগরের "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব"টি বীটন সোসাইটিতে পঠিত হয়। গ্রন্থাকারে এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ সালে। পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-প্রবন্ধ "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম যুগের এই প্রবণতাগুলির পটভূমিকায় এই পর্বের ইতিহাস পাঠ করা উচিত।

প্রাক্-আধুনিক বাংলা গদ্য

বাংলা পয়ার ছন্দের ছিল এক আশ্চর্য প্রকাশক্ষমতা। গদ্যাত্মক ভাব-ভাবনাকে পর্যন্ত এই ছন্দে স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করা যেত; উদাহরণ, "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত"। নিত্যকার প্রয়োজন ব্যতীত গদ্যের স্থান সাহিত্যের প্রাঙ্গনে অবারিত ছিল না। কিন্তু অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এদেশে বাংলা গদ্যে কিছু কিছু লেখা হয়েছে। সেগুলির কথা ইতিহাস পাঠক বিস্মৃত হতে পারেন-না। বৈষ্ণব কড়চা নিবন্ধগুলিতে গদ্য ভাষার কিছু চিহ্ন মেলে। "শূন্য পুরাণে"র ভাষাও অংশত গদ্য এমন মনে করবার কারণ আছে। তবে এই রচনাগুলির কোনটিকেই সপ্তদশ শতকের পূর্ববর্তী কালের বলে গ্রহণ করা চলে না। ষোড়শ শতকের কুচবিহারের মহারাজার গদ্যে লেখা একটি পত্র পাওয়া গিয়েছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কয়েকটি পত্র ও দলিল-দস্তাবেজে বাংলা গদ্যের নিদর্শন মিলেছে। গদ্যভাষা হিসেবে এগুলির মূল্য বিশেষ নেই। পরবর্তীকালের সাহিত্যিক গদ্যের উপরে এর কোন প্রভাবও নেই।

মিশনারী প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্য

পোর্তুগীজ মিশন॥ য়ুরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে পোর্তুগীজদের সঙ্গেই বাংলা দেশের প্রথম সম্পর্ক স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করতে গিয়ে তাঁরা বাংলা ভাষা শিখে বাংলায় বই লেখা প্রয়োজনীয় বলে বোধ করতে লাগলেন। সপ্তদশ শতকেই যে এ জাতীয় কিছু গদ্য রচনার আবির্ভাব ঘটেছিল তার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত কিছু গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে।—

এক। দোম এন্তনিও রচিত "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ"। লেখক বাঙালী জমিদারপুত্র; মগদস্যুদের দ্বারা অপহৃত হলে, পোর্তুগীজ পাদরীরা তাকে কিনে নেয় ও খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা দান করে।

দুই। মানো-এল-দা-অস্‌সুম্পসাম এর গ্রন্থ "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ।" অনেক গবেষকের মতে এই গ্রন্থের বাংলা অংশের অনুবাদ অস্‌সুম্পসাম দেশীয় খ্রীষ্টানদের দিয়ে করিয়েছিলেন।

তিন। মানো-এল একখানি বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও পোর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষ রচনা করেন।

পরবর্তী বাংলা গদ্যে পোর্তুগীজ মিশনের কোনই স্থায়ী প্রভাব রক্ষিত

হয়নি। তবে দেশীয় ভাষার প্রতি য়ুরোপীয়দের আগ্রহের সূচনা এঁদের মধ্যে ; কেরী, মার্শম্যানের এঁরাই পূর্বসূরী।

ইংরেজ শাসক ও শ্রীরামপুর মিশন॥ এদেশে রাষ্ট্রাধিকার স্থাপিত হওয়ায় ইংরেজ শাসকবর্গ দেশীয় ভাষার প্রতি স্বভাবতই কিছুটা আকৃষ্ট হলেন। ইংরেজদের বাংলা শেখাবার জন্য হ্যালহেড অষ্টাদশ শতকে একটি বাংলা ব্যাকরণ বই লিখলেন ইংরেজিতে। এই শতাব্দীতেই আইনের বঙ্গানুবাদ করা হল। বলা বাহুল্য এ ভাষা অত্যন্ত জড়। কিন্তু এঁরা বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উপকার করলেন মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করে।

মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে আমাদের দেশে হাতে লেখা পুঁথি প্রচলিত ছিল। তুলট কাগজ, তালপাতা বা ভুজ পাতায় এই সব পুঁথি লিখিত হত। যাদের প্রয়োজন তারা নকল করিয়ে নিত। তখন অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বেশী ছিল না। কথকতা-কীর্তন-পাঁচালী গানের মারফৎ তখনকার সাহিত্য লোকের কাছে পৌঁছত। কিন্তু গদ্য-সাহিত্য ঐ ভাবে প্রচারিত হতে পারে না। স্কুল-কলেজের পাঠ্য বই মুদ্রিত হওয়া দরকার, অনেক শিক্ষিত লোক থাকলে বহু সংখ্যক মুদ্রিত পুস্তক ছাড়া তাদের জ্ঞানতৃষ্ণা নিবৃত্ত করা যায় না। মুদ্রাযন্ত্র একসঙ্গে অল্পায়াসে বহু সংখ্যক গ্রন্থ প্রস্তুত করে। নকলকারেরা ইচ্ছামত মূল বইয়ের পরিবর্তন করত, মুদ্রিত বইয়ের পরিবর্তন অসম্ভব। নানা কারণেই মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনা যে-কোন সাহিত্যের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শাসনকার্যের জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ মুদ্রাযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। হ্যালহেডের ব্যাকরণ বইটি এদেশে মুদ্রিত হল। উইলকিনস হরফ তৈরী করে দিলেন। শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার তাঁর কাছ থেকে হরফ তৈরী শিখে কলকাতায় একটি কারখানা বসালেন।

এদিকে ইংরেজ মিশনারীরা কেরীর নেতৃত্বে শ্রীরামপুরে আসর জমালেন। এক পুরানো মুদ্রাযন্ত্র ইংলণ্ড থেকে আনিয়ে, পঞ্চানন কর্মকারের কাছ থেকে বাংলা অক্ষর যোগাড় করে শ্রীরামপুরে প্রেস বসানো হল। শ্রীরামপুর প্রেস এবং মিশন বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছে।

কেরী, টমাস, ওয়ার্ড, মার্শম্যান প্রভৃতি মিশনারীরা খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য দেশীয় ভাষার আশ্রয় নিতে মনস্থ করলেন। ১৮০০ সালে কেরী "মঙ্গল সমাচার

১৮০১ সালে সম্পূর্ণ New Testament এবং Old Testamentএর কতকাংশ অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হল। ১৮০৯ সালে "ধর্মপুস্তক" নামে সমগ্র বাইবেলের অনুবাদ প্রকাশিত হল। এই বাইবেলের ভাষা অত্যন্ত জড় এবং কৃত্রিম। বাংলার নিজস্ব পদবিন্যাসের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে ইংরেজী পদবিন্যাসের অনুসরণ করায় এ গদ্য বাঙালীদের কাছে পরিহাসের বিষয় হয়ে পড়েছিল।

গদ্যভাষার দিক থেকে শ্রীরামপুর মিশন ও শ্রীরামপুর প্রেস কোন উল্লেখ-যোগ্য অবদান রেখে যেতে পারে নি। কিন্তু এদের প্রচেষ্টায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত এবং কয়েকখানি উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থ মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হওয়ায় বাঙালীর কাছে শ্রীরামপুর মিশন আদরণীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

রাষ্ট্রশাসন পরিচালনের জন্য ইংরেজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষা করা একান্তভাবেই প্রয়োজন। কোম্পানী এই উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি কলেজ স্থাপন করলেন ১৮০০ সালে। কোম্পানীর উদ্দেশ্যের মধ্যে রাষ্ট্র-শাসন ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের রথচক্র কোন শাসকের প্রয়োজনকেই খাতির করে না। তাই উক্ত কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনের সীমায় বদ্ধ রইল না। বাংলা গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠান এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করল। এই কলেজটি হল ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম কেরী এই কলেজের বাংলা ও সংস্কৃত বিভাগের ভার পেলেন। ১৮১৪ সাল পর্যন্ত এই কলেজটি তার উদ্দেশ্য পালন করে গিয়েছে। কিন্তু ১৮১৫ সালের পরে তার ইতিহাস সমস্ত গুরুত্ব হারিয়েছে। ১৮০১—১৮১৫ এই কয় বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করে এদেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। অবশ্য ১৮১৫ সালের পরে রামমোহনের আবির্ভাবে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাইরেকার নানাবিধ প্রতিষ্ঠান গদ্য সাহিত্যের দায়িত্ব গ্রহণ করায় ভারকেন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে সরে গেল। অথচ বাংলায় গদ্যসাহিত্য রচনা করা এই কলেজের লক্ষ্য ছিল না, ছিল উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষই কিন্তু কলেজটিকে ইতিহাসের বুকে মর্যাদা দিয়েছে।

অবশ্য এর জন্য প্রথমেই কেরীর ভূমিকার কথা স্মরণ করতে হয়। কেরী পূর্বেই বাংলা গদ্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বাইবেল অনুবাদপ্রসঙ্গে। বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে গদ্য-গ্রন্থের অভাব প্রথমেই তিনি লক্ষ্য করলেন। তিনি যে-সব পণ্ডিত ও মুনসীকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের সাহায্যে নিজে যেমন গদ্যগ্রন্থ সঙ্কলনের কাজে হাত দিলেন তেমনি তাঁদেরও স্বাধীনভাবে গ্রন্থরচনায় উৎসাহিত করতে লাগলেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মধ্যে প্রধান হলেন তিনজন—স্বয়ং কেরী, প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং কেরীর প্রাক্তন মুনসী রামরাম বসু। অন্যান্য পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল—

১। গোলকনাথ শর্মা—"হিতোপদেশ" (১৮০২), ২। তারিণীচরণ মিত্র—"ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট" (১৮০৩) ৩। চণ্ডীচরণ মুনসী—"তোতা ইতিহাস" (১৮০৫); ৪। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—"মহারাজ-কৃষ্ণচন্দ্র-রায়স্য চরিত্রং" (১৮০৫); ৫। হরপ্রসাদ রায়—"পুরুষপরীক্ষা" (১৮১৫)।

আরও দু'তিনখানি গ্রন্থ ফোর্ট উইলিয়মের লেখকগোষ্ঠীর দ্বারা রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থগুলি প্রধানত ইংরেজী, ফার্সী বা সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। এবং আখ্যানধর্মী। কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনীও প্রকৃত প্রস্তাবে গালগল্পের সঙ্কলন। এই সব গ্রন্থের ভাষায় অকারণ সংস্কৃতাধিক্য এবং ফারসী শব্দের প্রয়োগ যেমন দৃষ্ট হয়, তেমনি দূরান্বয়, বিভক্তিযুক্তপদ গঠনে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। ভাষা অনেকাংশে দুর্বোধ্য, প্রাণহীন এবং কৃত্রিম। কিন্তু এর পূর্বে বাংলা গদ্যে যে-সব পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে (মিশনারী প্রচেষ্টার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়) তার তুলনায় এঁদের ভাষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং প্রকৃত বাংলা ভাষার অনেক নিকটবর্তী। এদিক দিয়ে বিচার করলে এঁদের সাধারণভাবে সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের স্থাপয়িতার সম্মান দিতে হয়। কলেজের প্রধান তিনজন গ্রন্থকারকে ধরলে এ কথা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে হয় যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজই বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের প্রকৃত ভিত্তি স্থাপন করল। পূর্বোক্ত পণ্ডিতদের মধ্যে হরপ্রসাদ রায়, তারিণীচরণ প্রভৃতির গ্রন্থ কলেজের বাহিরেও বেশ কিছু জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সম্ভবত এঁদের গল্পের নবীনতাই তার কারণ। সব দিক বিবেচনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মর্যাদা বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়।

এবারে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান তিনজন গ্রন্থকারের বিষয়ে আলোচনা করা যাক।

উইলিয়ম কেরী (১৭৬১-১৮৩৪)

পরিচয় ॥ বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে কেরীসাহেবের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা গদ্যভাষার চর্চা ধর্ম-প্রচাররূপ লক্ষ্যের উপায় হিসেবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপায়ের গৌণভূমিকায় না থেকে লক্ষ্যের মূখ্য ভূমিকা সে অধিকার করে বসল। শ্রীরামপুর থেকে কেরী পূর্বেই বাইবেলের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বিভাগীয় প্রধান রূপে তিনি পণ্ডিত-মুনসীদের দ্বারা বই লিখিয়ে মুদ্রণের ব্যবস্থা করতে লাগলেন। পুরস্কারাদি বিতরণ করে লেখকদের উৎসাহকে সজীব রাখার ব্যবস্থাও করলেন। তিনি নিজেও প্রত্যক্ষভাবে গ্রন্থকার রূপে অবতীর্ণ হলেন।

গ্রন্থাবলী ও ভাষা ॥ কলেজে তাঁর দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়— "কথোপকথন" (বা Dialogue, ১৮০১) এবং "ইতিহাসমালা" (১৮১২)। গ্রন্থ দুটির ভাষা ও ভঙ্গির পরিচয় নিলে বিস্মিত হতে হবে। প্রথমোক্ত গ্রন্থটি ইংরেজ সিভিলিয়ানদের এ-দেশের কথ্য ভাষার বিচিত্র ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত করাবার উদ্দেশ্যে সঙ্কলিত। গ্রন্থটিতে মোট একত্রিশটি অধ্যায় আছে; অধ্যায়গুলিতে মজুরের কথাবার্তা, ঘটকালী, হাটের বিষয়, স্ত্রীলোকের হাট করা, মাইয়া কন্দল, জমিদার-রাইয়ত কথা প্রভৃতি সমাজের সম্ভাব্য সকল স্তরের লোকের কথোপকথনের উদাহরণ রয়েছে। ফলে গ্রন্থটিতে সমকালীন সমাজের বাস্তবজীবনযাত্রার ছবি অনেকখানি ধরা পড়েছে। এর ভাষাও কম বিস্ময়ের সঞ্চার করে না। এই রচনায়ই প্রথম কৃত্রিম সংস্কৃতানুগ ভাষার স্থলে যথার্থ কথ্য ভাষা গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। যেমন—

"আয় টে সকাল করে চল স্থতা না বিকেলে তো নুন তেল বেসাতি পেতে হবে না।

ও টে বুন সে দিন কলঘাটার হাটে গিয়াছিলাম তাহাতে দেখিয়াছি স্থতার কপালে আগুন লাগিয়াছে। পোড়া কপালে তাঁতি বলে কি আটপণ করে স্থতাখান। সে সকল স্থতা আমি এক কাহন বেচেচি টে।"

বাংলা প্রবাদ-প্রবচনের ব্যবহারে কথোপকথনে এই ভাষা বেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং সম্পাদনার

কাজ কেরীই করেছিলেন। গ্রন্থটির প্রকৃত রচয়িতাদের সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় লিখেছেন, "That the work might be as compleat as possible, I have employed some sensible natives to compose dialogues upon subjects of a domestic nature, and to give them precisely in the natural stile of the persons supposed to be speakers." নিজে রচয়িতা না হলেও কেরী সাহেব পরিকল্পনার ব্যাপারে যে সাহস, বিচক্ষণতা ও বিবেচনাবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন যে কোন পাদ্রীর পক্ষে তা বিস্ময়কর। কিন্তু গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে কার রচনা সে প্রশ্নের সমাধান করা প্রয়োজন। সমকালে কলেজের পণ্ডিত-মুনসীরা যেরূপ গদ্য লিখতেন তাতে মনে হয় না মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ছাড়া অন্য কেউ এরূপ ভাষারচনায় সক্ষম ছিলেন।) তাঁর নিজের নামে প্রকাশিত গ্রন্থগুলিতেও কথোপকথনের ভাষায় বহুক্ষেত্রে প্রাণবন্ত কথ্যরীতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।

কেরীর "ইতিহাসমালা" আসলে ইতিহাস নয়, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সূত্র থেকে সঙ্কলিত কতগুলি গল্পের সমষ্টি। "ইতিহাসমালার ভাষা ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের প্রাথমিক যুগের ভাষা অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং গদ্য রচনার একটা স্টাইলও ইহাতে লক্ষিত হয়। গল্পগুলির অধিকাংশই ব্যঙ্গপ্রধান, বত্রিশ সিংহাসনের টুকরা টুকরা গল্পের মত। কেরী যদি স্বয়ং এগুলি রচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, বাইবেল অনুবাদের আড়ষ্টতা তিনি ইহাতে বর্জন করিয়াছেন—অবশ্য কথোপকথনের সবেগ সাবলীলতা ইহাতে নাই, কিন্তু ভাষা নিতান্ত নীরসও নয়।" কিন্তু "কেরী সম্ভবতঃ এক্ষেত্রেও সম্পাদক ও সঙ্কলনকর্তা," লেখক নন।

প্রধানত সম্পাদক, পরিকল্পনা ও প্রেরণার উৎসস্থল হিসেবে বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ভিত্তি স্থাপনে কেরীর অতুলনীয় দানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।)

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)

পরিচয় ॥ (ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। রামমোহন-পূর্ব যুগের স্মরণীয় বাঙালীদের মধ্যে তাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয়। বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রকৃত স্রষ্টারূপে মৃত্যুঞ্জয়কেই সম্মান দেওয়া উচিত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে পণ্ডিতদের

চেষ্টায় বাংলা গদ্যসাহিত্য প্রকৃত ভিত্তি লাভ করে, মৃত্যুঞ্জয় তাঁদের মধ্যে রচিত গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য এবং ভাষার শিল্পরূপের দিক থেকে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী ছিলেন। সহমরণ প্রথার বিরোধী হিসেবে তিনি যে উদারতার পরিচয় দিয়েছিলেন সেকালের পক্ষে তা যে কতখানি বিস্ময়কর সহজেই অনুমান করা চলে।

গ্রন্থাবলী ও ভাষারীতি॥ মৃত্যুঞ্জয় সমকালীন লেখকদের তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক বই লিখেছিলেন। ১। "বত্রিশ সিংহাসন" (১৮০২), ২। "হিতোপদেশ" (১৮০৮), ৩। "রাজাবলি" (১৮০৮)। ৪। "প্রবোধ-চন্দ্রিকা" (রচনা আনুমানিক ১৮১৩), ৫। "বেদান্তচন্দ্রিকা" (১৮১৭)। মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা অত্যন্ত উৎকট ও সংস্কৃতানুসারী বলে একটি ধারণা প্রচলিত আছে। "প্রবোধচন্দ্রিকা"র "কোকিলকুলকলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে"। এই বাক্যটির উদাহরণে মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যকে দুরূহ এবং অপাঠ্য বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা যুক্তিহীন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র কোন কোন স্থলে মূলানুসরণ করতে গিয়ে দুরূহতা এসেছে ঠিকই কিন্তু সাধারণভাবে মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষা সম্বন্ধে এ অভিযোগ গ্রাহ্য নয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষাবিষয়ক কৃতিত্ব বর্ণনা করে প্রমথ চৌধুরী যে মন্তব্য করেছেন তাকে যথার্থ বলে স্বীকার করবার কারণ আছে,—"মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার কালের হিসাব এবং ক্ষমতার হিসাব,—দুই হিসাবেই এই শ্রেণীর লেখকদিগের অগ্রগণ্য।...তিনি একদিকে যেমন সাধু ভাষার আদিলেখক—অপরদিকেও তিনি তেমনি চল্‌তি ভাষারও আদর্শ লেখক।) নিম্নে তাঁহার চল্‌তি ভাষার নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—(মোরা চাষ করিব ফসল পাবো, রাজার রাজস্ব দিয়া যা থাকে তাহাতেই বছর শুদ্ধ অন্ন করিয়া খাবো; ছেলেপিলাগুনি পুষিব।) যে বছর শুকা হাজাতে কিছু খন্দ না হয়, সে বছর বড় দুঃখে দিন কাটি, কেবল উড়ি ধানের মুড়ী ও মটর মসুর শাক পাত শামুখ গুগুলি সিজাইয়া খাইয়া বাঁচি।'...(ইহা যে খাঁটি বাঙ্গালা সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ ভাষা সজীব সতেজ সরল স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত; ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই। এবং এ ভাষা যে সাহিত্য রচনার উপযোগী, উপরোক্ত নমুনাই তাহার প্রমাণ।)...আমার বিশ্বাস, (আমাদের পূর্ববর্তী লেখকেরা যদি তর্কালঙ্কার মহাশয়ের রচনার এই বঙ্গীয় রীতি

অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে কালক্রমে এই ভাষা সুসংস্কৃত ও পুষ্ট হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিত।

কিন্তু তাঁহার (অর্থাৎ রামমোহন রায়ের) অবলম্বিত রীতি যে বঙ্গসাহিত্যে গ্রাহ্য হয় নাই তাহার প্রধান কারণ, তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদিগের রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। এ গদ্য, আমরা যাহাকে modern prose বলি, তাহা নয়! পদে পদে পূর্বপক্ষকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্রসর হওয়া আধুনিক গদ্যের প্রকৃতি নয়।”

মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনের গদ্যসাহিত্যে প্রবেশের পূর্বে চারিখানি বই লিখেছেন। রামমোহনের গদ্য অপেক্ষাও তাঁর গদ্য অনেক বেশি সহজ, সাবলীল। বাংলা গদ্যের তিনিই প্রথম শিল্পী।

রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)

পরিচয়॥ রামরাম বসু দীর্ঘকাল ইংরেজ মিশনারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে কেরী সাহেবের বাংলা শিক্ষক এবং মুনসী হিসেবে তিনি শ্রীরামপুর মিশনে বেশ কিছুকাল অবস্থান করেছিলেন। অবশেষে তাঁর সাক্ষাৎ পাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক হিসেবে। কেরীর উৎসাহে তিনি বাংলা ভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে অগ্রসর হলেন। তাঁর “রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র” ১৮০১ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এটিই বঙ্গাক্ষরে বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রথম মুদ্রিত মৌলিক গ্রন্থ। তবে এ ঘটনাটি যতটা আকস্মিক ততটা তাৎপর্যবহ নয়। তাঁর বই প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল বলেই তাঁকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মধ্যে প্রথম লেখকের মর্যাদা দেবার অবকাশ নেই। বরং কলেজের প্রধান তিনজন গ্রন্থকারের মধ্যে রামরাম বসুর ভূমিকা সর্বাপেক্ষা ত্রুটিপূর্ণ।

গ্রন্থাবলী ও ভাষারীতি॥ রামরাম বসুর গদ্যগ্রন্থ দুটি। “রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র” (১৮০১) এবং “লিপিমালা” (১৮০২)। প্রথম গ্রন্থটির বিষয়বস্তু নানা ফার্সী গ্রন্থ এবং কিম্বদন্তীর রাজ্য থেকে সঙ্কলিত। বিষয়বস্তু গালগল্প রচনার যুগে কিঞ্চিৎ অভিনব সন্দেহ নেই, কিন্তু ফার্সী পদ্ধতিতে শিক্ষিত মুনসী রামরাম বাংলা ভাষার স্বাভাবিকত্ব ফার্সী শব্দের বাহুল্যে অনেকটা নষ্ট করেছেন। যেমন “যে কালে দিল্লির তক্তে হোমাঙু বাদসাহ তখন ছোলেমান ছিলেন কেবল বঙ্গ ও বিহারের নবাব পরে হোমাঙু বাদসাহের ওফাত হইলে হেন্দোস্থানে বাদসাহ হইতে বাকি হইল। এ কারণ

হোমাগু ছিলেন বৃহৎ গোষ্ঠি তাহার অনেকগুলিন সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর বিস্তর ঝকড়া লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল ইহাতে সুবাজাতের তহশিল তাগদা কিছু হইয়াছিল।" পদবিন্যাস রীতির বিশৃঙ্খলাও এ ভাষার মধ্যে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। তার উপরে রয়েছে অশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার। তবে মাত্র এক বৎসর পরে লেখা 'লিপিমালা'র ভাষা বেশ সরল। যেমন "কন্যে তুমি কিমর্থে এখানে আসিয়াছ তোমার স্বামী ভূতের পতি শ্মশানে মসানে তাহার অবস্থিতি হাড়মালা গলায় সাপ লইয়া তাহার খেলা বাদিয়ার বেশ তোমার কপাল মন্দ অতএব এমত ঘটনা তোমাকে হইয়াছে আমি তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম না।" উপযুক্ত স্থানে যতি বসিয়ে পড়লে দেখা যায় পূর্ববর্তী গ্রন্থের তুলনায় বসুমহাশয়কৃত এই পত্র সঙ্কলনে পদবিন্যাস অনেক স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, ফার্সী শব্দের অকারণ আধিক্য একেবারেই লোপ পেয়েছে। সম্ভবত সামনে কোন আদর্শ না থাকায় প্রতাপাদিত্য চরিত্রের ভাষা সম্বন্ধে তিনি মনস্থির করতে পারেন নি। কিন্তু প্রতাপাদিত্য ও লিপিমালা প্রকাশের মধ্যে "কথোপকথন" (কেরী সংকলিত এবং সম্ভবত মৃত্যুঞ্জয় লিখিত) এবং মৃত্যুঞ্জয়ের "বত্রিশ সিংহাসন" লিখিত হয়েছে। ফলে গদ্য ভাষার একটা আদর্শ তিনি সামনে পেয়েছেন। সেই আদর্শ অনুসরণে রামরাম বসু সাফল্য দেখিয়েছেন। এখানেই কলেজের অন্যান্য শিক্ষক গ্রন্থকারের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য। রামরাম বসু গদ্য ভাষার পথ তৈরী করতে সমর্থ হন নি, কিন্তু স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রথমেই পথ চলেছেন। এর মূল্যও অনস্বীকার্য॥

সাময়িক পত্র (বঙ্গদর্শন-পূর্ব)

গদ্যসাহিত্য ও সাময়িক পত্র॥ বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিবর্তনে সাময়িক পত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। খ্রীষ্টান মিশন, মুদ্রাযন্ত্র, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ন্যায় প্রথম যুগের বাংলা সাময়িক পত্রও এমন একটি ব্যাপার (Institution) প্রথম যুগের গদ্য সাহিত্যের নির্মিতিতে যা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গদ্যসাহিত্য কিছুটা প্রকাশক্ষম না হলে সাময়িক পত্রের উদ্ভব সম্ভব নয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করবার দিকে একটা ব্যাপক প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়। অল্পকালের মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক রচিত হয়। এর ফলে গদ্যভাষা ক্রমে ভাব প্রকাশের উপযোগী হয়ে উঠতে লাগল। প্রথম দিককার গদ্য

পুস্তকগুলি স্কুল কলেজের চৌহদ্দীর মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। সাময়িক পত্র ছাত্রবোধ্যতার হাত থেকে বাংলা গদ্যসাহিত্যকে উদ্ধার করে ব্যাপক ভাবে জনসাধারণের কাছে উপস্থিত করল। রাজকীয় আনুকূল্য থেকে মুক্তি পেয়ে এ-যুগের সাহিত্য জনজীবনে আসন নিয়েছে। ছাপাখানা যে-কাজের সূত্রপাত করল সাময়িক পত্র তাকেই এগিয়ে নিয়ে গেল। অবশ্য প্রথম দিকে গদ্য-সাহিত্যের পাঠকশ্রেণী একান্ত স্বল্প থাকায় শিক্ষার্থীদের উপরে সাময়িক পত্রকে নির্ভর করতে হয়েছে এমন প্রমাণ আছে। "দিগ্‌দর্শন", "পশ্বাবলী"র মত পত্রিকা স্কুল বুক সোসাইটির আনুকূল্য লাভ করেছিল।

প্রথম যুগের সাময়িক পত্রের বৈশিষ্ট্য ॥ সাময়িক পত্রের ইতিহাসের সূত্রপাত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথম যুগ চলেছে। এই যুগে বাংলা সাময়িক পত্র নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে ক্রমেই সমুন্নত হয়েছে। ইংরেজী সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এই কালে বাংলা দেশের জীবনে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজ-সংস্কার ও সাহিত্যচিন্তায় নবজাগরণ সূচিত হচ্ছিল। জাতীয় জীবনে এই যুগে ভিন্নমুখী ভাবধারার সংঘাত অনুভূত হচ্ছিল। এ-কালের সাময়িক পত্র জাতির চিন্তা-জীবনের সেই পরিচয় ধরে রেখেছে। এই পর্বে চলেছে সৃষ্টির প্রস্তুতি। সৃজনশীল সাহিত্যের যুগ এসেছে আরও কিছু পরে। এ-কালের সাময়িক পত্রে তাই গল্প-কবিতাদির আয়োজন বড় চোখে পড়ে না। এই পর্বের শেষ দিকে কাব্য-সাহিত্যে নবদিগন্ত উন্মোচিত হওয়ায় সাময়িক পত্রে তার কিঞ্চিৎ প্রতিফলন অবশ্য পড়েছিল। এই যুগের সাময়িক পত্রে সামাজিকসংস্কার আন্দোলন বিশেষ ভাবেই স্থান করে নিয়েছিল। সহমরণ, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা, স্ত্রীশিক্ষা, ইংরেজীশিক্ষাকে কেন্দ্র করে যে-সব বিতর্ক এবং আন্দোলনের ঢেউ উঠেছিল তাতে সাময়িক পত্রের ভূমিকাও বড় গৌণ ছিল না। এ ছাড়া ধর্মপ্রচারকে কেন্দ্র করেও নানাবিধ বিতর্ক ও আন্দোলন এ-যুগে বাংলা দেশকে আলোড়িত করেছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রচার, ব্রাহ্মধর্মের উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠা, রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের আত্মরক্ষার প্রয়াস সবই আপনাপন বক্তব্য প্রচারের বাহন হিসেবে এক বা একাধিক সাময়িক পত্রের আশ্রয় নিয়েছিল। তাছাড়া ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবনী, সাহিত্য প্রভৃতি বিবিধ মানববিদ্যাসংক্রান্ত নানা আলোচনাও সমকালীন পত্রপত্রিকাকে শিক্ষিত শহরবাসীর কাছে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল।

কয়েকটি প্রধান সাময়িক পত্রের পরিচয় ॥ ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে শ্রীরামপুর মিশন থেকে "দিগ্‌দর্শন" নামক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যান বাংলাভাষার এই প্রথম মাসিকটির সম্পাদক ছিলেন এবং এই পত্রিকায় "যুবলোকের কারণ সংগৃহীত নানা উপদেশ" থাকত। ঐ একই বছরে মে মাসে জে. মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর মিশন "সমাচারদর্পণ" নামে বেশ উচ্চাঙ্গের একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাঙালী পরিচালিত প্রথম সাময়িক "বাঙাল গেজেটি" (সাপ্তাহিক) ঐ একই বছরে সম্ভবত জুন মাসে প্রকাশিত হয়। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য এর সম্পাদক ছিলেন। রামমোহন রায়ের কোন কোন প্রবন্ধ এ-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। "সমাচার দর্পণে" হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করে নিয়মিত রচনা প্রকাশিত হতে থাকে। এদিকে বাঙালীদের নিজস্ব পত্রিকা "বাঙাল গেজেটি" বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হিন্দুদের পক্ষ থেকে একখানি পত্রিকার প্রয়োজন অনুভূত হয়। রামমোহন রায় ও ভবানীচরণের যুগ্ম উদ্যোগে ১৮২১ সালে "সম্বাদ কৌমুদী" নামে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। হিন্দুদের প্রচলিত প্রথার সংস্কারের প্রশ্নে ভবানীচরণের সহিত অন্যদের মতভেদ হওয়ায় তিনি "সমাচার চন্দ্রিকা" (১৮২২) প্রকাশ করেন। এটি সমকালীন রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্ররূপে একটি বিশিষ্ট পত্রিকায় পরিণত হয়। ১৮২৩ সালে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ হল। সাময়িক পত্রের স্বাধীনতা ইংরেজ সরকারের হস্তক্ষেপে বিশেষরূপে খর্ব হয়।

অবশেষে ১৮৩১ সালে কবি ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদনায় সমকালীন শ্রেষ্ঠ সাময়িক পত্র "সংবাদ প্রভাকর" প্রকাশিত হল। প্রথমে পত্রিকাটি সাপ্তাহিকরূপে, পরে সপ্তাহে তিনবার এবং তারপর ১৮৩৯ সালে দৈনিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। এটিই বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় প্রথম দৈনিক। "ইহা সে যুগের একখানি উচ্চাঙ্গের সংবাদপত্র। দেশ-বিদেশের সংবাদ ছাড়া ইহাতে ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা স্থান পাইত।" কবিওয়ালাদের জীবনী এবং কবিতাসঙ্কলন করে তিনি এই পত্রিকায় প্রকাশ করেন। রাজা রাধাকান্তদেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন ছিলেন এই পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল প্রভৃতির লেখায় হাতে-খড়ি হয় "সংবাদ প্রভাকরের"ই পৃষ্ঠায়। সমকালে বাংলাভাষায় অনেকগুলি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে

"জ্ঞানান্বেষণ", "সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয়" "সম্বাদ ভাস্কর", দ্বিভাষিক "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর" প্রভৃতির নামোল্লেখ করা চলে।

১৮৪৩ সালে সমকালীন বাংলার একটি প্রধান পত্রিকা "তত্ত্ববোধিনী" প্রকাশিত হল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন এই মাসিকের পরিচালক। ব্রাহ্মধর্ম বিষয়ক আলোচনার মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটিকে ব্যবহার করবার ইচ্ছাই তাঁর ছিল। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত পত্রিকাটির সম্পাদক হিসেবে শুধু ধর্ম-পত্রিকায় এটিকে পরিণত হতে দিলেন না। জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোচনায়, নানা মানববিদ্যার উপস্থাপনায় তিনি তত্ত্ববোধিনীকে সমকালের শ্রেষ্ঠ পত্রিকায় পরিণত করলেন। তাঁর নিজের বহু উচ্চস্তরের প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি বহু মনীষী পত্রিকাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

১৮৫১ সালে প্রকাশিত সচিত্র মাসিক "বিবিধার্থ সংগ্রহ" জনপ্রিয়তার দিক থেকে পূর্ববর্তী সব সাময়িকীকেই ছাড়িয়ে গেল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। শেষে কিছুকাল কালীপ্রসন্ন সিংহ পত্রিকাটির সম্পাদনা করেন। "পুরাবৃত্তের আলোচনা, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের উপাখ্যান, প্রাচীন তীর্থাদির বৃত্তান্ত, স্বভাবসিদ্ধ রহস্য-ব্যাপার ও জীবসংস্থার বিবরণ, খাদ্যদ্রব্যের প্রয়োজন, বাণিজ্য-দ্রব্যের উৎপাদন, নীতি-গর্ভ উপন্যাস, রহস্যব্যঞ্জক আখ্যান, নূতন গ্রন্থের সমালোচন, প্রভৃতি নানাবিধ আলোচনায়" বিবিধার্থ সংগ্রহ পূর্ণ থাকত। মধুসূদনের কাব্যনাট্যাদি নিয়ে প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে এই পত্রিকায়। নব যুগের প্রথম কাব্য "তিলোত্তমাসম্ভব"ও অংশত এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

সমকালীন পত্রিকাগুলির মধ্যে প্রগতিশীল মতবাদের দিক থেকে "সর্বশুভকরী", সর্বজনবোধ্য সরল ভাষার জন্য প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের "মাসিক পত্রিকা", গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের জন্য "বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা"র (কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাদিত) নামোল্লেখ করা চলে। প্রথমে প্যারীচরণ সরকার এবং পরে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় "এডুকেশন গেজেট" একটি উৎকৃষ্ট সাপ্তাহিকে পরিণত হয়। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" প্রধানত রাজনীতি বিষয়ক আলোচনা এবং কিছু কিছু সাহিত্যসমালোচনার জন্য খ্যাতিলাভ করে। "বিবিধার্থ সংগ্রহে"র উত্তরসূরী রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত "রহস্য সন্দর্ভ"ও সমকালে একখানি [illegible]

এখানেই বাংলা সাময়িক পত্রের প্রথমযুগের অবসান ঘটে। "বঙ্গদর্শন" পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা সাময়িক পত্র নবতর স্তরে উন্নীত হয়।

রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)

পরিচয়॥ পাণ্ডিত্য, ব্যক্তিত্ব এবং কর্মক্ষমতার সার্থক সমন্বয় হয়েছে রামমোহনের চরিত্রে। সংস্কৃত, আরবী, ফারসী, ইংরেজী, উর্দু ও বাংলা এই কটি ভাষায়ই ছিল তাঁর গভীর জ্ঞান। মূল বাইবেল পড়বার জন্য তিনি প্রাচীন হিব্রু ভাষা শিখেছিলেন। কর্মযোগী রামমোহনের চেষ্টাই এদেশে সতীদাহ প্রথা নিবারণের প্রধান কারণ। খ্রীষ্টান মিশনারীদের সঙ্গে তর্ক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তিনিই এদেশে খ্রীষ্টধর্মের অগ্রগতি রুদ্ধ করেন। ঔপনিষদিক হিন্দুধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করে ব্রাহ্মধর্মের প্রচলনও তাঁরই কীর্তি। প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতি পরিহার করে আধুনিক য়ুরোপীয় শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি মধ্যযুগের বন্ধন থেকে দেশবাসীর মুক্তির ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জাতীয়স্বাধীনতার স্পষ্ট চেতনাও তাঁরই মধ্যে প্রথম অঙ্কুরিত হতে দেখি। তিনি বেদান্তদর্শনের বিশুদ্ধ জ্ঞানযোগ এবং সমাজ-সংস্কার, শিক্ষাসংস্কার-কেন্দ্রিক কর্মযোগকে সমন্বিত করেছিলেন। ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি ভারতের প্রাচীন আদর্শের পক্ষপাতী, শিক্ষা ও সমাজাদর্শের দিক থেকে তিনি পাশ্চাত্য ভাবনার ভাবুক। রামমোহনের জীবন ও কর্মে, তাঁর মুক্তবুদ্ধি, যুক্তিবাদে বিশ্বাস, সুগভীর মানবতাবাদ, প্রাচীন শাস্ত্রাদি উদ্ধারের চেষ্টা সব কিছু মিলিয়ে নবজাগৃতির পূর্ণ রূপ প্রতিবিম্বিত।

সাময়িক পত্র পরিচালন॥ রামমোহনের "সম্বাদ কৌমুদী" নামক পত্রিকা ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুর মিশন প্রচারিত সাময়িক পত্রিকায় হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রকাশিত হতে দেখে তিনি তাঁর পত্রিকায় এর তীব্র প্রতিবাদ করতে থাকেন। এ ছাড়াও নানাবিধ সারগর্ভ প্রবন্ধে এই সাপ্তাহিক পত্রিকার কলেবর পূর্ণ থাকত। রামমোহন রায় একটি ইংরেজী এবং একটি ফার্সী পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

প্রাবন্ধিক রামমোহন॥ রামমোহন কয়েকখানা উপনিষদের অনুবাদ করেন। বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে তাঁর দু'খানা মৌলিক গ্রন্থও প্রকাশিত হল— "বেদান্তগ্রন্থ" ও "বেদান্তসার" (১৮১৫)। দুই খণ্ডে "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক ও নিবর্তক সম্বাদ" (১৮১৮ এবং ১৮১৯) এবং "গৌড়ীয় ব্যাকরণ"

তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এ ছাড়া তাঁর বিতর্কমূলক কয়েকখানি গ্রন্থেরও নাম করা উচিত; যেমন "ভট্টাচার্যের সহিত বিচার", "গোস্বামীর সহিত বিচার", "পথ্যপ্রদান," "কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার" প্রভৃতি। রামমোহন তিরিশখানা বাংলা গ্রন্থ রচনা করেন, এ ছাড়া বহু ইংরেজী ও সংস্কৃত গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। রামমোহনের ব্যক্তিত্বের যে পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে তাঁর রচনাবলীর মধ্যে তারই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থাবলী চিন্তার স্বাধীনতা এবং সিদ্ধান্তের মৌলিকতা যেমন ধরে রেখেছে তেমনি রামমোহনের সমগ্র ব্যক্তিত্বকেও যেন প্রকাশ করেছে, যে-ব্যক্তি ধর্মে প্রাচ্য হলেও সামাজিক ও ব্যক্তিগত আচারে, শিক্ষাগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক মতবাদে পাশ্চাত্যানুসারী, যিনি জ্ঞানমার্গী বৈদান্তিক হয়েও বিষয়কর্মে সুঅভিজ্ঞ।

ভাষারীতি॥ রামমোহনের হাতেই বাংলা গদ্যভাষা প্রথম আভিজাত্য লাভ করল। এর পূর্বে স্কুল কলেজে পাঠ্য করবার জন্যই গদ্যে নানাবিধ পশুপক্ষীর কাহিনী, ভূগোল পরিচয় বা বালসেব্য সেকালীন উপকথাসমূহ সঙ্কলিত হত। রামমোহন বাংলা শিশুগদ্যে বেদান্ত-উপনিষদের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন। প্রাচীন শাস্ত্রের প্রমাণে এবং যুক্তির প্রবলতায়, বিতর্কের তীক্ষ্ণ শরচালনায় তাঁর গদ্য এক কঠিন পৌরুষ লাভ করল। বাংলা গদ্যে যে গুরুগম্ভীর বিষয়ের আলোচনা সম্ভব তিনিই প্রথম দেখিয়ে দিলেন। ফলে বাংলা শিশুগদ্য কিছু নুয়ে পড়ল, পদচারণায় কিছু স্খলন এবং অস্বাচ্ছন্দ্য দেখা দিল। দুরূহ বিষয়বস্তুর আলোচনায় সরসতা ও সরলতা সম্পাদনের কথাই তখন উঠত না, কারণ বাংলা গদ্যে দুরূহ বিষয়বস্তু আলোচনার সম্ভাবনাই রামমোহনের পূর্বে কেউ দেখতে পান নি। রামমোহনের গদ্য যে সরল ছিল না এজন্য তাই তাঁকে অভিযুক্ত করা চলে না। তবে পূর্ববর্তী অনেকের তুলনায় তিনি ভাষাকে জড়ত্ব ও অকারণ কাঠিন্য থেকে অনেকটা মুক্ত করেছিলেন।

সব দিক দিয়ে বিচার করলে রামমোহন রায়কে বাংলা ভাষার প্রথম প্রাবন্ধিক (বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের রচয়িতা) বলে অবশ্যই অভিহিত করা যায়।

রামমোহনের রচনা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করলে তাঁর ভাষার পৌরুষ এবং যুক্তিপ্রাণতার পরিচয় যেমন মিলবে তেমনি দেখা যাবে পদবিন্যাসের [illegible] তিনি বাংলা ভাষার [illegible] অনেকখানি আবিষ্কার করতে

পেরেছিলেন। রামমোহন খ্রীষ্টীয় মিশনারীদের ধর্মপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করে লিখেছিলেন, "শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এ-দেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে কাহারো ধর্ম্মের সহিত বিপক্ষতাচারণ করেন না…কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিশনারি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খ্রীষ্টান করিবার যত্ন নানাপ্রকারে করিতেছেন। …যগুপিও যিশুখ্রীষ্টের শিষ্যেরা সধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্ম্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেইরূপ মিশনারিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্বল ও দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্ম্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্বলের মনঃপীড়াতে সর্বদা সঙ্কুচিত হয়েন…।" কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি উপযুক্ত বিরতি চিহ্ন দিয়ে পড়লে বোঝা যায় যে ভাষার পদবিন্যাস রীতি রামমোহন অনেকটা আয়ত্ত করেছিলেন।

একটি ঐতিহাসিক সমস্যা॥ রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যের জনক বলে অনেকে অভিহিত করে থাকেন। এই অভিমতের যাথার্থ্য বিচারের অপেক্ষা রাখে। বাংলা সাহিত্যিক গদ্যের ভিত্তিস্থাপনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের দান অবশ্যস্বীকার্য। এঁরা সকলেই রামমোহনের পূর্ববর্তী। এঁদের অনেকের তুলনায় রামমোহনের ভাষারীতি উন্নত। কিন্তু পনর বৎসর কাল ভাষারীতির বিবর্তনে যে কিছু প্রভাব বিস্তার করবে তা সহজেই অনুমেয়। বিষয়বস্তুর গাম্ভীর্য ও গৌরবের দিক থেকে অবশ্য রামমোহন পূর্ববর্তী এবং সমকালীন গদ্যলেখকদের অনেকটা ছাড়িয়ে গিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার তাঁর বহু পূর্বেই বাংলা গদ্যকে সাহিত্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। সাধু ও চলিত ভাষা নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর গদ্য রামমোহন রায়ের তুলনায় অগ্রবর্তী। সমকালীন

লেখকদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নক্‌সাগুলিতেও কিছু সাহিত্যগুণ সমন্বিত গদ্য ব্যবহার করেছেন।

তাই রামমোহনকে বাংলা গদ্যের উল্লেখযোগ্য লেখক এবং প্রথম প্রাবন্ধিক বলে অভিনন্দিত করলেও জনক বলে অভিহিত করা চলে না।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৭৮৭-১৮৪৮)

পরিচয় ॥ সমকালীন সমাজজীবনে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের অগ্রগণ্য নায়ক হিসেবে ইংরেজসংস্পর্শের প্রথম যুগে সামাজিক বিপ্লবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। সাংবাদিক এবং গ্রন্থকার হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল, তার্কিক হিসেবে তিনি বিপক্ষদলের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সাময়িক পত্র পরিচালন ॥ রামমোহন রায়ের সহিত যুক্তভাবে তিনি সাময়িক পত্র পরিচালনায় অগ্রসর হন। ১৮২১ সালে খ্রীষ্টান মিশনারীদের নিন্দাবাদের জবাব দিতে গিয়ে এঁরা দুজন যুক্তভাবে "সম্বাদ কৌমুদী" প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির প্রথম তেরো সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরে সংস্কারপন্থী রামমোহনের সঙ্গে সনাতনপন্থী ভবানীচরণের মতভেদ ঘটে। তিনি "সম্বাদ কৌমুদী" পরিত্যাগ করে "সমাচার চন্দ্রিকা" প্রকাশ করেন ১৮২২ সালে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি (পরে এখানি সপ্তাহে দুবার প্রকাশিত হতে থাকে) রক্ষণশীল হিন্দুদের মুখপত্র হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে খ্রীষ্টান মিশনারী অন্যদিকে সংস্কারপন্থীদের বিরুদ্ধে ভবানীচরণ বিশেষ যোগ্যতার সঙ্গে আদর্শের সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

গ্রন্থপরিচয় ও ভাষারীতি ॥ ভবানীচরণ ব্যঙ্গাত্মক নক্‌সা জাতীয় গ্রন্থ রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর "কলিকাতা কমলালয়" (১৮২৩)' "নববাবু বিলাস" (১৮২৫) এবং "নববিবি বিলাস" সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রচনা। গ্রন্থগুলিতে সমকালীন কলকাতার মূর্খ ধনাঢ্য ব্যক্তিদের প্রতি বিদ্রূপ বাণ নিক্ষিপ্ত হয়েছে। বাংলা গদ্যভাষার প্রথম যুগে রচিত এই নক্‌সাগুলিতে তিনি ব্যঙ্গরস সঞ্চারে যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তার মূল্য স্বীকার করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, "তাঁহারই স্পর্শে বঙ্গ সাহিত্যের 'শুষ্কং কাষ্ঠং' ধীরে ধীরে 'নীরস তরুবরঃ' হইয়া উঠিবার লক্ষণ প্রকাশ করে, তিনিই সর্বপ্রথম সাহিত্যের দর্পণে বাবু ও বিবি বাঙালীকে নিজ নিজ মুখ দেখাইয়া আত্মস্থ হইতে শিক্ষা দেন; পথভ্রান্ত

বাঙালীকে মানুষ করিয়া তুলিবার প্রথম ইঙ্গিত তাঁহার রচনাতেই আমরা দেখিতে পাই।" তাঁর গদ্যরীতির সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব ব্যঙ্গরস সৃষ্টির সার্থকতায়, কিন্তু রামমোহনের তুলনায় তাঁর ভাষায় পদবিন্যাস সফলতর এরূপ দাবি করা চলে না।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১)

পরিচয় ॥ সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার, পাণ্ডিত্য, দয়ার্দ্রচিত্ততা ও তেজস্বিতায় বিদ্যাসাগর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের একক ব্যক্তিত্ব। স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য তাঁর চেষ্টা, বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিরোধ সম্পর্কে তাঁর দুর্দম কর্মকাণ্ড একালেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়ে থাকে। আধ্যাত্মিক চিন্তা ও দার্শনিক ভাবনার দ্বারা কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে এই মানবদরদী মহাপণ্ডিত দেশের কল্যাণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মানবতাবাদ তাঁর চরিত্রে যেন অনায়াসে চরিতার্থ হয়েছিল। মধুসূদন কবির সত্যদৃষ্টি নিয়ে তাঁর চরিত্রের মূল রহস্যটি উদ্ঘাটন করে লিখেছিলেন, "The man to whom I have appealed has the genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man and the heart of a Bengali mother." বিদ্যাসাগরের অন্যতম পরিচয় বাংলা গদ্যের সার্থক শিল্পপ্রাণের আবিষ্কর্তা হিসেবে। রামমোহন বাংলা গদ্যকে দুরূহ দার্শনিক বিষয়সমূহের আলোচনায় নিযুক্ত করে তার ভিত্তি দৃঢ় করেছিলেন। বিদ্যাসাগর তার মধ্যে প্রাণসঞ্চার করলেন। সৌন্দর্য আবিষ্কার করলেন।

গ্রন্থাবলী ॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রথম রচনা "বাসুদেব চরিত" পাওয়া যায় নি। ১৮৪৭ সালে তিনি লেখেন "বেতালপঞ্চবিংশতি"। গ্রন্থটি হিন্দী "বেতাল পচ্চীসী" নামক গ্রন্থের অনুবাদ। তাঁর "শকুন্তলা" (১৮৫৪) কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলম্" নাটকের গদ্যানুবাদ। "সীতার বনবাস"ও (১৮৬০) অনুবাদমূলক গ্রন্থ। ভবভূতির উত্তররামচরিত এবং বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে এটি রচিত। "মহাভারতের উপক্রমণিকা"য় মূল মহাভারত অনুসৃত হয়েছে। ইংরেজী গ্রন্থাদির অনুবাদমূলক কয়েকটি রচনাও তাঁর আছে। "বাঙ্গালার ইতিহাস" (১৮৪৮) মার্শম্যানের History of Bengal-এর অনুবাদ। "জীবনচরিত" (১৮৪৯) চেম্বার্সের Biographies-এর অনুসরণ। "বোধোদয়" (১৮৫১) ঐ একই লেখকের

Rudiment of knowledge অবলম্বনে রচিত। ঈশপ ফেবলের অনুবাদের নাম দিয়েছেন "কথামালা" (১৮৫৬), সেক্সপীয়রের "কমেডি অব এররস" তাঁর হাতে পরিণত হয়েছে "ভ্রান্তিবিলাসে" (১৮৬৯)। লক্ষণীয়, বিদ্যাসাগরের অনুবাদ গ্রন্থগুলি মূলত আখ্যানধর্মী।

বিদ্যাসাগর মৌলিক প্রবন্ধগ্রন্থও অনেকগুলি রচনা করেছেন। "সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৩) সমালোচনামূলক রচনা। দুইখণ্ডে "বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৫) এবং দুই খণ্ডে "বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" (১৮৭১,৭৩) তাঁর সমাজসংস্কার-কর্মের সাহচর্য করেছে। এই নিয়ে যে-সব বিতর্কের ঝড় উঠেছে তাতে স্বয়ং যোগ দিয়ে তিনি ছদ্মবেশে কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক রচনা লিখে প্রতিপক্ষকে বিক্ষত করেছেন। এদের মধ্যে "অতি অল্প হইল", "আবার অতি অল্প হইল", "ব্রজবিলাস" প্রভৃতির নাম করা চলে। এ ছাড়া গুটিদুয়েক আত্মনিষ্ঠ প্রবন্ধও তিনি লিখেছিলেন, "প্রভাবতী সম্ভাষণ" (আনুমানিক ১৮৬৩) এবং "বিদ্যাসাগর চরিত"।

প্রাবন্ধিক বিদ্যাসাগর॥ প্রাবন্ধিক বিদ্যাসাগর কতকটা রামমোহন রায়ের ধারাকে অনুসরণ করেছেন। 'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক নিবর্তক সংবাদে'র অনুস্মৃতি আছে তাঁর বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ সম্পর্কিত গ্রন্থ দুইটিতে। তথ্য, তত্ত্ব, যুক্তি এবং প্রমাণে তাঁর সিদ্ধান্তগুলিকে তিনি প্রায় ছিদ্রহীন করে তুলেছেন। তার উপরে ভাষার লালিত্য আদ্যন্ত এদের প্রাণবন্ত করে রেখেছে। কিন্তু তবুও একথা স্বীকার করতে হবে বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধগুলি সমাজসংস্কার-কর্মের অনুচররূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। স্বাধীন প্রবন্ধের মর্যাদা স্বয়ং লেখক এদের দিতে চান নি। বিষয়বস্তুর সামাজিক গুরুত্ব, বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব এবং ভাষার চমৎকারিত্বের কথা বাদ দিলে বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ হিসেবে এদের মূল্য সমকালীন প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমারের তুলনায় যে অনেক কম তাতে সন্দেহ নেই।

সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সমালোচনামূলক যে ক্ষুদ্র গ্রন্থটি বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন তার বিশিষ্টতা ও ঐতিহাসিক মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। সংস্কৃত [illegible]্য সম্পর্কে বাংলাভাষায় লেখা সমালোচনার এই সূত্রপাত। এর পূর্বে কোন ভারতবাসী সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করেন [illegible]। সমালোচনা হিসেবেও বিদ্যাসাগরের মৌলিকতা আছে। রসশাস্ত্রের

একান্ত আনুগত্য স্বীকার করার প্রয়োজনীয়তা তিনি সর্বত্র অনুভব করেন নি।

'প্রভাবতী সম্ভাষণে' একটি ক্ষুদ্র বালিকার মৃত্যুতে বিদ্যাসাগরের শোকাপ্লুত হৃদয় আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথমযুগের আত্মগৌরবী রচনা হিসেবে এর মূল্য আছে। বিদ্যাসাগরের স্বরচিত আত্মজীবনীর ভঙ্গিটি বেশ সরস। তবে রসপ্রধান রচনা হিসেবে তাঁর ছদ্মনামে লেখা ব্যঙ্গ-পুস্তিকাগুলি সর্বাপেক্ষা মনোরম। সমকালে বিতর্ক হিসেবে এর মূল্য ছিল। সাম্প্রতিক কালে এতে প্রকাশিত ব্যঙ্গরসটিই আমরা উপভোগ করি। প্রতিপক্ষের মূঢ়তা, দুষ্টবুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যাভিমান এখানে তীক্ষ্ণ ভাবে আহত হয়েছে। তবে কোথাও তিনি রুচিভ্রষ্ট হন নি। তৎকালীন বাংলা গদ্যে এরূপ উচ্চাঙ্গের রসিকতা অল্পই ছিল।

ভাষারীতি॥ রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগরের ভাষারীতি সম্বন্ধে বলেছেন, "বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন—এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাব-প্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনানীর রচনা-কর্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথম তাঁহাকে দিতে হয়।"

কিন্তু বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের বিশৃঙ্খল জনতাকে কি কৌশলে সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনীতে পরিণত করলেন তার পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত, তিনি বাংলা ভাষার নিজস্ব পদসংস্থানরীতি আবিষ্কার করলেন। সংস্কৃত ভাষা বিভক্তি-প্রত্যয়মূলক, এদের বলে inflexional। এ-ভাষার পদবিন্যাস রীতির অধীন নয়। বাংলা ভাষা analytical। নির্দিষ্ট পদবিন্যাস ব্যতীত এ-ভাষার অর্থবোধই সম্ভব নয়। পদবিন্যাসে শৃঙ্খলা আনলে এ-ভাষার শ্রী ফিরে যায়, বহুবিধ জড়ত্বের অবসান হয়, ভাষা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও সংস্কৃত থেকে বাংলার প্রাণধর্মের এই মূল পার্থক্যটি বুঝেছিলেন। তাই শব্দচয়নের ক্ষেত্রে তিনি সংস্কৃত শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদের প্রতি কিছু বেশি আকর্ষণ দেখালেও তাঁর হাতে বাংলা গদ্য মুক্তি পেয়েছে, সংস্কৃতের দাসত্ব করে চলে নি।

দ্বিতীয়ত, তিনি বাংলা গদ্যের মধ্যেও ছন্দের অস্তিত্ব অনুভব করলেন। নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট পরিমাণ বিরতির সাহায্যে এই গদ্যের মধ্যে প্রাণপ্রবাহ

কল্লোলিত করা যেতে পারে এ-সত্য তিনি বুঝেছিলেন। এই কারণেই নানা ধরনের সুপ্রচুর বিরাম চিহ্ন ব্যবহার করে সেই ছন্দসঙ্গীতটি তিনি পাঠকের কানে ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

বিদ্যাসাগরের গদ্যের তৃতীয় বৈশিষ্ট্যটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ। ডাঃ সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "বিভিন্ন বাংলা শব্দের পরস্পর সমাবেশে অভিধানগত অর্থ ব্যতিরেকেও যে আর একটি অবর্ণনীয় রসের সৃষ্টি হইতে পারে, এই অপূর্ব সত্য তিনিই সর্বপ্রথম মনে মনে অনুভব করিয়া, লেখনীর মুখে তাহার সম্ভাবনাও তাঁহার স্বদেশবাসীকে দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন, এবং তাহার ফলেই শতাব্দীপাদের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এবং অর্ধশতাব্দীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে।" উদাহরণ হিসেবে "সীতার বনবাসে"র সামান্য একটু অংশ উদ্ধৃত করা হল—"এই সেই জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবণগিরি। এই গিরির শিখরদেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধর-মণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ পাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে, সতত স্নিগ্ধ, শীতল, ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্ন সলিলা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।" এই অংশটি আভিধানিক অর্থের সাহায্যে উক্ত স্থানের একটি পরিচিতি মাত্র দিয়ে নিবৃত্ত হয় না। সংবাদ পরিবেশন ছাপিয়ে একটা ভাবলোকে পাঠককে নিয়ে যায়। মনে হয়, সত্যই যেন আমরা প্রস্রবণগিরির নিকটে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি। সেই প্রদেশের স্নিগ্ধ শীতলতা এবং ছায়াঘন শান্ত পরিবেশটি যেন লেখক আমাদের মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়েছেন। এই কাজটি বিশুদ্ধ রসসাহিত্যের কাজ। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে প্রয়োজনের সীমা ছাড়িয়ে রসের রাজ্যের ছাড়পত্র দিয়েছেন। তিনি পূর্ববর্তী অনুবাদক-দের মত গালগল্পের প্রতি না ঝুঁকে কালিদাস-সেক্সপীয়রের ন্যায় উচ্চ প্রতিভার আশ্রয় নিয়েছেন। আখ্যান গ্রন্থের আশ্রয়েই তার অভিপ্রেত রসের উদ্বোধন সম্ভব একথা তিনি বুঝেছিলেন। তাঁর গদ্যগ্রন্থে কাহিনীর মৌলিকতা বিষয়ে প্রশ্ন তোলা অসমীচীন, তিনি ভাষানির্মাণ করেছেন, কাহিনী-সৃষ্টির ভার পরবর্তীদের উপরে দিয়ে গিয়েছেন॥

[illegible]কুমার দত্ত (১৮২০—৮৬)

রিচয়ছিলেন॥ অক্ষয়কুমার দত্ত আজীবন জ্ঞানসাধক ছিলেন। শৈশবে ফার্সি [illegible]সংস্কৃত ভাষা শেখেন। পরে তিনি আরও নানা ভাষা এবং বিবিধ মানববিদ্যা

আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর জীবনচরিতকার লিখেছেন, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারিতে পাঠকালে তিনি জনৈক ইংরেজ শিক্ষকের নিকট "কিছু গ্রীক, লাটিন, হিব্রু, জার্মান ভাষা অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। ইলিয়ড, বার্জিল, পদার্থবিদ্যা, ভূগোল, জ্যামিতি, বীজগণিত, ত্রিকোণমিতি, উচ্চ অঙ্গের গণিতশাস্ত্র, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ও ইংরাজি সাহিত্যবিষয়ক ভাল ভাল গ্রন্থ অল্প বা বিনা সাহায্যে অধ্যয়ন করেন। বিজ্ঞানের প্রতি ইঁহার স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ ছিল।" সুপ্রচুর অধ্যয়ন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং আধ্যাত্মিকতাবিমুখ বস্তুনিষ্ঠা অক্ষয়কুমারকে বাংলাদেশের নবযুগের এক প্রধান পুরুষে পরিণত করেছে। এই মনীষা নিয়ে তিনি বাংলা গদ্যরচনা এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে পদার্পণ করে তাকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন।

সাময়িকপত্র পরিচালন ॥ ঈশ্বর গুপ্তের "সংবাদ প্রভাকরে" অক্ষয়কুমারের সাংবাদিকতা এবং গদ্যরচনার হাতেখড়ি। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "বিদ্যা-দর্শন" নামে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। বিভিন্ন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের প্রচারই এ-পত্রিকার উদ্দেশ্য রূপে বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। পত্রিকাটি অল্পকালই বেঁচেছিল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্ররূপে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" স্থাপন করেন (১৮৪৩)। অক্ষয়কুমার প্রতিযোগিতা পরীক্ষা দিয়ে পত্রিকাটির সম্পাদকপদে বৃত হন। তিনি দীর্ঘ বারো বৎসর পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যানাদির প্রকাশই এই পত্রিকাটির লক্ষ্য ছিল। অক্ষয়কুমারের মত জ্ঞানসাধকের হাতে পড়ে পত্রিকাটি লক্ষ্য থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হল। সেই বিচ্যুতি বাংলা সাহিত্যের উন্নতিতে সহায়ক হয়েছে। তিনি সাহিত্য-বিজ্ঞান-পুরাতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশ করে বাংলাভাষার ক্ষমতা এবং বাংলা সাহিত্যের পরিধি বাড়িয়ে দিলেন। "তত্ত্ববোধিনী"ও প্রথম শ্রেণীর পত্রিকায় পরিণত হল, এর জনপ্রিয়তা বিস্ময়করভাবে বৃদ্ধি পেল।

প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার ॥ অক্ষয়কুমার "ভূগোল", "পদার্থবিদ্যা" প্রভৃতি দুই-একখানি পাঠ্যপুস্তকশ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কিন্তু "পদার্থ-বিদ্যা"র মত গ্রন্থের মধ্য দিয়েই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে সর্বজনবোধ্য বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার (Popular Science) প্রবেশ ঘটল। বৈজ্ঞানিক নানা তত্ত্বকে সাধারণ শিক্ষিত পাঠক শ্রেণীর উপযোগী করে রচনা করা চি[illegible]ই প্রবন্ধসাহিত্যের এক বিশিষ্ট অবদান হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলা [illegible] প্রব[illegible] প্রথম যুগেই অক্ষয়কুমার বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করে এক সুস্থ ঐতিহ্য[illegible]

করেছেন। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মত সাহিত্যিক-শিল্পীরাও সযত্নে এই ধারার অনুবর্তন করেছেন। তাঁর তিনখণ্ডে সঙ্কলিত "চারুপাঠ" (১৮৫৩-৫৪ এবং ৫৯) নানা ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হলেও মৌলিকতা বর্জিত নয়। এদের মধ্যে অনেকগুলি জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ গ্রন্থিত হয়েছে। "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" (১ম ১৮৫১, ২য় ১৮৫৩) জর্জ কুম্ব প্রণীত "কন্স্টিটিউশন অব ম্যান" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। "ধর্মনীতি"তেও কুম্ব এবং অপরাপর ইংরেজ লেখকদের অনুসরণ আছে। উইলসন সাহেবের ইংরেজী গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত দুইখণ্ডে "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গ্রন্থদ্বয় যথাক্রমে ১৮৭০ এবং ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত হলেও "ন্যূনাধিক ২২ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়।" গ্রন্থটির পরিকল্পিত তৃতীয় খণ্ড তিনি সামান্যই লিখেছিলেন। "প্রাচান হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যবিস্তার" নামে তাঁর একটি সুবৃহৎ প্রবন্ধ "তত্ত্ববোধিনী"তে প্রকাশিত হয়েছিল।

অক্ষয় দত্তের রচনা ইংরেজী ভাষার জ্ঞানরাজিকে অবলম্বন করলেও তাঁর মৌলিকতায় সন্দেহ করা চলে না। তিনি ইংরেজী গ্রন্থকে আশ্রয় করলেও তার অনুবাদ করেন নি; প্রতিটি ক্ষেত্রে আপন মতামত ব্যক্ত করেছেন। অপরের তথ্য এবং চিন্তাপ্রণালীকে তিনি এমনভাবে সাজিয়েছেন যার মধ্যে নিজের মৌলিক চিন্তাধারাটি প্রকাশ পেয়েছে। কখনও আবার সঙ্কলিত জ্ঞান-রাজিকে শুধু বর্ণনরীতির কৌশলে একেবারে অভিনব করে তুলেছেন, এই প্রসঙ্গে "চারুপাঠে"র স্বপ্ন-দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির কথা স্মরণ করা যেতে পারে। চারুপাঠে প্রকাশিত তাঁর স্বদেশানুরাগও সেকালের পক্ষে কম বিস্ময়কর নয়। তাঁর "বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" কুম্বের গ্রন্থ অবলম্বন করলেও এর মৌলিকতা দৃষ্টি এড়াবার নয়। তিনি উদাহরণগুলি এদেশের উপযোগী করে গ্রহণ করেছেন, য়ুরোপীয় জীবনচর্যার যে অংশটুকু অনুসরণীয় নয় বলে মনে করেছেন তাকে বর্জন করতে দ্বিধা করেন নি। বিশেষত কুম্বের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির গোড়ায় পার্থক্য ছিল। কুম্ব বস্তুতন্ময় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি এবং মধ্যযুগসুলভ ধর্মীয় অলৌকিকতায় বিশ্বাসকে এক সঙ্গে অন্তরে স্থান দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কে বড় চিন্তিত ছিলেন না। তাঁর মতে প্রকৃতি-জগতের বাহিরে ঈশ্বর নেই, প্রাকৃতিক নিয়মের অনুসরণই ঈশ্বরসাধনা। "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থটিও

উইলসনের লেখার অনুসরণমাত্র নয়। ভূমিকায় অক্ষয়কুমার লিখেছেন, "স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্তন, পরিবর্জন ও সংযোজন করা হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন, এই প্রথমভাগে রামসনেহী, বিথলভক্ত, কর্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, দরবেশ, বলরামী প্রভৃতি আর ২২ বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ অনুরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটির বৃত্তান্ত পুস্তকান্তর হইতে নীত, অবশিষ্ট ২০ কুড়িটির বিষয় নূতন সঙ্কলিত।" এরূপ ঐতিহাসিক নিষ্ঠা ও গবেষকসুলভ পরিশ্রম বাংলা প্রবন্ধের প্রথম যুগের পক্ষে যেমন বিস্ময়কর তেমনি বর্তমানেও একান্ত সুলভ নয়। তাঁর হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা ও বহির্বাণিজ্য বিষয়ক প্রবন্ধটিও মৌলিক গবেষণার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

ভাষারীতি ॥ অক্ষয়কুমারের ভাষা সংস্কৃতানুগ, সমাসবদ্ধ শব্দের প্রয়োগ প্রচুর। তবে বিষয়বস্তু গুরুগম্ভীর হওয়ায় ভাষা তার উপযোগীই হয়েছে। তরল রচনারীতি লঘু বিষয়ের উপযুক্ত। বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস ও ধর্মতত্ত্বের গবেষণা এবং সমাজশিক্ষা লঘু ভাষায় প্রকাশ করবার নয়। তবে তাঁর ভাষা সরল-তরল-মধুর না হলেও জড় নয়। বিষয়বিন্যাসে যুক্তিক্রম, তথ্যপ্রমাণাদির উপস্থাপন এবং তত্ত্বব্যাখ্যান এই ভাষায় যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে সাধিত হয়েছে। ভাষার যে গম্ভীর পৌরুষ রামমোহনের মধ্যে বীজাকারে বর্তমান তাইই বিকশিত হয়েছে অক্ষয়কুমারে। ভূদেব প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে সেই ভাষারীতিই প্রবহমান।

বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার এই দুইজনের ভাষারীতির কিছু তুলনামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলা গদ্যের প্রথমযুগে এঁরা উভয়েই আবির্ভূত হয়ে তাকে সমধিক উন্নীত করে উত্তরাধিকারীকে দান করে যান। বিদ্যাসাগর ভাষার মাধুর্য ও সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তোলেন, অক্ষয়কুমারের হাতে তা যুক্তিবহ শক্তির দ্যোতক হয়ে ওঠে। "একজন রসসাহিত্যমূলক এবং অন্যজন বিজ্ঞান ও যুক্তিমূলক ভাষার সাহায্যে একইকালে মাতৃভাষার সাহিত্য সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন।" রমেশচন্দ্র দত্ত এঁদের ভাষারীতির তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, "In Vidyasagar's style we admire the placid stillness and soft beauty of quiet lake, reflecting on its bosom the gorgeous tints of the sky and the surrounding objects. In Akhaykumar's style we admire the vehemence and force of the mountain torrent in its wild and rugged beauty."।

প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)

পরিচয়॥ প্যারীচাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই ছদ্মনামে গ্রন্থাদি রচনা করতেন। তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল" (১৮৫৮) নামক ব্যঙ্গ আখ্যান তাঁকে সমকালে ও পরবর্তী যুগে সুপ্রচুর খ্যাতি দান করেছে। এছাড়া তাঁর উল্লেখ-যোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে "মদ খাওয়া বড় দায়, জাত রাখার কি উপায়" নামে মদ্যপানের নিন্দাসূচক ব্যঙ্গ-রচনা, "কৃষিপাঠ" নামক কৃষিবিষয়ক প্রবন্ধ, "যৎকিঞ্চিৎ" নামক ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনা এবং "অভেদী", "রামারঞ্জিকা" প্রভৃতি নীতিমূলক আখ্যানজাতীয় রচনা। "মাসিক পত্রিকা" নামক একটি পত্রিকা প্রকাশ করে সর্বজনবোধ্য সহজ ভাষার চর্চায় তিনি উৎসাহ দেখান।

ভাষারীতি॥ তাঁর "আলালের ঘরের দুলাল" গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলা গদ্যের প্রথমযুগে এই ভাষা একটি বিশিষ্ট ঐতিহ্যসৃষ্টির চেষ্টা করেছিল। গ্রন্থটির উপন্যাসধর্ম সম্পর্কে যে দাবি করা হয় প্রসঙ্গান্তরে তার বিচার করা হবে। বর্তমানে বাংলা গদ্যের বিকাশে এর ভাষারীতির দানটুকুই আলোচ্য।

প্যারীচাঁদের ভাষা সহজ ও সরল। সাধুভঙ্গিতে লিখবার নাম করে সংস্কৃত শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদের আড়ম্বরে বাংলা গদ্যকে প্রাণহীন ও দুর্বোধ্য করে তুলবার পক্ষপাতী ছিলেন না প্যারীচাঁদ। তাঁর ভাষা বোধগম্য, লোকের মুখের ভাষার অনেকটা নিকটবর্তী। তদ্ভব ও দেশী শব্দের অধিক ব্যবহারে এবং ভঙ্গির মধ্যে প্রাণরস সঞ্চার করায় এ-ভাষা সমকালীন অনেক লেখকের সাধুভাষা থেকে উন্নত মনে হবে। যেমন "রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে—কলুরা ঘানি জুড়ে দিয়েছে, বলদেরা গরু লইয়া চলিয়াছে—ধোপার গাধা থপাস থপাস করিয়া যাইতেছে—মাছের ও তরকারীর বাজরা হু হু করিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কোশা লইয়া স্নান করিতে চলিয়াছেন—মেয়েরা ঘাটে সারি সারি হইয়া পরস্পর মনের কথাবার্তা কহিতেছে।" প্যারীচাঁদ ছোট ছোট সরল বাক্যদ্বারা ভাব প্রকাশ করতে চাইতেন। ধ্বন্যাত্মক শব্দের ব্যবহার তাঁর ভাষার প্রাণরস বর্ধনে বেশ সহায়তা করেছে। কিন্তু এ-ভাষার মূল কাঠামোটি সাধু, ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম পদের দিকে তাকালে তা বোঝা যায়। অভিশ্রুতির পরিবর্তে অপিনিহিত ধ্বনির ব্যবহার, স্বরসঙ্গতির অনুপস্থিতি এবং অনুরূপ আরও কিছু লক্ষণের সাহায্যে বোঝা যায়, এ-ভাষা কথ্যরীতি নয়। সাধুরীতির সরল ও সুবোধ্য গদ্যই ছিল তাঁর লক্ষ্য। তবে ক্ষুদ্র বাক্য

ব্যবহারের অধিক প্রবণতা জটিল ও গভীর ভাব-ভাবনাকে প্রকাশ করতে বাধা দেয়। তা ছাড়াও প্যারীচাঁদের ভাষায় কোথাও কোথাও ফার্সী শব্দের আধিক্য পীড়াদায়ক হয়েছে। তবুও বাংলা গদ্যকে সরল করে তোলার চেষ্টায় তাঁর অবদান অবশ্যস্বীকার্য।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫)

পরিচয়॥ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সংসারধর্মের সঙ্গে সুগভীর আধ্যাত্মিক চেতনাকে সমন্বিত করেছিলেন। রাজা রামমোহন রায় স্থাপিত ব্রাহ্মসভাকে তিনিই ব্রাহ্মসমাজে রূপান্তরিত করেন। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" পরিচালনার ব্যাপারে তিনি বাংলা সাহিত্যের সংস্পর্শে আসেন এবং সচেতন সাহিত্যস্রষ্টা না হয়েও বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য, বিশেষ করে গদ্যভাষার অনেকখানি উন্নতিসাধন করেন।

দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য হিসেবে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেগুলিই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলিই মূলত দেবেন্দ্রনাথের সাহিত্যকৃতি। অবশ্য এর পূর্বেই তিনি কিছু গদ্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ "ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থ" এবং "আত্মতত্ত্ববিদ্যা" গ্রন্থহিসেবেই রচিত হয়েছিল ১৮৫০-এর কাছাকাছি সময়ে। বাকী সবই বক্তৃতার সঙ্কলন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য "ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস" (১৮৫৯—৬০ সালে, প্রদত্ত বক্তৃতাবলী), "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা" (১৮৬২), "মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ" প্রভৃতি। দেবেন্দ্রনাথের সবচেয়ে বিশিষ্ট ও সাহিত্য-গুণান্বিত গ্রন্থ "ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান" (দুই প্রকরণ ১৮৬০—৬১ সালে বিবৃত) এবং "আত্মজীবনী" (১৮৯৪ সালে সমাপ্ত)। শেষোক্ত গ্রন্থটিতে লেখকের আঠারো থেকে একচল্লিশ বৎসর পর্যন্ত জীবনকাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

ভাষা ও রচনারীতি॥ দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যানগুলি ঔপনিষদিক সত্য ও তত্ত্বের আলোচনায় পরিপূর্ণ। কিন্তু যুক্তি-তর্ক-প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্তকে অপরিহার্য করে তোলার কিছুমাত্র চেষ্টা এখানে লক্ষিত হয় না। ধর্মব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি আপনার অন্তরের উপলব্ধির কথাই বলেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ঔপনিষদিক সত্য দেবেন্দ্রনাথ আপনার সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, বুদ্ধি বা যুক্তি দিয়ে নয়। যেমন, "ভূলোকে দ্যুলোকে, আকাশে অন্তরীক্ষে, ঊষাকালে সন্ধ্যাকালে, শ্রদ্ধাবান্ একনিষ্ঠ

করেন। উষার উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্য উদিত হইয়া যখন অচেতন প্রাণিগণকে সচেতন করে; রূপহীন বস্তুসকলকে রূপবান্ করে; তখন সেই জ্যোতিষ্মান সূর্যের মধ্যে সেই প্রকাশবান্ বরণীয় পুরুষকে তাঁহারা দেখিতে পান।" অবশ্য এই-সব ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর গৌরব অর্থাৎ উপনিষদের ঋষিদের কল্পনার কবিত্বপূর্ণ সৌন্দর্য ও মাহাত্ম্যই অবিকৃতভাবে উপস্থিত হওয়ায় ভাষাসৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। এ-বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব হল এখানে যে তিনি সংস্কৃত ভাষার শব্দগুলিকে সযত্নে ব্যবহার করে ভাবের আনুগত্য যেমন বজায় রেখেছেন তেমনি বিদ্যাসাগর আবিষ্কৃত বাংলা গদ্যের পদবিন্যাস এবং ছন্দসঙ্গীতটিও সার্থক ভাবেই অনুসরণ করতে পেরেছেন; দুইয়ের সমন্বয় সাধনে তাঁর কৃতিত্ব অনস্বীকার্য।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "আত্মজীবনী"। এই আত্মজীবনী আবার ভারতভ্রমণে পরিপূর্ণ। আত্মকথন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ আপনার মনের ভাণ্ডার থেকে স্মৃতির মালা গেঁথে পাঠককে উপহার দিয়েছেন। কখনো হিমালয়ের উত্তুঙ্গ পার্বত্য প্রদেশের বর্ণনায়, কখনো দাবানলদগ্ধ বনানীর ভাষাচিত্র অঙ্কনে, কখনো গ্রাম্যজীবনের প্রতি মুগ্ধ দৃষ্টিপাতে এই আত্মজীবনীটি একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক রচনায় পরিণত হয়েছে। যেমন, "অরুণোদয়ে প্রভাতে আমি যখন সেই বাগানে বেড়াইতাম, যখন আফিমের শ্বেত পীত লোহিত ফুল সকল শিশির জলের অশ্রুপাত করিত, যখন ঘাসের রজত-কাঞ্চন পুষ্পদল উদ্যানভূমিতে জরির মসনদ বিছাইয়া দিত, যখন স্বর্গ হইতে বায়ু আসিয়া বাগানে মধু বহন করিত, তখন তাহাকে আমার এক গন্ধর্বপুরী বোধ হইত। কোন কোন দিন ময়ূর ময়ূরীরা বন হইতে আসিয়া আমার ঘরে ছাদের একতলায় বসিত এবং তাহাদের চিত্রবিচিত্র দীর্ঘপুচ্ছ সূর্যকিরণে রঞ্জিত হইয়া মৃত্তিকাতে লুটাইয়া থাকিত। একদিন মেঘ উঠিল, আর দেখি ময়ূরীরা মাথার উপরে পাখা উঠাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল। একি আশ্চর্য দৃশ্য! আমি যদি বীণা বাজাইতে জানিতাম তবে তাহাদের নৃত্যের তালে তালে তাহা বাজাইতাম।" লেখকের যে সৌন্দর্য দেখবার চোখ আছে এবং তা দেখাবার ভাষা আছে আত্মজীবনীতে তার অনেক উদাহরণ ছড়ানো আছে। অথচ তাঁর প্রকাশভঙ্গী বেশ সংযত, ভাষায় কোথাও চড়া রঙ নেই, বর্ণনায় নেই প্রগলভতা। তৎসম শব্দ এবং সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার সুমিত, ভাষাকে তা প্রায় কোথাও জটিল করতে পারে নি, চ্যুত করতে পারে নি প্রাণরস থেকে।

একটি ঐতিহাসিক সমস্যা ॥ প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক অজিতকুমার চক্রবর্তী দেবেন্দ্রনাথকে বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পী আখ্যা দিয়েছেন। এই অভিধার বিচার প্রয়োজন। ব্যাখ্যানগুলিতে দেবেন্দ্রনাথ গদ্য-শিল্পীরূপে নিজেকে যতটা প্রতিষ্ঠিত করেছেন তা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যরচনা থেকে কোন দিক থেকেই অগ্রগতির চিহ্ন বহন করে না। ১৮৬০ সালের কাছাকাছি সময়ে এই ব্যাখ্যানগুলি বিবৃত হয়। তার পূর্বে বিদ্যাসাগরের কয়েকটি প্রধান গদ্য-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের এই রচনাগুলি অনুবাদমূলক হলেও গদ্যভাষার সৌন্দর্য আবিষ্কারে তিনি মৌলিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন এদের মধ্যে। বাংলা গদ্যের শিল্পরূপের প্রতিষ্ঠা ঘটে সেখানেই। ১৮৬০ সালে কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্‌সা" প্রকাশিত হয়। এর গদ্যরীতিতে বাংলা চলিত ভাষা যে শিল্পরূপ লাভ করে তা সন্দেহাতীত ভাবেই বলা যায়। আর অজিত চক্রবর্তী মহাশয় যদি দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী"র অপরূপ ভাষাসৌরভের দিকে তাকিয়ে এ মন্তব্য করেন, তাহলেও তাকে ঐতিহাসিক সত্য বলে স্বীকার করা যায় না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে।

তবে দেবেন্দ্রনাথ যে বাংলাগদ্যের একজন উল্লেখযোগ্য শিল্পী একথা অবশ্যই মানতে হবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-৯৪)

পরিচয় ॥ ভূদেব মুখোপাধ্যায় আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, শিক্ষালাভ করেছিলেন হিন্দু কলেজে, মধুসূদনের ন্যায় পাশ্চাত্যপন্থী ব্যক্তিরা ছিলেন তাঁর সহপাঠী। এই বিপরীত প্রভাবের ফল তাঁর চরিত্রে ফলেছিল। হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সমাজ-জীবনকে অনুসরণ করাই তাঁর ব্রত ছিল, কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার দিকে পিছন ফিরে থাকবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। একজন বিখ্যাত সমালোচক তাঁর ব্যক্তিত্বের চমৎকার পরিচয় দিয়েছেন, "প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার গ্রন্থিস্বরূপ, মিলনবিন্দুস্বরূপ ভূদেব এদেশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধর্মে নিষ্ঠাবান ভক্তিযুক্ত হিন্দু, জ্ঞানে উদার সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক, শাস্ত্রে প্রগাঢ় চিন্তাশীল অধ্যাপক, সমাজে বহুদর্শী ধীর সংস্কারক, পরিবারে প্রীতিপরায়ণ কর্তব্যশরণ কর্মযোগী, স্বয়ং শত সহস্রের শিক্ষক অথচ আজীবন শিক্ষার্থী শিষ্য···।" এ পরিচিতি অযথার্থ নয়।

সাময়িক পত্রের পরিচালনা ॥ ১৮৬৪ সালে ভূদেব মুখোপাধ্যায়

"শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার" পত্রিকা প্রকাশ করেন। "শিক্ষাপ্রণালী প্রদর্শক এবং তৎসম্বন্ধীয় সংবাদ প্রদায়ক সাময়িক পত্রিকা" বলে এর আত্মপরিচয় দেওয়া হয়। চার বৎসরের অধিককাল পত্রিকাটি প্রচলিত থাকে।

১৮৫৬ সালে "এডুকেশন গেজেট" নামক যে বাংলা সাময়িক পত্র সরকারী তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয় তার পরিকল্পনাও ছিল ভূদেবের। কিন্তু প্রথমত সরকার কোন ভারতীয়কে পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করতে রাজী ছিলেন না। অবশেষে ১৮৬৮ সাল থেকে তিনি এর সম্পাদক হলেন। ভূদেবের অধিকাংশ রচনা, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতাবলী, নানাবিধ বিদ্রূপাত্মক রচনা এবং সাহিত্য সমালোচনা প্রকাশ করে তিনি পত্রিকাটিকে সমকালের একটি প্রধান সাময়িক পত্রের স্তরে উন্নীত করেন।

প্রাবন্ধিক ভূদেব ॥ গণিত ও প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিষয়ক কিছু ছাত্রপাঠ্য রচনা এবং "ঐতিহাসিক উপন্যাস" নামক গল্পগ্রন্থের কথা ছেড়ে দিলে ভূদেব প্রধানত ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রবন্ধের রচয়িতা রূপেই বাংলা সাহিত্যে আপনার স্থান করে নেন। ইতিহাসের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। "পুরাবৃত্তসারে" কয়েকটি প্রধান জাতির প্রাচীন বিবরণ সঙ্কলিত, "বাঙ্গালার ইতিহাসে" লর্ড বেন্টিঙ্কের শাসনকালের পরবর্তী যুগ বর্ণিত। এ ছাড়া আছে "ইংলণ্ডের ইতিহাস" এবং "রোমের ইতিহাস"। কিন্তু ইতিহাস বিষয়ে তাঁর আগ্রহ এই কয়টি ছাত্রসেব্য গ্রন্থের জন্ম দিয়েছে; মৌলিক গবেষণা এবং ব্যাখ্যানের প্রতি তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের এ এক অপূরণীয় ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে। ইতিহাসকে আশ্রয় করে যে মৌলিক গ্রন্থটি তিনি লিখেছেন "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" (১৮৯৫) বিষয়-কল্পনার অভিনবত্বে তা উল্লেখযোগ্য হলেও মননশীল ঐতিহাসিক নিবন্ধরূপে তা গ্রাহ্য হবে না। আলোচ্য গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায় তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে মারাঠা-শক্তির বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছেন, ভারতেতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে এই ঘটনার সুদূরপ্রসারী ফলাফলের চিত্র তিনি কল্পনা-বর্ণে রঞ্জিত করে অঙ্কিত করেছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় "বিবিধ প্রবন্ধ" গ্রন্থে কয়েকখানি সংস্কৃত নাটকের সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-প্রবন্ধাবলী এর আগেই প্রকাশিত হয়েছে, একথা মনে রাখলে এদের গুরুত্ব অধিক বিবেচিত হবে না। কিন্তু ভূদেবের মত প্রাচীনপন্থী ব্যক্তিও যে সাহিত্য-সমালোচনায় ধর্ম, নীতি ও প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভাব থেকে এতটা মুক্ত হতে পারেন তা দেখে বিস্মিত হতে হয়।

সামাজিক প্রবন্ধগুলিই ভূদেবের শ্রেষ্ঠ রচনা। চিন্তার সূক্ষ্মতা, স্বচ্ছতা, যুক্তিনিষ্ঠা এবং সিদ্ধান্তের মৌলিকতা এই রচনাগুলিকে "বিষয়গৌরবী" প্রবন্ধের মধ্যে বেশ উচ্চ স্থান দিয়েছে। "পারিবারিক প্রবন্ধ" (১৮৮২), "সামাজিক প্রবন্ধ" (১৮৯২) এবং "আচার প্রবন্ধ" তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। সামাজিক প্রবন্ধের ভূমিকায় ভূদেব বলেছেন, "স্বদেশীয় সমাজের বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে জাতীয়ভাব সংস্থাপিত এবং পরিবর্ধিত হইতে পারে কিনা, তাহার বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে যে, জাতীয়ভাব পরিগ্রহের পথ আমাদিগের পক্ষে একান্ত সংরুদ্ধ নহে।" গ্রন্থত্রয়ে ভূদেব কোন্ চিন্তাধারার অনুসরণ করেছেন এই ভূমিকায় তার ইঙ্গিত আছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায় এমন একটা সময় আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর মধ্যে বিদেশী শিক্ষার ফলে দেশীয় আচার-ব্যবহার, সমাজ-বোধ ও জীবন-দৃষ্টি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছিল। ভূদেব নিজের জীবনের কর্ম ও রচনার মধ্য দিয়ে নিরলস ভাবে ভারতীয় আদর্শ প্রচার করেছেন। পরিবার, সমাজজীবন এবং ব্যক্তিগত আচার-আচরণ সম্পর্কে তাঁর অনেক মতই বর্তমানে গ্রহণের অযোগ্য এবং অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যখন যুগের হাওয়ায় সব কিছুকে অস্বীকার ও পরিত্যাগ করাই ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তখন ভূদেবের এই সকল অভিমতের যে অনেকখানি মূল্য ছিল তা স্বীকার করতে হবে। ভূদেব অবশ্য ইংরেজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। এই শিক্ষাকে আমাদের চিরাচরিত জীবনযাত্রার সঙ্গে তিনি সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন। অতি-পশ্চিম-প্রীতি বাঙালীর পরিবার, সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবনকে যাতে বিপর্যস্ত না করতে পারে সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিল।

ভাষারীতি॥ ভূদেবের যুক্তিনিষ্ঠ পৌরুষ তাঁর ভাষাভঙ্গিতেও প্রতিফলিত। তাঁর ভাষারীতিতে কাব্যরস অল্প, গুরুগম্ভীর সংস্কৃতানুগত্য লক্ষণীয়। কিন্তু বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের ভাষা হিসেবে এর মূল্যও অস্বীকার্য নয়। "সাহিত্য সাধক চরিতমালা"য় ভূদেবের ভাষার পূর্বোক্ত দিকটির প্রতি সার্থক ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে, "বাঙালীর মন গীতিপ্রবণ, এইজন্য বাঙালীর সৃষ্ট সাহিত্য প্রধানতঃ গীতিধর্মী বা কাব্যপ্রধান। বাংলা সাহিত্যের গদ্যও ভাবুকতার সংস্পর্শে অল্পবিস্তর কাব্যায়িত; উপমা-লালিত্যে বাংলা গদ্য বড় বেশী কোমল; বড় বেশী মধুর হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় সাহিত্যে গদ্যকে যুক্তির ভাষা (language of reason) বলা হয়; এই

যুক্তির ভাষা বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত বিরল। যে দুই-চারিজন সাহিত্যিক সত্যকার গদ্য লিখিয়াছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান।”

কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-১৮৭০)

পরিচয় ॥ কালীপ্রসন্ন সিংহ মাত্র তিরিশ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু এই অত্যল্পকাল মধ্যে তিনি বাঙালী সমাজ এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য প্রভূত অবদান রেখে গিয়েছেন। বিচিত্র সমাজ-সংস্কার কার্যে, শিক্ষাবিস্তারে, সংবাদপত্র পরিচালনায়, সর্ববিধ দেশহিতৈষী কর্মতৎপরতায় এবং অমিত দানকর্মে তিনি প্রথম যৌবনেই সমাজের শীর্ষস্থানে আসন লাভ করেছিলেন। সমকালীন বাংলাদেশে এমন কোন প্রগতিশীল আন্দোলন ছিল না যাতে কালীপ্রসন্ন জড়িত ছিলেন না। বাংলা সাহিত্যে তাঁর পরিচয় নাট্যকার, সাংবাদিক এবং গদ্যশিল্পী হিসেবে। তাঁর অন্যতম কীর্তি কতিপয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তায় সমগ্র মহাভারতের অসংক্ষেপিত অনুবাদ প্রকাশ করা।

সাময়িক পত্র পরিচালন ॥ কালীপ্রসন্ন একাধিক সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি “বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা” নামে একটি মাসিক প্রকাশ করেন। কালীপ্রসন্নের অনেকগুলি চিন্তাদ্যোতক প্রবন্ধ এই ক্ষুদ্র পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিল। পরের বৎসর তিনি “সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা” নামে অপর একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করলেন। “সংবাদ প্রভাকরে” লেখা হল, “সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা অর্থাৎ প্রাণিবিদ্যা, ভূতত্ত্ববিদ্যা, ভূগোলবিদ্যা ও শিল্পসাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিক পত্রিকা”। অতঃপর মাত্র একুশ বৎসর বয়সে তিনি “বিবিধার্থ সংগ্রহে”র সম্পাদক মনোনীত হলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি দীর্ঘ ছয় বৎসর পত্রিকাটিকে যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত করে একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিকে উন্নীত করেন। রাজেন্দ্রলালের পরে কালীপ্রসন্ন সিংহের মত তরুণের হাতে এর সম্পাদনা ভার অর্পিত হওয়া থেকেই প্রমাণিত হয় সমকালীন সাহিত্য-সমাজে তাঁর স্থান কিরূপ উচ্চে ছিল। কিছুদিন তিনি “পরিদর্শক” নামে একটি দৈনিক সংবাদপত্রও পরিচালনা করেছিলেন।

ভাষা-শিল্পী ॥ কালীপ্রসন্ন সিংহ বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সেগুলি

পরিচয় মিলবে। সাহিত্যবোদ্ধা হিসেবেও তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এই সব ক্ষেত্রে তাঁর ভাষা গুরুগম্ভীর বিষয়ের উপযোগী বেশ গম্ভীর এবং বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্ত প্রবর্তিত সাধুরীতি অনুসারী। কিন্তু "হুতোম প্যাঁচার নক্শা" নাম দিয়ে তিনি একটি গ্রন্থ লিখলেন '১৮৬১-৬২ সালে। দ্বিতীয় ভাগের কিছু লেখা এর পরেও রচিত হতে পারে। এই গ্রন্থে গদ্য ভাষারীতিতে কালীপ্রসন্ন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করলেন। গ্রন্থটি আদ্যন্ত চলিত ভাষায় রচিত। কলকাতার কথ্য ভাষাকে অবিকৃতভাবে ও দ্বিধাহীন চিত্তে তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে স্থান দিলেন। একটু উদাহরণ নিলে দেখা যাবে এ-ভাষার চলিত রূপ কত অবিমিশ্র এবং প্রাণবন্ত—"এত দিন জুতোর দোকান ধূলো ও মাকড়সার জালে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু পূজোর মোরশুমে বিয়ের কনের মত ফেঁপে উঠ্‌চে; দোকানের কপাটে কাই দিয়ে নানারকম রঙ্গিন কাগজ মারা হয়েচে, ভেতরে চেয়ার পাড়া; তার নীচে এক টুক্‌রো ছেঁড়া কার্‌পেট। সহরে সকল দোকানেরই শীতকালের কাগের মত চেহারা ফিরেচে। যত দিন ঘুনিয়ে আস্‌চে, ততই বাজারের কেনাবেচা বাড়চে, ততই কলকেতা গরম হয়ে উঠ্‌চে। পল্লীগ্রামের টুলো অধ্যাপকেরা বৃত্তি ও বার্ষিক সাধ্‌তে বেরিয়েচেন, রাস্তায় রকম রকম তরবেতর চেহারার ভিড় লেগে গ্যাচে।" এর পূর্বে মৃত্যুঞ্জয় বা কেরীকৃত গ্রন্থে লোকের মুখের ভাষার উদাহরণ দিতে গিয়ে চলিত ভাষাকে সাহিত্যের এক প্রান্তে দীন আসন দেওয়া হয়েছিল। প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল"ও কথ্যরীতিতে সহজবোধ্য ভাষায় লেখা গ্রন্থ হলেও, এর কাঠামোটি সাধুরীতির; ক্রিয়া পদগুলি বা সর্বনামগুলি সাধু তো বটেই, চলিত ভাষার উচ্চারণভঙ্গিও ভাষায় বজায় রাখা হয় নি। কালীপ্রসন্নের হুতোম অবিমিশ্র চলিতে লেখা। পরবর্তীকালে বঙ্কিম যুগেও কোন গদ্যলেখকই চলিত ভাষার এই বিশুদ্ধি রক্ষা করে কিছু লিখতে পারেন নি। বিংশ শতক শুরু হবার প্রায় চল্লিশ বছর আগে কালীপ্রসন্ন গদ্যরীতির ক্ষেত্রে পরবর্তী শতকের জন্য মহামূল্য ঐতিহ্য রেখে গেলেন। ক্রিয়াপদ বা সর্বনাম পদগুলি, উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য (স্বরসঙ্গতি, অভিশ্রুতি, শ্বাসাঘাতের নির্দিষ্টতা প্রভৃতি), প্রবাদ-প্রবচনের সাবলীল ব্যবহার সব দিক থেকেই তিনি চলিত রীতিটিকে পরিপূর্ণভাবে আয়ত্ত করে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছিলেন।

"হুতোম প্যাঁচার নক্শা" নকশাজাতীয় রচনা, "আত্মগৌরবী" প্রবন্ধের (Subjective essay) শ্রেণীতে এর স্থান হওয়া উচিত। লেখক

সমকালীন কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল জীবনের উপরে ব্যঙ্গের কশাঘাত করেছেন। তাঁর নক্শাগুলিতে বুদ্ধিদৃপ্ত ব্যঙ্গহাস্য চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে। "আলালের ঘরের দুলালে"র সঙ্গে এ-গ্রন্থের তুলনা চলে না, কারণ সেখানে উপন্যাস-লক্ষণ মোটামুটিভাবে প্রকট। হুতোমের ভাষা চিত্ররচনায় নিপুণ। এ চিত্র বর্ণবহুল,—তার মধ্যে বাহিরের এবং লেখকের মনের দু'রকম বর্ণই মিলবে। কোথাও কোথাও ব্যঙ্গদৃষ্টি পরিহার করে স্মৃতি রোমন্থনের মধ্য দিয়ে চমৎকার রসরচনার জন্ম দিয়েছেন হুতোম। যেমন, "আমরাও সেই-গুলো (অর্থাৎ কবিতা) মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম—মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্য ফি পয়ার পিছু একটি করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোৎলা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাক ও পায়রাদের জন্য ছড়িয়ে দিতুম; আর আমাদের মুঞ্জুরী বলে একটি সাদা বেড়াল ছিল (আহা! কাল সকালে সেটি মারা গ্যাচে—বাচ্চাও নেই) বাকী সে প্রসাদ পেত।"

আরও কয়েকজন গদ্য লেখক

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫)॥ বাংলা গদ্যের প্রথম যুগে কৃষ্ণমোহন বেশ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। কিন্তু সম্ভবত খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করার জন্য সমকালীন অন্যান্য লেখক এবং সাময়িক পত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা "বিদ্যাকল্পদ্রুম" বিশ্বকোষ জাতীয় গ্রন্থ। এটি তেরো খণ্ডে সঙ্কলিত হয়েছিল। গ্রন্থটি কৃষ্ণমোহনের সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় বহন করে। তাঁর ভাষাও সমকালের পক্ষে এমন কিছু কঠিন ছিল না।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)॥ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ছিলেন। পুরাতত্ত্বের আলোচনায় তাঁর খ্যাতি বিশ্বব্যাপ্ত হয়েছিল। উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব বিষয়ক তাঁর সুবিপুল ইংরেজী গ্রন্থ বাঙালী মনীষার কীর্তিস্তম্ভরূপে পরিগণিত হবে। সাংবাদিক এবং প্রাবন্ধিক হিসেবেও বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর স্থান বিশেষ উচ্চে। তিনি "তত্ত্ব-বোধিনী" পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর সুযোগ্য সম্পাদনায় "বিবিধার্থ সংগ্রহ" সমকালীন পত্রিকার মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

"রহস্য সন্দর্ভ" পত্রিকাটিও তাঁর অন্যতম কীর্তি। তাঁর প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থগুলির মধ্যে "প্রাকৃত, ভূগোল", "শিল্পিক দর্শন", "শিবাজীর চরিত্র", "মেবারের রাজেতিবৃত্ত" প্রভৃতি বিখ্যাত। এগুলি ১৮৫৪-৬৩ সালের মধ্যে প্রকাশিত। শিল্পবাণিজ্য (industry) এবং শিল্পকলা (art and craft) উভয় বিষয়েই তাঁর দক্ষতা ছিল। তিনি এ-বিষয়ে প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা গদ্যের নূতন দিগন্ত খুলে দিলেন। সাহিত্য সমালোচনায়ও তাঁর বিশেষ কৃতিত্বের অনেক প্রমাণ "বিবিধার্থ সংগ্রহে" ছড়িয়ে আছে।

রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-৯৯)॥ বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রথম যুগের একজন খ্যাতনামা লেখক রাজনারায়ণ বসু। তাঁর ব্রাহ্মসভার আচার্যরূপে বক্তৃতাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৫৫ সালে। "ধর্মতত্ত্বদীপিকা", "সেকাল ও একাল", "বাঙলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা" তাঁর বিখ্যাত রচনা। সমালোচক হিসেবে তিনি রসজ্ঞানের পরিচয় দিলেও কোথাও কোথাও সামাজিক গোঁড়ামীকেও প্রশ্রয় দিয়েছেন। তবুও সমালোচনা-সাহিত্যের প্রথম যুগের পক্ষে তাঁর রচনা মূল্যহীন নয়। তাঁর স্মৃতিকথামূলক গ্রন্থ "সেকাল ও একাল" গবেষণামূলক নিবন্ধ না হয়ে একটি অন্তরঙ্গ সরসতার স্পর্শে অনেকটা উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

বিদ্যাসাগরের অনুসরণে সংস্কৃত, ইংরেজী বা অন্যান্য ভাষার আখ্যানাদি অনেকেই এই সময়ে ভাষান্তরিত করেছেন। বাংলা গদ্য নিয়ে তাঁদের অনুশীলন কোনক্ষেত্রেই পূর্বসূরীদের থেকে উন্নতি সূচিত করে না। তবে এর মধ্যেও নাম করার মত বই তারাশঙ্কর তর্করত্নের "কাদম্বরী"র অনুবাদ।

॥ ২ ॥

যুগসন্ধির কবিতা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নবসৃষ্টির উল্লাস কাব্য-জগৎকে আন্দোলিত করে নি। অবশ্য তাই বলে পুরানো কাব্যধারার যথাযথ অনুবৃত্তি চলেছিল এমন মনে করবার কারণ নেই। পুরাতন ভাব-পরিমণ্ডল বাংলাদেশ থেকে নিশ্চিতভাবে অবলুপ্ত হচ্ছিল। তাই পুরাতন ধারার অনুসরণকালেও নূতন ভাবের অঙ্কুর কোথাও কোথাও মাথা তুলেছে। অবশ্য এই নব ভাব

এখনও নির্দ্বন্দ্ব হয়ে ওঠে নি। এই পর্বের কবিতাকে তাই 'যুগসন্ধি' বিশেষণে ভূষিত করা হয়েছে।

বাংলা কাব্যক্ষেত্রে মধুসূদনের আবির্ভাব ঘটেছে ১৮৫৯ সালে তিলোত্তমাসম্ভব রচনার মধ্য দিয়ে। ১৮৫০ সালকে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা করে সাহিত্যের যুগবিভাগ করা যে অসম্ভব তা পূর্বেই বলা হয়েছে। গদ্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে ঘটল যুগান্তর, তেমনি কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনের আগমনের মধ্য দিয়ে নবযুগে প্রবেশ ঘটল। অবশ্য বঙ্কিমপূর্ব বাংলাগদ্য সম্পূর্ণই নবযুগের দান। নবজাগৃতির প্রাণলক্ষণ তার সর্বদেহে। তার যা কিছু অপরিণতি তা প্রথম তারুণ্যের। কিন্তু কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিছু পৃথক। এর পিছনে আট শত বছরের ইতিহাস আছে। সেই ঐতিহ্যের সূত্রে ঐতিহাসিক কারণেই ছেদ পড়েছে। কিন্তু কবিদের পিছুটানের সমাপ্তি ঘটে নি। বুদ্ধি দিয়ে কেউ কেউ নবীনকে অল্পসল্প আমন্ত্রণ জানালেও সমগ্র কবিকল্পনার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিধর্মে তাকে সার্থকতা দান সম্ভব হয় নি। সৃজনধর্ম শুধু বুদ্ধিবৃত্তিজাত নয়। তাই গদ্য বা কাব্য উভয় রাজ্যেই কিছুকাল তার জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়েছে।

কবিওয়ালারা পুরাতন ধারার অনুবর্তন করেছেন। কিন্তু পুরাতন কাব্যসাহিত্যের স্বাভাবিক অনুসরণ কালপ্রভাবেই আর সম্ভব ছিল না। অথচ নবীনকে চিনবার এবং আত্মস্থ করবার চেষ্টা বা শক্তি তাঁদের ছিল না। পুরানোর প্রসঙ্গে এই নেতিবাচকতাই যুগসন্ধিতে তাদের স্থানলাভের ছাড়পত্র।

ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলাল নবযুগকে অংশত চিনেছিলেন। এই চিনবার প্রতিক্রিয়া মনকে যেভাবেই নাড়া দিক না কেন, চঞ্চলতা সেখানে জেগেছিল। সেই বুদ্ধি ও চিন্তাজগতের তরঙ্গ নিঃসংশয়ে ঊনবিংশ শতকের দান।

কবিওয়ালা

পরিচয়॥ কবিগানের ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধানে অষ্টাদশ শতক এমন কি সপ্তদশ শতক পর্যন্তও অভিযান করা যেতে পারে। কিন্তু কবিগানের বিকাশ ঘটেছিল ১৭৬০-১৮৩০-এর মধ্যে। কলকাতার নগরসংস্কৃতির পটভূমিতেই কবিগানের জন্ম রবীন্দ্রনাথের এরূপ অভিমত স্বীকার্য। মধ্যযুগের কাব্যকবিতা গ্রাম্য পটভূমিতে আবির্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল।

রাজসভা, ধর্মকেন্দ্র প্রভৃতিই ছিল তাদের উৎস। কিন্তু কবিগানের জন্মলগ্নে এই উৎস শুষ্ক হয়ে গিয়েছে। অথচ নবশিক্ষিত জনসাধারণ যে আধুনিক সাহিত্যের পোষ্টা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেরূপ কিছুও ঘটে নি। "ইংরেজের নূতন সৃষ্টি রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়েকজনের, তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক্ সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলায় বৈঠকে বসিয়া আমোদের উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।" (—রবীন্দ্রনাথ); (কবিগানের এই সৃষ্টি-পরিবেশ আধুনিক যুগোপযোগী। সাহিত্যের গণতন্ত্রীকরণের এটি প্রথম ধাপ।) অবশ্য সস্তা আমোদদানের হীনতায় অবনমিত হয়ে আধুনিকতার উৎকর্ষ এখানে কিছুমাত্র অনুভূত হয় নি।

কবিগান নামটি সাধারণত ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কবি, তরজা, খেউড়, আখড়াই, হাফ আখড়াই, পাঁচালী, ঢপ এদের মধ্যে সঙ্গীত পরিবেশনের আঙ্গিকগত নানা পার্থক্য থাকলেও কবিতা হিসেবে এদের মোটামুটি এক শ্রেণীভুক্ত করা চলে। এই সব নানা ধরনের গীতিমূলক কবিতাকারেরা ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে একটা বিশেষ গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল।

কবিগানের প্রধান বিষয় রাধাকৃষ্ণের প্রেম, উমাসঙ্গীত এবং শ্যামাসঙ্গীত। কিন্তু পুরাতন বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলীর সঙ্গে এদের মিল নামমাত্র। ভক্তির অনাবিলতা, আন্তরিকতা এবং রচনাভঙ্গির উৎকর্ষে পদসাহিত্যের সমকক্ষতা এরা দাবি করতে পারে না। শ্যামাসঙ্গীতগুলিতে তুলনামূলকভাবে কবিওয়ালারা বেশী কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। প্রেমের গান রচনা করতে গিয়ে এঁরা ডেকে এনেছেন চরম ব্যর্থতা। ধর্মীয় বিষয়কে আশ্রয় করলেও সখীসংবাদ ও বিরহের গানে এঁরা মানবলোকের চারপাশেই ঘুরেছেন। তবে এ লক্ষণ আধুনিক মানবতাবাদের নয়, মধ্যযুগের দেবনির্ভর কাব্যেও এ ধরনের মানবরসের সাক্ষাৎ মিলেছে। বহু ক্ষেত্রেই উত্তর-প্রত্যুত্তরে প্রতিপক্ষের চাপানের কাটান দিতে গিয়ে মুখের মত গান বাঁধতেন কবিওয়ালারা। মুখের মত ধারালো জবাব, (ভাবের গভীরতা চাইত না, উত্তররচনার দ্রুততাকে বেশি মূল্য দিত।) (আনন্দ না হয়ে, আমোদ লক্ষ্য — হওয়ার ফলে কবিগানের রচনাভঙ্গিতে অনুপ্রাস-যমকাদির নানা

কারুকার্যের অত্যধিক প্রাচুর্য দেখা যেত। এরা সুপ্রযুক্ত হত না, আসরের বহু লোককে উত্তেজিত করে প্যালার থালাটিকে পূর্ণ করে তোলাই ছিল এদের লক্ষ্য।

অবশ্য কারুনিপুণতা যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে দ্রুত গানে গানে জবাব তৈরী, শ্রবণোত্তেজনাকর যমক-অনুপ্রাসের ব্যবহারে সাফল্য লাভ করা যায় না। কবিওয়ালারা অশিক্ষিত-পটুত্ব দেখাতেন না। তাঁরা রীতিমত গুরুর দলে দীর্ঘদিন ধরে অভ্যাস করতেন। তবে এ-সাধনা চারুকলার নয়, নেহাৎই কারুরীতির।

উনবিংশ শতকের কবিওয়ালা॥ হরুঠাকুর, কেষ্টামুচি, নিতাই বৈরাগী, ভবানী বেনে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বেঁচেছিলেন এবং গানও বেঁধেছেন। কিন্তু এঁরা অষ্টাদশ শতকেই কবিওয়ালা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালাদের মধ্যে নাম করতে হয় রাম বসুর। রাম বসুর কবিগান সংখ্যায় সুপ্রচুর। অপরাপর অনেক কবিওয়ালার তুলনায় এগুলি কিছু মার্জিতও বটে। কবির লড়াইয়ের পুষ্টি রাম বসুরই হাতে। রাম বসুর সমকালীন কবিওয়ালাদের মধ্যে ভোলা ময়রা, এণ্টুনী ফিরিঙ্গি প্রভৃতির নামোল্লেখ করা চলে। তবে এঁদের কারও রচনাই ব্যক্তিত্বের চিহ্নবাহী নয়।

টপ্পাগান ও নিধুবাবু

রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু অষ্টাদশ এবং উনবিংশ দুই শতকেই দীর্ঘকাল ধরে বেঁচেছিলেন এবং টপ্পাগান লিখেছিলেন। হিন্দুস্থানী টপ্পাগানের অনুসরণে নিধুবাবুর আদিরসাত্মক লঘু সুরের গানগুলি রচিত। এগুলিও মূলত গান, কবিতা নয়। কিন্তু কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এর প্রসঙ্গ উল্লেখযোগ্য। এই প্রেমসঙ্গীতগুলিতে ভক্তিভাবের স্পর্শ নেই, আধ্যাত্মিকতার আবরণও নেই। উন্নত স্তরের সাহিত্যিক রচনা না হলেও কবিগানের তুলনায় এদের মূল্য তাই স্বীকার্য।

দাশরথি রায়ের পাঁচালী

দাশরথি রায় (১৮০৬-১৮৫৭) উনবিংশ শতাব্দীর কবি। কবিগানের পরিবেশেই তাঁর মন বর্দ্ধিত, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দু-একটি ভাব-তরঙ্গ তাঁর চিত্তের উপরতল সামান্য স্পর্শ করেছিল। বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের প্রতি

তাঁর কৌতুকমিশ্রিত সমর্থন ছিল। কবিতার আকারে তা তিনি প্রকাশও করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রধান কাব্যকীর্তি পাঁচালীর পালাগান রচনায়। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের বিষয়বস্তু তিনি গ্রহণ করেছেন এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুরানো বিষয়বস্তুর নব কাব্যরূপায়ণের যে-ধারা মধুসূদন থেকে প্রচলিত হয় তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দাশু রায়ের কোন সম্পর্ক ছিল না। মধ্যযুগীয় ভক্তি-ভাবনার দিক থেকেই তিনি পালাগানগুলি রচনা করেছিলেন। কিন্তু দাশরথি পালাগানের কাহিনীগঠন, চরিত্র-চিত্রণ প্রভৃতির দিকে কিছুমাত্র দৃক্‌পাত করেন নি। যেন কোন গাম্ভীর্য বা ভাবগভীরতার (Seriousness) স্পর্শ নেই কাহিনীতে, চরিত্রে কিংবা বর্ণনায়। লঘু রসিকতা, অকারণ পল্লব-গ্রাহিতা এবং রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক মন্তব্যের মালায় তাঁর পালাগানগুলি পরিপূর্ণ। কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রহরণ করলে দাশু রায় সেখানে সৌখীন শাড়ীর জন্য বিলাসিনী নারীদের দুঃখ ছাড়া অন্য কিছু দেখতে পান না। দক্ষযজ্ঞে জামাই-শ্বশুরের বিবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লঘু কৌতুকেরই প্রশ্রয় দেন—

আমাদের ভাব কেমন জামাই আর শ্বশুরে
যেমন দেবতা আর অসুরে।···
যেমন পক্ষী আর সাতনলা
যেমন আদায় আর কাঁচকলা।···
যেমন দিনকতক হইয়াছিল ইংরাজে আর মগে॥

দাশু রায় উনিশ শতকের কবি হয়েও কবিওয়ালাদের মত অষ্টাদশ শতকেরই যেন Projection। যুগসন্ধির সূত্রপাত এঁরা নির্দেশ করেন।

যুগসন্ধির সমাপনে নব যুগ অভ্যুদয়ের আশার সঙ্কেত দেন ঈশ্বর গুপ্ত এবং রঙ্গলাল।

ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-৫৯)

পরিচয়॥ ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিক হিসেবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দেশীয় প্রথম দৈনিক পত্রিকা প্রকাশের গৌরব তাঁরই প্রাপ্য। ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শের ফলে বাঙালীদের সমাজে ও জীবনে যে-সব বিচিত্র পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল তাতে ঈশ্বর গুপ্ত সর্বদা অগ্রগতির পক্ষভুক্ত ছিলেন না একথা সত্য। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কার, ধর্মসংস্কার প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাঁর সমর্থন ছিল। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের সমাজ-আন্দোলনে তিনি

ছিলেন মধ্যপন্থী। রাধাকান্ত দেবেদের রক্ষণশীলতার সমর্থক তিনি ছিলেন না, অপরপক্ষে ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর সঙ্গেও ছিল না তাঁর মনের যোগ।

নবযুগের স্থচনাকালেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গবেষক হিসেবেও তিনি কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গিয়েছেন। রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের জীবনী ও কাব্য-কবিতাবলী তিনি সঙ্কলন করে প্রকাশ করেছিলেন। বহু যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে কবিওয়ালাদের জীবনী ও কবিতাবলী তিনি সঙ্কলন করে-ছিলেন। অন্যথায় বাংলা সাহিত্যের একটা বিশেষ পর্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণাবলী প্রায় সবই বিনষ্ট হত। তরুণ কবি ও লেখকদের অনেকেই তাঁর দ্বারা উৎসাহিত হয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্তের হাতেখড়ি "সংবাদ প্রভাকরে"; তা ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, দ্বারকানাথ অধিকারী, মনোমোহন বসু প্রভৃতি অনেকেই তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

কাব্যপরিচয় ও সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান॥ ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড কবিতাবলী পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে সেগুলি সঙ্কলিত ও সম্পাদিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। কবিতা রচয়িতা হিসেবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশিষ্ট স্থান বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য। সেই সঙ্গে কবিতা হিসেবে তাঁর রচনাবলীর মূল্যও বিচার্য। ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলে-ছেন, "বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার স্থান অনন্যসাধারণ, নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুরাতন প্রবাহকে অব্যাহত রাখিয়াই তিনি নূতনের জন্য খাত খনন করিয়া তাহাতে নব নব ধারা প্রবাহিত করিয়াছেন।...কাব্যসাহিত্যে পুরাতন ধারার তিনি শেষ কবি এবং নূতন ধারার তিনি উদ্বোদ্ধা।...নূতন ও পুরাতনের সংঘর্ষে যেখানে পথবিপর্যয় ঘটিয়াছে, ঠিক সেইখানেই তিনি আপনাকে মাইলষ্টোনের মত মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত রাখিয়া বিরাজ করিতেছেন; হয়ত কালের প্রবাহে ধূলিজঞ্জালে সে-দিনের সুস্পষ্ট পরিচয় চিহ্নটি ঢাকা পড়িয়াছে। ইহার মধ্যে পরবর্তীযুগের বাঙালীদের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইলেও সবটাই তাহাদের অপরাধ নহে। মহাকালের উর্ধে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাতকে অবজ্ঞা করিয়া যে-প্রতিভা আপনাকে সমুন্নত রাখিতে পারে, ঈশ্বরচন্দ্র ঠিক সেই জাতীয় প্রতিভাবান ছিলেন না।" ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার এই ঐতিহাসিক লক্ষণগুলি সূত্রাকারে বিবৃত করা হচ্ছে।

এক। পুরাতন গানের (পদসঙ্গীত) স্থলে পাঠ্য খণ্ড কবিতার আবির্ভাব ঘটল। বৈষ্ণব কিংবা শাক্ত পদাবলীর যে-ধারা বহিরঙ্গের দিক দিয়ে কবি-গানের কাল পর্যন্ত চলেছে তার নিশ্চিত অবসান হল ঈশ্বর গুপ্তের হাতে।

দুই। ঈশ্বর গুপ্ত কবিতাকে সম্পূর্ণভাবে ধর্মভাবমুক্ত করলেন। কবিওয়ালাদের গানে আধ্যাত্মিকতা ছিল না, কিন্তু রাধাকৃষ্ণ, উমা, শ্যামা, শিবের নামের সম্পর্কে ধর্মীয় ভাবাতুরতা একেবারে ঘোচে নি। ঈশ্বর গুপ্ত পার্থিব বিষয় নিয়ে কবিতা লিখলেন। "তপসে মাছ", "পাঁটা", "দুর্ভিক্ষ", "পৌষপার্বণ", "গ্রীষ্ম", "নীলকরে"র ন্যায় "নির্গুণ ঈশ্বর"ও কখনো কখনো তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু হয়েছে মাত্র। অর্থাৎ মধ্যযুগের কবিদের মত তাঁর রচনা ব্রহ্মকেন্দ্রিক না হয়ে মানবকেন্দ্রিক হয়ে নবযুগের লক্ষণ প্রকাশ করেছে। ধর্ম, ঈশ্বর প্রভৃতি মানবভাবনার অংশ হিসেবেই তাঁর কবিতায় স্থান পেয়েছে। চারপাশের প্রত্যক্ষগম্য বস্তু, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনই কবি ঈশ্বর গুপ্তকে সর্বাধিক আকর্ষণ করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা, মানুষের দৈনন্দিন জীবন-বিবরণ, নীতিতত্ত্বমূলক উপদেশ তাঁর রচনায় স্থান পেয়েছে। বিষয় নির্বাচনে ঈশ্বর গুপ্ত যে পুরাতনকে পিছনে ফেলে নবীনের পথ ধরেছেন এ-কথা মেনে নিতে হয়।

তিন। সমাজ-চেতনা পুরাতন কবিতায় স্থান পায় নি, সমাজ-ভাবনা মধ্যযুগের ব্যক্তিত্বের সচেতন অংশ হয়ে উঠতে পারে নি। কবি ঈশ্বর গুপ্ত মূলত ছিলেন সাংবাদিক। সাংবাদিক হিসেবে সমকালীন সমাজজীবন সম্পর্কে যে তীক্ষ্ণ সচেতনতা তিনি বহন করতেন তাঁর কবিতায় তা প্রকাশিত হয়েছে। অতি রক্ষণশীলতার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু সমকালীন ইয়ং বেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলতাকে তিনি ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছিলেন—

যত কালের যুবো, যেন সুবো,
ইংরাজী কয় বাঁকা ভাবে।
ধোরে গুরু পুরুত মারে জুতো,
ভিখারী কি অন্ন পাবে?

স্ত্রীশিক্ষার বাড়াবাড়ি দেখে তিনি আতঙ্কিত হয়েছেন—

যত ছুঁড়ীগুলো, তুড়ী মেরে
কেতাব হাতে নিচ্চে সবে।
তখন "এ, বি", শিখে, বিবি সেজে,
বিলাতী বোল কবেই কবে।

চার। সমাজচেতনারই বিশিষ্ট প্রকাশ দেশাত্মবোধে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায়ই প্রথম জাতীয় জীবন ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে। সে ভালবাসা সঙ্কীর্ণ হতে পারে—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

কিন্তু তার আন্তরিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা চলল না। কখনও ব্যঙ্গ-বক্র বাচনে তিনি বৃটিশ শাসনব্যবস্থার প্রতিও তীক্ষ্ণ শরসন্ধান করেছেন—

তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু,
শিখি নি সিং বাঁকানো।
কেবল খাবো খোল, বিচিলি ঘাস॥
যেন রাঙা আমলা তুলে মামলা,
গামলা ভাঙেনা।
আমরা ভুষি পেলেই খুসি হব,
ঘুষি খেলে বাঁচব না॥

এই বিশিষ্ট ভাবধারা একালের বাঙালী কবিদের প্রধান অন্তর-শক্তি। জাতীয় ভাবনার সূত্রপাত তাই খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ঈশ্বর গুপ্ত খণ্ড কবিতা লিখেছেন। গীতিকবিতা লেখেন নি। গীতি-কবির কল্পনা তাঁর ছিল না। বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ গীতিকবিতার করায়ত্ত ছিল। সে-ভবিষ্যৎকে তিনি প্রভাবিত করতে পারেন নি ঠিকই, কিন্তু খণ্ড কবিতায় তাঁর একটা pattern ধরে রেখেছেন। নব্য মানবতা বোধকে তিনি বুদ্ধি দিয়ে কিছু বাহিরের দিক থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। তার অন্তর আলোড়নের তীব্রতা গুপ্ত কবির অনুভূতি-রাজ্যে ধরা পড়ে নি।

তাঁর নারী প্রেমমূলক কবিতাগুলি শুধুমাত্র কৃত্রিম, অগভীর এবং গতানু-গতিকই নয়, ভারতচন্দ্র ও কবিওয়ালাদের রুচি-বৈকল্যের প্রভাব সেখানে বর্তেছে। পুরাতন ধারার কবিতার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের এই সূত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, কবিওয়ালাসুলভ বাক্‌ভঙ্গিমা তাঁর কবিতায় সুপ্রচুর। শব্দালঙ্কারের ব্যবহারে তাঁর কবিতার দেহরূপের চড়া প্রসাধন বহুক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক। তৃতীয়ত, হাস্যরস সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর স্থূলতা পুরাতন ধারার উত্তরসূরীত্বের পরিচয়ই বহন করে।

যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত কবিওয়ালাদের আসর থেকে, সস্তা আমোদের হাত থেকে বাংলা কবিতাকে উদ্ধার করে' শিক্ষিত পাঠকের নিকট নিয়ে

করলেন। এই ঐতিহাসিক ভূমিকার মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। কিন্তু "The poetry is not of a high order" (—রমেশ দত্ত)। কবি হিসেবে তাঁর বিশিষ্টতা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "মনুষ্য হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া, তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই।...তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম এসব সামগ্রী বড় বেশী নাই।...ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়, নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস ছাড়া কাব্যরস পান, তপসে মাছে মৎস্যের ভাব ছাড়া তপস্বী ভাব দেখেন, পাঁটার বোকা গন্ধ ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। স্থূলকথা ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist।"

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-৮৭)

পরিচয়॥ নব্য ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালী কবিগণের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর মোটামুটি ভাল পরিচয় ছিল। ম্যুর, বায়রন, স্কটের আদর্শে কবিতা রচনা করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর জ্ঞান ছিল। "ঋতুসংহার" ও "কুমারসম্ভবের" বঙ্গানুবাদে তাঁর প্রমাণ রয়েছে। একাধিক সাময়িক পত্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল এবং তিনি যোগ্যতার সঙ্গে কোন কোনটির সম্পাদনাও করেছিলেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সেকালে যতটা সম্ভব তাঁর জ্ঞান ছিল, তার চেয়েও বেশি ছিল তাঁর ভালবাসা। "কবিকঙ্কণ চণ্ডী"র সম্পাদনায় তার পরিচয় মিলবে। রঙ্গলাল নব্যযুগের শিক্ষিত অন্য পাঁচজন বাঙালীর মত জ্ঞান-সাধনায় বিশেষ আগ্রহ অনুভব করতেন। উড়িষ্যার ভাষা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তাঁর ছিল বিশেষ আকর্ষণ। পুরাতত্ত্ব ও অতীত ইতিহাস তাঁকে আকৃষ্ট করত।

কাব্যগ্রন্থাবলী॥ রঙ্গলালের মৌলিক কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে "পদ্মিনী" প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ সালে। প্রাক্-মধুসূদন যুগের এটিই তাঁর একমাত্র কাব্য। এই কাব্যগ্রন্থটির জন্যই মুখ্যত তাঁকে মধুসূদনের পূর্বযুগে স্থাপিত করে আলোচনা করা হয়। তাঁর "কর্ম্মদেবী" (১৮৬২), "শূরসুন্দরী" (১৮৬৮) এবং

পরবর্তী কালের রচনা। "কর্ম্মদেবী—রাজস্থানীয় সতীবিশেষের চরিত্র", "শূরসুন্দরী—রাজস্থানীয় বীরবালা বিশেষের চরিত্র", "কাঞ্চীকাবেরী—উৎকলদেশীয় বীররসাত্মক আখ্যান বিশেষ"। রঙ্গলালের অধিকাংশ কাব্যই সতী নারীর গৌরবগাথা। বীরধর্ম আনুষঙ্গিকরূপেই এসেছে। তাঁর কাব্যের অপর সাধারণ লক্ষণ রাজপুত ইতিহাসের গৌরবময় যুগের প্রতি আকর্ষণ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পদ্মিনী" উপাখ্যানের কাহিনী টডের রাজস্থান থেকে সঙ্কলিত। সেকালে টডের গ্রন্থ শিক্ষিত সমাজে ইতিহাস বলে গণ্য হত। রঙ্গলাল ইতিহাসের কাহিনীকে কাব্যসাহিত্যের বিষয়রূপে গ্রহণ করলেন। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে মধ্যযুগে আলাওল "পদ্মাবতী" কাব্য লিখেছিলেন। কিন্তু রঙ্গলাল সে-কাব্যের সঙ্গে আদৌ পরিচিত ছিলেন বলে মনে হয় না। বাংলা পুরানো আখ্যানকাব্যের সঙ্গে রঙ্গলাল সম্পূর্ণত বিচ্ছেদ ঘটালেন "পদ্মিনী" কাব্যে। যুগসন্ধির পূর্ববর্তী কবি ঈশ্বর গুপ্তের খণ্ড কবিতার মধ্যে বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ মুক্তি তিনি দেখেন নি। তিনি ঈশ্বর গুপ্তের পথ না ধরে নতুন পথে পদার্পণ করলেন। পদ্মিনী-উপাখ্যান অব্যবহিত পরবর্তী বাংলা কাব্যসাহিত্যের গতিপথের দ্বারদেশ চিহ্নিত করল। খণ্ডকবিতা-গীতিকবিতা নয়, আখ্যান কাব্যের পথ ধরেই তার সাম্প্রতিক অগ্রগতি ঘটবে পদ্মিনী সেই ইঙ্গিতটিই যেন দিতে চাইল। লক্ষণীয়, রঙ্গলাল পরবর্তীকালেও এই প্রত্যয় থেকে ভ্রষ্ট হন নি। পরপর চারটি আখ্যানকাব্য তিনি লিখেছেন। এই চারটিই তাঁর মৌলিক রচনা, অন্যবিধ কাব্যরূপের প্রতি বড় আকর্ষণ তিনি বোধ করেন নি। এই আখ্যানকাব্যের ধারা ভাবে এবং রূপে মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য থেকে যে মূলত পৃথক হবে এ-বোধও তাঁর ছিল। পুরাতন আদর্শের অনুসরণ তাই রঙ্গলাল করেন নি।

দ্বিতীয়ত, রঙ্গলাল পদ্মিনী-উপাখ্যানের ভূমিকায় লিখেছিলেন, "উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকানেক ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে, সেই সকল দর্শনে ইংলণ্ডীয় কাব্যামোদিগণ আমাকে ভাবচোর জ্ঞান না করেন, আমি ইচ্ছাপূর্বকই অনেক মনোহর ভাব স্বীয় ভাষায় প্রকাশ করণে চেষ্টা পাইয়াছি,…ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবেক, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্দ্ধান করিতে থাকিবেক, এবং তত্তাবতের প্রেমিকদলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবেক।" ইংরেজী কবিতার আদর্শেই যে বাংলা কাব্যে নবযুগ সঞ্চারিত হবে এ গূঢ় তত্ত্ব তিনি

ছিল। কালিদাসের একাধিক সংস্কৃত কাব্য তিনি বাংলায় অনুবাদ করে-ছিলেন। কিন্তু প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য এবং মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্যের পথে যে নবযুগের বাংলা কাব্যের মুক্তি আসবে না এ-বিষয়ে তাঁর দ্বিধা ছিল না। ইংরেজী কাব্য-কল্পনার দিকে তিনি বহু আশা নিয়ে তাকিয়ে ছিলেন। এদিক দিয়ে তিনি যে গুরু ঈশ্বর গুপ্তকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়ে আধুনিকতার মূল সুরটি ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই।

তৃতীয়ত, ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় আরও একটি দিকে তিনি নিশ্চিতভাবে অগ্রগামী। কবিওয়ালাদের সঙ্গে তার সম্পর্কের কোন স্পষ্ট সূত্রই লক্ষ্য করা যায় না।

চতুর্থত, "পদ্মিনী-উপাখ্যান"কে রোমান্স-রসাত্মক রচনা হিসেবে আধুনিক রোমান্টিকতার পথিকৃৎ বলে অনেকে অভিহিত করতে চেয়েছেন। এই দাবি স্বীকার্য নয়। রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারীই রোমান্সরস সৃষ্টিতে সক্ষম। বিষয়বস্তু নির্বাচনে অতীতমুখীতাই রোমান্সের একমাত্র পূর্বসর্ত নয়।

পঞ্চমত, পদ্মিনী কাব্য স্বাজাত্যবোধের সুরটিকে তীব্রভাবে বাজাতে চেয়েছে। এই সুরের সূচনা ঈশ্বর গুপ্তে, কিন্তু রঙ্গলালের রচনা একে স্পষ্টতর করে তুলেছে। "ঈশ্বর গুপ্তের 'মিউটিনী' প্রভৃতি পদ্যে উদ্দীপনা থাকিলেও, যিনি নব্যবঙ্গের হৃদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপনার রসে সিঞ্চিত করিয়া দেশহিতৈষণার বীজ বপন করেন তাঁহার নাম রঙ্গলাল।" শুধু মাত্র "স্বাধীনতা হীনতায়" কবিতাই নয়, পদ্মিনী কাব্যে মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে হিন্দু রাজপুতের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টায় জাতীয়তাবাদের যে-সুরের চর্চা করা হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে বাঙালী হিন্দুর স্বাজাত্য চিন্তার তাই ছিল ধ্রুবপদ। আর তারই সঙ্গে ছিল ব্রিটিশ শাসনের কল্যাণময় ফলশ্রুতিতে বিশ্বাস। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যোপন্যাস, এমন কি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকা-দির কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

কিন্তু তবুও রঙ্গলালের এ-কাব্য যুগসন্ধির চিহ্নবাহী, নবযুগের উল্লাস এতে পরিপূর্ণভাবে অনুভূত হয় নি। নবযুগের প্রধানতম লক্ষণ যে মানবতাবাদ তার সুর পদ্মিনী কাব্যে বড় মেলে না। এবং যে স্বাজাত্যবোধের জন্য এ কাব্যের এত প্রশংসা তাও কাব্যটির মূল প্রত্যয়রূপে আসে নি। প্রাসঙ্গিক ভাবে মাত্র স্থান পেয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় তা তীব্রতর হলেও, পরবর্তী উল্লাসপর্বের স্পষ্টতা বা গভীরতার স্পর্শ তাতে লাগে নি। তিনি

কাহিনীগঠনে, বর্ণনায় সেকালীন গতানুগতিকতাকে তিনি অনুসরণ করেছেন একরূপ নির্বিচার ভাবে। ইংরেজী কাব্যের বহিরঙ্গের চেতনা মাত্র তিনি লাভ করেছিলেন, গভীরভাবে তাকে আত্মস্থ করতে পারেন নি। অথচ এই আত্মীকরণের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল বাংলা কাব্যের নবজীবনের মন্ত্র।

এমন কি মধুসূদনাদির আবির্ভাবের পরেও তিনি একের পর এক কাব্য রচনা করে চললেন, এবং মধুসূদন প্রবর্তিত নবকাব্যধারা তাঁকে কিছুমাত্র স্পর্শ করতে পারল না। তাঁর আধুনিকতা যে কতটা বহিরঙ্গ ছিল তা এ থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। বীররসাত্মক কাব্য আমাদের দেশে সেকালে একেবারে অচলিত ছিল না। সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারত জাতীয় গ্রন্থ এবং মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর ধর্মমঙ্গল প্রভৃতির নাম এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। য়ুরোপীয় পদ্ধতির Heoric Poetry সৃষ্টির বাসনা যদি রঙ্গলালের আদৌ থেকে থাকে তবে তা যে কিছুমাত্র সিদ্ধিলাভ করে নি, একথা বলা বাহুল্য। 'মেঘনাদ বধ' রচনার পরেও বীররসের বর্ণনায় তিনি ভারতচন্দ্রের ছন্দরাজ্যে নিশ্চিন্তে পরিক্রমা করেছেন—

ঠুকে তাল, আঁখি লাল, কি করাল মূর্তি।
মহাকায়, হরি-প্রায়, যেন পায় স্ফূর্তি॥
চলে যায়, পদ-ঘায়, বসুধার কম্প।
কভু ধায়, ঠায় ঠায়, মেরে যায় ঝম্প॥
টিট্‌কার, চীৎকার, শীৎকার ক্রোধে।
গরগর, কলেবর, পরস্পর রোধে॥(—কর্ম্মদেবী)

প্রকৃতি বর্ণনায় আধুনিক কবিসুলভ চিত্রাঙ্কনের পথ না ধরে মধ্যযুগীয় কবিদের অনুরূপ তালিকাচয়ন করে চলেছেন রঙ্গলাল—

বিশাল বিশাল শাল সরল অর্জ্জুন তাল,
বোধিদ্রুম বট তরুবর॥
হরিতকী বিভীতকী পিণ্ডীতকী আমলকী
গিরিমল্লী জয়ন্তী কেশর॥

সব দিক থেকে বিচার করলে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে যুগসন্ধির সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কবি বলে আখ্যাত করা চলে, নবযুগ উৎসবের প্রথম কবি বলে অভিনন্দিত করা যায় না॥

তৃতীয় অধ্যায়

॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধঃ নব-জাগৃতির সৃষ্টি-উল্লাস ॥

বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত সৃজনধর্মী রচনার জোয়ার এল ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। নাট্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ হল, পাবলিক থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হল। যে নাট্যধারার চিহ্ন মাত্র ছিল না বাংলা সাহিত্যে তার উদ্ভবই শুধু হল না, (গুণগত উৎকর্ষে না হলেও) রচনা-প্রাচুর্যে এবং বিষয় ও সুরের বৈচিত্র্যে তা এ-যুগের বাঙালী চিত্তের প্রাণচাঞ্চল্যের যোগ্য প্রতিফলন হয়ে দাঁড়াল। নবযুগের কাব্য সৃষ্টি করলেন মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন উপন্যাস। এঁদের অনুসরণ করে বহু কবি সাহিত্যিকের উদ্ভব ঘটল। চারদিক থেকেই বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। নবজাগৃতির সাহিত্যিক ফসল এই পর্বেই বাঙালীর ঘরে উঠল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শেষভাগের একটা অংশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথের রচনাদি বাংলা সাহিত্যকে নানাদিক থেকে সবিশেষ সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির এক পদ ঊনবিংশ শতাব্দীতে হলেও অপর পদ বিংশ শতকের প্রথমার্ধের একটা ব্যাপক কালসীমাকে অধিকার করেছে। বিশেষ করে রচনাবলীর বিপুলতায়, অতুলনীয় উৎকর্ষে, সমকালীন এবং পরবর্তীদের উপরে প্রভাবের পরিমাণে তাঁকে একটা বিশিষ্ট যুগের শীর্ষে স্থাপিত করাই যুক্তিযুক্ত। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে স্বতন্ত্র রবীন্দ্রযুগ বলে পরবর্তী যুগ কল্পনা আমরা করেছি তা নিশ্চয়ই ইতিহাসসম্মত বলে বিবেচিত হবে।

রবীন্দ্রনাথের সমকালীন বহু লেখককে বর্তমান যুগের প্রতিভূ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, আবার সমকালীন যে-সব লেখকের উপরে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গুরুতর তাঁদের রবীন্দ্রযুগের লেখক বলেই অভিহিত করা হয়েছে ॥

॥ এক ॥

নাট্যসাহিত্য

ভূমিকা

এক ॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর নাটকের ইতিহাস কয়েকটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা নাটকের জন্ম হয়। এই

প্রথম শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার অভাবে বাংলা মঞ্চানুগ নাট্য-সাহিত্যে অতি উচ্চস্তরের নাটক দেখা যায় নি। কাব্য-কবিতা এবং গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই যুগে বাংলা সাহিত্যে যে সমুন্নতি ঘটেছে নাটক তা থেকে বঞ্চিত থেকে গিয়েছে। এর জন্য প্রথমত দায়ী হল উচ্চ শ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার অভাব। দ্বিতীয় কারণটি বাঙালীর বিশেষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে নাটকোপযোগী সংঘাতের প্রবলতা ও তীব্র কর্মোদ্দীপনার অভাব।

দুই॥ বাংলা নাটকের জন্মের পিছনে পুরানো বাংলা অভিনয়কলার কোন প্রভাবই অনুভূত হয় নি। তখন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের সামনে তিনটি পথ দেখা দিয়েছিল। সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য, লৌকিক দেশীয় অভিনয়কলা বা যাত্রা এবং য়ুরোপীয় ধরনের মঞ্চাভিনয় এবং ইংরেজী নাট্য-সাহিত্য। বাংলা নাটক যাত্রার ঐতিহ্যকে সরাসরি অস্বীকার করেছে জন্মলগ্নেই। পাশ্চাত্ত্য রীতির প্রতি আনুগত্য উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হলেও মোটামুটি ভাবে সংস্কৃতরীতির অনুসরণও কিছু কম ছিল না। অবশ্য সংস্কৃত নাট্যরীতি খুব দ্রুত প্রভাব হারায়। সংলাপের আলঙ্কারিকতা ব্যতীত সাধারণ রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হবার পর থেকে এর অস্তিত্ব আর অনুভূত হয় নি। অপরপক্ষে জন্মলগ্নে পরিত্যক্ত যাত্রারীতি মনোমোহন বসু থেকেই বাংলা নাটকে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। ইংরেজী ও দেশীয় যাত্রারীতির সংঘাত-সমন্বয়ের পথেই বাংলা মঞ্চানুগ নাট্যধারা এই শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এগিয়ে চলে।

তিন॥ বাংলা নাট্যসাহিত্যে পৌরাণিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক প্রভৃতি নানা বিষয়ের এবং নানা রসের নাটক দেখা যায়। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পৌরাণিক, কাল্পনিক ও সামাজিক নাটকের উৎপত্তি ঘটে। ঐতিহাসিক নাটকের সূচনা মধুসূদনের হাতে। এই ধারাগুলিই বিকশিত হয়ে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ করেছে। এর প্রতিটি ধারাই নিজের মধ্যে সুরের ও ভাবের নানা বৈচিত্র্যের জন্ম দিয়েছে, পরবর্তী আলোচনায় আমরা তা দেখব।

চার॥ নাটকের জন্মকাল থেকেই 'সিরিয়াস কমেডী,' 'ট্রাজেডি' এবং প্রহসনের চর্চা চলেছে। ট্রাজেডির সীমানা পরবর্তীকালে ক্রমে বেড়েছে।

ভূমিকার এই সূত্রগুলি ধরে বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্তন-কাহিনীতে

নাটকের জন্মের পূর্বে

যাত্রার পরিচয় ॥ সংস্কৃত নাটকের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলা দেশের কোন কালেই গভীর যোগ ছিল না। বিশেষ করে সংস্কৃত নাট্যাভিনয় রাজা ও রাজামাত্যদের গৃহপ্রাঙ্গণে সীমাবদ্ধ থাকত। বাঙালী জনসাধারণ যে বিশিষ্ট নাট্যাভিনয়ে সেকালে তৃপ্ত হত তাকে যাত্রা নামে অভিহিত করা হত। বাংলা যাত্রা বা নাটগীত এদেশের প্রাচীনতম দৃশ্যাভিনয়। প্রাচীন যাত্রার প্রত্যক্ষ নিদর্শন একাল পর্যন্ত বড় এসে পৌঁছয় নি।

অষ্টাদশ শতক থেকে যাত্রার নবজীবনের সূচনা হয়। সমকালে কবি, পাঁচালী, ঢপ, কীর্তন প্রভৃতির পরিবেশে এই নবীন যাত্রার জন্ম। উপরোক্ত পর্যায়ের সঙ্গীতাবেদনে কিছুটা দৃশ্যগুণও ছিল। এই যাত্রাপালায়ও থাকত গানেরই প্রাধান্য। সংলাপাদি গানে গানেই চলত। বিষয়বস্তুর মধ্যে কৃষ্ণ-রাধা-দূতী (বড়াই বা বৃন্দা) কথা "কৃষ্ণ-যাত্রা" নামে প্রচলিত হয়েছিল। এ ছাড়া ছিল "কালীয় দমন" যাত্রা, চণ্ডী-মনসার লীলাজ্ঞাপক যাত্রাও চলিত ছিল। "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রায় বিদ্যা-সুন্দর-হীরামালিনীর ভূমিকা থাকত। ঘটনাংশ হত শিথিলবদ্ধ। ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত সম্পর্কে প্রাথমিক বোধও এখানে প্রত্যাশিত ছিল না। কিছু স্থূল হাস্যরসের আয়োজনও থাকত। এ ছাড়া থাকত তরল ভক্তিরসের স্পর্শ। শিশুরাম অধিকারী, পরমানন্দ, শ্রীদাম, সুবল, বদন অধিকারী, গোবিন্দ অধিকারী, গোপাল উড়ে প্রভৃতি যাত্রাকার রূপে সেকালে খ্যাত হয়েছিলেন। এঁদের কেউ কেউ ছিলেন যাত্রার অধিকারী ও অভিনেতা, কেউ কেউ অবশ্য পালা-রচয়িতাও ছিলেন।

যাত্রার উত্তরাধিকার ॥ উনবিংশ শতকে কৃষ্ণকমল গোস্বামী যাত্রারীতিকে অবলম্বন করেন। কবিওয়ালাদের অতি-সচেতন সস্তা মনোরঞ্জনমুখী কারুচর্চা ও স্থূল রুচির পরিবেশ থেকে তিনি যাত্রাকে উদ্ধার করে নবরূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি "রাই উন্মাদিনী", "স্বপ্নবিলাস" প্রভৃতি যাত্রাপালা লিখলেন। এই সব পালায় ভক্তিরস ও গীতিধর্মের সমন্বয় ঘটল, রুচিও অনেকটা মার্জিত হল।

কিন্তু কৃষ্ণকমলের একক চেষ্টা ইতিহাসের গতিকে ফেরাতে পারে নি। শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজী নাট্যশালায় নব্য রুচির পাঠ নিয়েছে। যাত্রাগানকে তাঁরা পরিহারযোগ্য রুচিহীন একটি পদার্থ বলে মনে করলেন। পরবর্তী

যাত্রার বিবর্তনের ফলে বাংলা নাটকের যে জন্ম হয় নি একথা নিশ্চিত। অনেকে ইংরেজী নাটকের পিছনে মধ্যযুগীয় Miracle Plays এবং Morality Plays-এর প্রভাবের প্রসঙ্গ এনে যাত্রার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য এতই বেশী যে তুলনায় আলোচনা একরূপ অর্থহীন।

মোট কথা এই যে ইতিহাস-বিবর্তনের সদর রাস্তা দিয়ে যাত্রা পরবর্তী নাট্যধারায় আপন প্রভাব ফেলতে পারে নি, দু'একটি রন্ধ্রপথে কারও কারও রচনায় ছায়া ফেলেছে।

বাংলা রঙ্গমঞ্চের কথা

ভূমিকা॥ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। বাংলাদেশে রঙ্গমঞ্চ এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিকাশ যুগপৎ ঘটেছে। লক্ষণীয়, রঙ্গমঞ্চ এবং বাংলা নাটক উভয়ই দেশীয় ঐতিহ্যকে যথেষ্ট মূল্য না দিয়ে য়ুরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজী ধারার দ্বারা পুষ্ট হয়েছে। খোলা যাত্রার আসর বা পুরানো সংস্কৃত নাটকের অভিনয়কলার প্রতি আগ্রহ না দেখিয়ে পাশ্চাত্ত্য মঞ্চব্যবস্থা ও তদনুযায়ী সে-দেশীয় নাট্যকলার দিকে প্রথমাবধি বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই ইংরেজরা কলকাতায় রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করতে থাকে। ১৭৫৩ সালে "প্লে হাউস" নামে তাঁদের প্রথম রঙ্গালয় স্থাপিত হয়। তারপর তাঁদের পরিচালনায় বহু রঙ্গমঞ্চ প্রবাসী ইংরেজদের এবং ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীদের মনোরঞ্জন করতে থাকে। কালিদাসাদির সংস্কৃত নাটক ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে কখনো কখনো অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। এই সব প্রচেষ্টার মোট ফল হল এই যে বাঙালী শিক্ষিতসমাজ ইংরেজী নাটক এবং নাটকাভিনয় সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠল। বাঙালীর নিজস্ব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব এই ঘটনাবলীর দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে।

১৭৯৫ সালে গেরাসিম লেবেডফ বেঙ্গলি থিয়েটার নামে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রস্তুত করেছিলেন। রুশদেশীয় এই ভদ্রলোক "The disguise" এবং "Love is the best doctor" নামে দু'খানি লঘু রসের ইংরেজী নাটক বাংলায় অনুবাদ করিয়ে মঞ্চস্থ করেছিলেন। অনুবাদের কাজে তাঁর ভাষা-শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের বেশ হাত ছিল বলে মনে হয়। এই নাটক দুটি

পাওয়া গেলে বাংলা নাটকের ইতিহাসে প্রথম রচনা হিসেবে সম্মানিত হত।

সখের থিয়েটার ॥ বিদেশীদের দ্বারা বাংলা রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও দীর্ঘকাল এই ঘটনার অনুবৃত্তি ঘটে নি। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর পরে যখন বাঙালীর প্রচেষ্টায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠল তখন তাতে ইংরেজী নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার সেকৃসপীয়র প্রভৃতির ইংরেজী নাটক এবং কালিদাস-ভবভূতির সংস্কৃত নাটকের ইংরেজী অনুবাদের অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করে। অবশেষে ১৮৩৫ সালে নবীনচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ে "বিদ্যাসুন্দর" নাটকের অভিনয় হয়। বাঙালী পরিচালিত থিয়েটারে বাংলা নাটকের এই প্রথম অভিনয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে সখের থিয়েটারগুলি কতকটা নিয়মিত অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে লাগল। এই সব রঙ্গালয়ের মধ্যে "বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ", "বেলগাছিয়া নাট্যশালা", "পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়", "জোড়াসাঁকো থিয়েটার", "বহুবাজার বঙ্গনাট্যালয়" প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। যে সাময়িক উত্তেজনা বা বড়লোকের খেয়ালখুশিতে সাধারণত এই রঙ্গমঞ্চগুলি গড়ে উঠত তা ছিল নেহাৎই সাময়িক। কিন্তু উপরোক্ত রঙ্গালয়গুলি তুলনামূলকভাবে দীর্ঘকাল টিঁকেছিল। এমন কি কোন কোন নাটক পাঁচ সাতবার (এমন কি আরও বেশী বার) অভিনীত হয়েছে। সখের থিয়েটারের এই তুলনামূলক স্থায়ীত্বে পাবলিক থিয়েটারের পূর্বসূরীত্বের চিহ্ন আছে। এই সখের থিয়েটারগুলি আরও একটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কালীপ্রসন্ন সিংহ, উমেশচন্দ্র মিত্র, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, মনোমোহন বসু, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতির নাটকাবলী এই সব রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনীত হত। এই সব রঙ্গালয়ের উৎসাহ এবং প্রেরণাই আবার তৎকালীন বহু নাট্যকারের নাট্যরচনাবলীর কারণ।

পেশাদারী থিয়েটার ॥ এইভাবে বাংলাদেশের সখের থিয়েটার একটা নির্দিষ্ট পরিণতি লাভ করার ফলে বৃহত্তর একটি প্রয়োজন অনুভূত হতে লাগল। স্থায়ীত্ব যতই থাক, অভিনয়কলা যতই উন্নত হোক সখের থিয়েটার সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। নাট্যশালার ইতিহাসকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন-না-কোন অভিজাত-বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়িতে বা বাগান-বাড়িতেই হইত। তাহাতে উদ্যোগকর্তার গণ্যমান্য আত্মীয় বন্ধুবর্গ ও পরিচিত জনেরা সাদরে নিমন্ত্রিত হইলেও সাধারণের অবারিত প্রবেশ ছিল না।

রবাহূত হইয়া গেলেও বিমুখ হইয়া ফিরিবার ভয় ছিল। সুতরাং তখনকার দিনে ইচ্ছা হইলেই সকলের পক্ষে উৎকৃষ্ট নাটকাভিনয় দেখা সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়া আর একটি অসুবিধাও ছিল। তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিকভাবে নাট্যাভিনয় আরম্ভ হয় নাই। কোন ধনী বা বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির উৎসাহে মাঝে মাঝে নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের হুজুক দেখা যাইত বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যু, মত-পরিবর্তন বা উৎসাহ লোপ হইলে সে নাট্যশালাও সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত হইত; এবং আর একজন নাট্যানুরাগী ব্যক্তির আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত প্রতীক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না।" "বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারে"র নিঃসম্বল যুবকগণ এই সত্যটি অনুধাবন করেছিলেন। অবশেষে ১৮৭২ সালে উক্ত সখের দলের যুবকবৃন্দ "ন্যাশনাল থিয়েটার" নাম দিয়ে একটি পেশাদারী সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপিত করলেন। উদ্যোক্তাদের মধ্যে নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর নাম উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্র প্রথমে এই দলে থাকলেও মতভেদ ঘটায় তিনি দল ত্যাগ করেছিলেন। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর কোন ভূমিকাই ছিল না। টিকিট বিক্রয় করে নাট্যালয়ের উদ্বোধন ঘটল। সর্বসাধারণ পেল প্রবেশাধিকার। ইতিহাসের নির্দেশ অনুসরণ করে বাগবাজারের নিঃসম্বল যুবকেরা যে কাজ করলেন সখের থিয়েটারের ধনী পৃষ্ঠপোষকেরা তা করতে পারেন নি।

এরপরে বাংলা পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে নানা ভাঙাগড়া চলতে লাগল; গড়ে উঠল ব্যাপক প্রতিযোগিতা একাধিক পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের মধ্যে। রঙ্গমঞ্চ নাট্যসাহিত্যের অপেক্ষা করতে লাগল, নাটক-সৃষ্টি হতে লাগল রঙ্গালয়ের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে যেমন এর ফলে নবজীবনাবেগ দেখা দিল, তেমনি প্রাচুর্য এল নাট্যসৃষ্টিতে। উৎকৃষ্ট নাটক রচনার পটভূমি গড়ে উঠল। চারদিকে উৎসাহ আগ্রহের সীমা রইল না। তবুও অত্যুৎকৃষ্ট মঞ্চানুগ নাটক যে রচিত হল না তার প্রধান কারণ প্রথমশ্রেণীর নাট্যপ্রতিভার অভাব।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের জন্ম

ভদ্রার্জুন ও কীর্তিবিলাস॥ ১৮৪০ সালে বিশ্বনাথ ন্যায়রত্ন অনূদিত "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম নাটক বলে ঐতিহাসিক গবেষকগণ কর্তৃক অভিহিত হয়েছে। মৌলিক নাটক পাওয়া যাচ্ছে ১৮৫২

সাল থেকে। এই বৎসর দুটি মৌলিক নাটক প্রকাশিত হল। তারাচরণ শিকদার লিখলেন "ভদ্রার্জুন"। কাহিনী মহাভারতের অর্জুন ও সুভদ্রার বিবাহ-ঘটনাকে আশ্রয় করেছে। কিন্তু ভূমিকায় নাট্যকার য়ুরোপীয় আঙ্গিক-অনুসরণের অঙ্গীকার করেছেন, "এই পুস্তক অত্যন্ত নূতন প্রণালীতে রচিত হইয়াছে,—। এই নাটক ক্রিয়াদি ও ঘটনাস্থানের নির্ণয় বিষয়ে য়ুরোপীয় নাটক প্রায় হইয়াছে, কিন্তু গদ্য পদ্য রচনার নিয়মের অন্যথা হয় নাই। সংস্কৃত নাটক সম্মত কয়েকজন নাট্যকারের ক্রিয়াদি গ্রহণ করি নাই, যথা প্রথমে নান্দী, তৎপরে সূত্রধর ও নটীর রঙ্গভূমিতে আগমন, তাহাদিগের দ্বারা প্রস্তাবনা ও অন্যান্য কার্য, এবং বিদূষক ইত্যাদি। এতদ্ব্যতিরিক্ত সংস্কৃত নাটক প্রায় য়ুরোপীয় নাটক হইতে বিভিন্ন নহে।" নাট্যরচনা হিসেবে "ভদ্রার্জুনের" মূল্য সামান্য। নাট্যপ্লট গঠনে, চরিত্রসৃষ্টিতে কিংবা সংলাপরচনায় নাট্যকার কিছুমাত্র দক্ষতা দেখাতে পারেন নি; পারা স্বাভাবিকও ছিল না। এ নাটকটির মূল্য ঐতিহাসিক কারণে। লক্ষ্য করবার মত, নাট্যরচনার সূচনায়ই বাঙালী নাট্যকার ইংরেজী নাটকের প্রতি কতটা আকর্ষণ অনুভব করেছেন।

যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত রচিত "কীর্তিবিলাস"ও ঐ একই বছরে প্রকাশিত হয়। "ভদ্রার্জুন" কমেডী ধরনের রচনা, কীর্তিবিলাস "ট্রাজেডি" রচনার চেষ্টা। রূপকথার শীত-বসন্ত জাতীয় একটি কাহিনী অবলম্বনে তিনি য়ুরোপীয় আদর্শে ট্রাজেডি লিখতে চেয়েছেন। সব দিকের বিচারেই এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এই চেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। নাটকের ভূমিকায় যোগেন্দ্র চন্দ্র লিখেছিলেন, "অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মিতে পারে যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যন্ত বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, এ কারণ সেক্স্পীয়র নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন—আমার অন্তকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক-প্রয়াসী।" অতএব যোগেন্দ্রচন্দ্র ট্রাজেডি লিখবার চেষ্টা করলেন। যে দেশের সাহিত্যিক ঐতিহ্য এই জাতীয় রচনাকে প্রশ্রয় দিতে নারাজ সে দেশে এইরূপ সাহসিক প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।

হরচন্দ্র ঘোষ॥ ১৮৫৩ সালে হরচন্দ্র ঘোষের অনুবাদধর্মী নাটক "ভানুমতী চিত্তবিলাস" প্রকাশিত হয়। নাটকটি সেক্সপীয়রের "Merchant of Venice"-এর মুক্ত অনুবাদ। কিন্তু ইংরেজী নাটকের অনুবাদ করতে

বসেও তিনি সংস্কৃত নাটকসুলভ নান্দী-সূত্রধরের মোহ পরিত্যাগ করতে পারেন নি। তাঁর নাটকে নাট্যগুণ পূর্ববর্তী নাটকদ্বয়ের তুলনায়ও অল্প। রচনা একেবারে বিবৃতিধর্মী। কথোপকথনে পাঠ্যপুস্তক জাতীয় গ্রন্থ রচনারই ইচ্ছা তাঁর ছিল। তাঁর "কৌরববিয়োগ" নাটক ১৮৫৮ সালে এবং অপর দুটি নাটক "চারুমুখ-চিত্তহারা" (সেক্‌সপীয়রের রোমিও জুলিয়েটের স্বাধীন অনুবাদ) এবং "রজতগিরিনন্দিনী" মধুসূদন-দীনবন্ধুর পরবর্তী কালের রচনা হলেও উন্নততর নাট্যকলার স্পর্শমাত্র তাঁকে বর্তায় নি। হরচন্দ্র ঘোষের একমাত্র দান বলে এটুকুই স্বীকার্য যে সেক্‌সপীয়রের নাটকের অনুবাদের তিনিই সূচনা করেন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২—৮৬)

পরিচয়॥ রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা নাটকের প্রথম রচয়িতা নন। তাঁর প্রথম নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ সালে। কিন্তু বাংলার প্রথম নাট্যকার রূপে তিনি অভিহিত হয়ে থাকেন। এইরূপ অভিধা দেওয়া ঐতিহাসিক নয় ঠিকই, তবুও একে একেবারে অকারণ বলা যায় না। তাঁর প্রথম নাটক "কুলীনকুলসর্বস্বে" বাস্তব সমাজ-সমস্যা যেভাবে প্রকটিত হয়েছিল পূর্বে তা আর দেখা যায় নি।

রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। আধুনিক ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয়ও ছিল না। সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের বিদ্যালয়েই তিনি পাঠ নিয়েছিলেন। অনেকগুলি সংস্কৃত নাটক অনুবাদ করে তিনি হাত পাকিয়েছিলেন। সংস্কৃত নাট্যআঙ্গিকের প্রভাব অতিক্রম করা তাঁর পক্ষে ছিল একরূপ অসম্ভব। এমন কি সমকালীন বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত নাটকেও তিনি নান্দী-প্রস্তাবনা পরিহার করতে পারেন নি, গদ্যে-পদ্যে সংলাপ লিখেছেন। কিন্তু সংস্কৃত নাট্যকলার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েও ইংরেজী অনভিজ্ঞ রামনারায়ণ শুধু মাত্র আপন অন্তর্দৃষ্টির বলে নবযুগের আহ্বায়ক হতে পেরেছেন। প্রথমত, সমকালীন সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে তিনি একাধিক নাটক ও প্রহসন রচনা করেছেন, সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ এবং পুরাণের রাজ্যে আপনাকে আবদ্ধ করে রাখেন নি। দ্বিতীয়ত, সমসাময়িক সমাজসমস্যা বিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সমাজচেতনা নবযুগের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছে। প্রহসনের সমাজবোধে যে লঘুতা থাকে তাঁর দু'খানি পূর্ণাঙ্গ নাটক তা থেকে

মুক্ত ছিল। তৃতীয়ত, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হয়েও তিনি একখানি ট্রাজেডি লিখে মোহমুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। চতুর্থত, প্রধানত সংস্কৃতানুগ আলঙ্কারিক রীতির সংলাপ রচনা করলেও কখনো কখনো তাতে জীবননৈকট্য এবং উত্তাপ অনুভূত হয়েছে।

নাট্যগ্রন্থাবলী। "কুলীনকুলসর্বস্ব" (১৮৫৪) তাঁর প্রথম নাটক। তারপর তিনি "বেণীসংহার", "রত্নাবলী" ও "শকুন্তলা" নাটকের অনুবাদ করেন (১৮৫৬-৬০)। পরে তিনি "মালতী মাধব" নাটকেরও অনুবাদ করেন। তাঁর পুরাণাশ্রিত নাটকগুলির মধ্যে "রুক্মিণীহরণ," "ধর্মবিজয়" (হরিশ্চন্দ্র-কাহিনী অবলম্বনে রচিত) ও "কংসবধে"র নামোল্লেখ করতে হয়। এ-ছাড়া তিনি "চক্ষুদান", "উভয়সঙ্কট" প্রভৃতি প্রহসন এবং "নবনাটক" (১৮৬৬) নামক গম্ভীর সামাজিক নাটকও লিখেছিলেন।

তাঁর অনুবাদ নাটকগুলির সম্বন্ধে বলবার কিছু নেই। লক্ষণীয়, আকস্মিক-ভাবে "কুলীনকুলসর্বস্ব" লিখে প্রশংসা পেয়ে নাট্যকারের জীবন যখন তিনি বরণ করতে চাইলেন তখন পর পর সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ করতে লাগলেন। এর মধ্যে শিক্ষানবীশের মনোভাব থাকা অসম্ভব নয়। "রত্নাবলী" প্রভৃতি কোন কোন অনুবাদ সমকালীন রঙ্গমঞ্চেও সাফল্য লাভ করেছিল।

রামনারায়ণের পৌরাণিক নাটকগুলি তাঁর অনুবাদগুলিরই কিছু রূপভেদ মাত্র। চরিত্রচিত্রণ বা কাহিনী-সংগঠনে তিনি বিশেষ কোন সাফল্য দেখাতে পারেন নি। পুরাণ-কাহিনীর পরিবর্তন বা কাহিনীতে ধর্ম ও ভক্তিমূলক কোন উদ্দেশ্য আরোপের চেষ্টা তিনি করেন নি। সংস্কৃত নাটকের মত বিবৃতিপ্রাধান্য এদের প্রাণহীন করে তুলেছে।

রামনারায়ণের প্রথম নাটকটি লঘু ভঙ্গিতে রচিত হলেও বিষয়গুরুত্বে মামুলী প্রহসনের পর্যায়ে আদৌ পড়ে না। প্লটে সংহতির অভাব আছে, কতকগুলি বিচ্ছিন্ন নক্‌শার মত শিথিলবদ্ধ সঙ্কলন বলে একে মনে হয়। তবে কুলপালকের তিন কন্যার চরিত্র-সৃষ্টিতে এবং তাদের অলঙ্কারবর্জিত সংলাপরচনায় তিনি বিস্ময়কর জীবনসামীপ্য দেখিয়েছেন। কৌলীন্য-প্রথার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করে রহস্যরস সৃষ্টি করলেও রামনারায়ণ মনের দিক থেকে ছিলেন 'সিরিয়াস'। গম্ভীর রসের সামাজিক নাটকের সাফল্য-সম্ভাবনা বুঝতে না পারায় সে-পথে পা বাড়াতে তখন তিনি সাহস করেন নি। বহু বিবাহকে ধিক্কার দিয়ে লেখা নাটকে তিনি "নীলদর্পণে"র আদর্শে বহু

মৃত্যুঘটিত ট্রাজেডি সৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। অবশ্য নাট্যরচনা হিসেবে "নবনাটক" সাফল্যমণ্ডিত হয় নি।

কালীপ্রসন্ন সিংহ॥ কালীপ্রসন্ন সিংহের "বাবু" নামক প্রহসন ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত হয়। "কুলীনকুলসর্বস্ব" ঐ একই বছরে কিছু পরে প্রকাশিত হয়। "বাবু" বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহসন। এই ঐতিহাসিক মূল্য ব্যতীত বিশেষ কোন সাহিত্যিক মূল্য এই নাটকের নেই। তিনি "বিক্রমোর্বশী" এবং "মালতী মাধব" নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অনুবাদে অন্য গুণ বিশেষ না থাকলেও তা যে নিশ্চিতভাবে মূলানুগ ছিল তাতে সন্দেহ নেই। ১৮৫৮ সালে তিনি পুরাণ কাহিনীকে আশ্রয় করে "সাবিত্রী-সত্যবান" নামে একটি নাটক রচনা করেছিলেন। অনেকগুলি নাটকরচনা, বিদ্যোৎসাহিনী নামক রঙ্গমঞ্চ পরিচালনা, অভিনয় প্রভৃতি নানা দিক দিয়ে কালীপ্রসন্ন বাংলা শিশু নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতিকে সাহায্য করেছিলেন।

উমেশচন্দ্র মিত্র ও "বিধবাবিবাহ" নাটক॥ রামনারায়ণ সমকালীন সমাজ-সমস্যা নিয়ে নাট্যরচনার পথ দেখালেন। এই পথ ধরে অনেক নাটক রচয়িতা অগ্রসর হলেন। সেকালের সমাজসংস্কারমূলক আন্দোলনগুলির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কয়েকটি নাটক রচিত হল। তার মধ্যে নাটকীয় গুণের দিক থেকে উমেশচন্দ্র মিত্রের "বিধবা বিবাহ" (১৮৫৬) উল্লেখযোগ্য। এই নাটকে বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত সামাজিক আন্দোলনকে প্রচারধর্মী বক্তৃতায় রূপান্তরিত না করে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকরূপেই উপস্থিত করলেন। এটি বাংলা নাটকের দ্বিতীয় ট্রাজেডি এবং নিঃসন্দেহে ট্রাজেডির রস এখানে অনেকটা দানা বেঁধেছে।

ইতিহাসের বিচার : পথের অনুসন্ধান॥ মধুসূদন-পূর্ববর্তী বাংলা নাটকে পথ খোঁজার পালা চলেছে। প্রত্যক্ষভাবে যাত্রার ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে বাংলা নাটক চলতে শুরু করল। কিন্তু ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের মধ্যে ভবিষ্যৎ বাংলা নাটকের পথ খোঁজা চলেছে এই পর্বে। ইংরেজী রঙ্গালয়ের অনুসরণে সখের থিয়েটার স্থাপিত হয়েছে। দু'একখানা ইংরেজী নাটকের অনুবাদও হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত নাটকের অনুবাদের দিকে এখনও ঝোঁকটা বেশি। সংস্কৃত নাটকের অনুসরণেই গড়ে উঠেছে পুরাণাশ্রিত নাটক। সংস্কৃত নাট্যকলার নানা ভঙ্গির অনুসরণ চলেছে। মৌলিক সামাজিক নাটকে, এমন কি ইংরেজী নাটকের অনুবাদেও নান্দী-প্রস্তাবনা স্থান পেয়েছে। সংলাপে গদ্য-পদ্যের মিশ্রণ চলেছে।

এমন কি অঙ্কবিভাগ ও বিদূষক চরিত্র-কল্পনায়ও সংস্কৃতানুসারিতা চলেছে। সংলাপের সংস্কৃতানুগ বর্ণনামূলক ভাষা এবং সামগ্রীকভাবে নাটকের বিবৃতি-ধর্মও (narrative nature) লক্ষণীয়। সংস্কৃত প্রভাবের আধিক্য সত্ত্বেও সচেতনভাবে অনেকে ইংরেজী আদর্শ অনুসরণের প্রস্তাব করলেন। ইংরেজী আদর্শকে তাঁরা হয়ত যথাযথ অনুধাবন করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁদের বাসনার ঐতিহাসিক ভূমিকাটি স্বীকার্য। ট্রাজেডি রচিত হতে লাগল। কেউ কেউ সংস্কৃত আঙ্গিকের প্রতি উচ্চকণ্ঠে বিরূপতা দেখালেন।

বাংলা নাটকের প্রথম পর্বেই আমরা ট্রাজেডি, গম্ভীর রসাত্মক কমেডী এবং প্রহসনের সঙ্গে পরিচিত হলাম। পৌরাণিক, সামাজিক এবং কাল্পনিক নাটক লাভ করলাম। একমাত্র ঐতিহাসিক নাটকের এখনও সূচনা হয় নি। কিন্তু প্রথম পর্বের নাট্যকারেরা সমকালীন সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে বিস্ময়কর সচেতনতা দেখালেন। প্রধান নাট্যকারেরা সবাই প্রগতিশীল মনোভাবের পরিচয় দিলেন, এটি বাঙালীর পক্ষে শ্লাঘার কথা।

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪—৭৩)

পরিচয়॥ মধুসূদন দত্ত বাংলা কাব্যে আধুনিকতার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা নাটকেও তিনি আধুনিকতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি নবজাগৃতির মর্মসত্যকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের ন্যায় বুদ্ধি দিয়ে গ্রহণ করেন নি, জ্ঞানসাধনা ও সমাজকর্মের মধ্যে প্রয়োগ করতে চান নি। তিনি আপন ব্যক্তিত্বের মধ্যে, উপলব্ধির সমগ্রতা দিয়ে এই সত্যকে বুঝেছিলেন। শিল্পরূপে সেই বোধকে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। অবশ্য একথা স্বীকার্য, মধুসূদনের প্রতিভা যে-পরিমাণ কাব্য-সাফল্য লাভ করেছিল, সে-পরিমাণ শ্রেষ্ঠত্ব নাট্য-রচনায় আয়ত্ত করতে পারে নি। তিনি প্রথম শ্রেণীর কাব্যরচনা করেছেন, কিন্তু প্রথম শ্রেণীর নাটক লেখেন নি। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যের সাধারণ দুর্বলতার কথা মনে রাখলে মধুসূদনের নাট্য-কৃতিরও প্রশংসা না করে পারা যাবে না। মঞ্চানুগ নাট্যধারায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীর নাটক কেউই লেখেন নি। তুলনামূলক ভাবে উৎকৃষ্ট নাটক যাঁরা লিখেছেন মধুসূদন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বাংলা ভাষায় তিনিই প্রথম ভাল নাটক লিখেছেন। তার চেয়েও বড় কথা বাংলা নাট্যসাহিত্যের মুক্তির পথটি তিনিই স্পষ্ট ভাষায় দেখিয়ে দিয়েছেন।

ইতিহাসের বিচার॥ প্রাক-মধুসূদন নাট্যধারার সঙ্গে তুলনা করলেই

ইতিহাসের দিক থেকে মধুসূদনের ভূমিকার যোগ্য বিচার করা হবে। এক। প্রাক্-মধুসূদন নাট্যকারদের মধ্যে কেউ কেউ স্পষ্ট ভাষায় ইংরেজী নাট্যকলাকে অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেছেন, ইংরেজী নাট্যাদর্শ অনুসরণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ইংরেজী আদর্শটি সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। মধুসূদন সংস্কৃত ধারা ও ইংরেজী ধারার পার্থক্যটি স্পষ্ট ও গভীর ভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি একটি পত্রে লিখেছিলেন, "In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment ; with us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of fairy land.···Ours are dramatic poem···"। দুই। বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে তিনি বিস্তৃততর করলেন। পূর্বধারা মত পৌরাণিক এবং সামাজিক প্রহসন তিনিও লিখেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বিষয়-বস্তুকে অবলম্বন করে তিনিই প্রথম নাটক লিখলেন আমাদের সাহিত্যে। দেশীয় পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যরূপের পাশাপাশি তিনি গ্রীক পুরাণকাহিনীকেও স্বচ্ছন্দ ভাবেই তাঁর নাটকে গ্রহণ করলেন। তিন। নাট্যগুণের দিক থেকে পূর্ববর্তীদের তুলনায় তিনি বিস্ময়কর সমুন্নতি দেখালেন। নাটকের পক্ষে ন্যূনতম প্রয়োজন একটি সম্পূর্ণাঙ্গ কাহিনী। কাহিনীটি বিবৃতিধর্মী হবে না—সংঘাতসঙ্কুল ঘটনায় তার প্রকাশ ঘটবে এবং জীবন্ত চরিত্র-সৃষ্টি বালসুলভ সামান্যতা থেকে নাটককে রক্ষা করবে। এই তিনটি লক্ষণই মধুসূদনের নাটকে প্রথম দেখা দিল, এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে এর পরিণত রূপ 'উপভোগের সামগ্রী হয়ে উঠল। চার। পরবর্তীকালে গণজীবনের যে রূপ দীনবন্ধুর নাটককে বিশিষ্টতা দিয়েছে তারও আদিস্রষ্টা মধুসূদন। পাঁচ। মধুসূদন যুগ-সত্যের উদ্বেলিত হৃদয়াবেগকেই শুধু গ্রহণ করেন নি, বুদ্ধি দিয়ে তার অপূর্ণতা, মূল ভাবনাদ্বন্দ্ব এবং সুগভীর সঙ্কটও বুঝেছিলেন। তাঁর এই তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে বিশেষ করে প্রহসন দু'খানিতে। ছয়। নাট্যকলাবিষয়ে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন। তাঁর একাধিক পত্রে এর প্রমাণ আছে। মাত্র অভিনয়ের মধ্য দিয়েই যে নাটকের আবেদন জনমানসে গিয়ে পৌঁছতে পারে এ সত্য তিনি জানতেন। তাঁর নাটকগুলির অভিনয় সম্বন্ধে তিনি অত্যধিক আগ্রহ পোষণ করতেন।

নাট্যগ্রন্থাবলী॥ মধুসূদন নাট্যকার রূপেই বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে দেখা দিলেন। এর আগে তিনি ইংরেজী ভাষার চর্চা করেছেন, বাংলায় কিছু

লেখেন নি। খুব আকস্মিকভাবেই তিনি বাংলা নাট্যরচনায় অগ্রসর হন। বেলগাছিয়া থিয়েটারের সঙ্গে শুভ যোগাযোগই এর জন্য দায়ী। রত্নাবলীর নাট্যগুণগত দুর্বলতা (তখন রত্নাবলীর বঙ্গানুবাদ বেলগাছিয়া থিয়েটারে জাঁক-জমকের সঙ্গে অভিনীত হত।) এবং বাংলা ভাষায় নাটকের অভাব দেখে তিনি নাটক লিখতে শুরু করলেন। মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতির কাহিনীটি অবলম্বন করে তিনি পৌরাণিক নাটক রচনা করলেন। "শর্মিষ্ঠা" (১৮৫৯) নাটকে মধুসূদন সংস্কৃত নাটকের প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। একটি প্রস্তাবনা সঙ্গীত এবং একটি উপসংহার গীতি এর প্রথম সংস্করণে ছিল, পরবর্তী সংস্করণে তা তুলে দেওয়া হয়েছে। নাটকের সংলাপের ভাষা একান্ত ভাবেই সংস্কৃতানুগ। সংস্কৃত নাটকে যেমন বর্ণনাত্মক অতিদীর্ঘ সংলাপ সংযোজনার রীতি প্রচলিত, শর্মিষ্ঠায় তার অত্যধিক প্রয়োগ নাটকটিকে অনেকাংশে কৃত্রিম করে তুলেছে। বিশেষ করে শকুন্তলা নাটকের অনুসরণ চোখে পড়ে। কালিদাসসুলভ কোমল স্পর্শকাতরতা এই নাটকে বড়ই প্রকট। শর্মিষ্ঠা নাটকে মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য নাট্যকলার আদর্শটিকে আদৌ জয়যুক্ত করতে পারেন নি। নাটকটিতে ঘটনা (action) এবং সংঘাত (conflict)-য়ের তুলনায় বিবৃতিধর্ম (narration) প্রাধান্য পেয়েছে। চরিত্র-চিত্রণের ক্ষেত্রেও মেঘনাদবধসুলভ বিদ্রোহী স্বাতন্ত্র্যের স্পর্শমাত্র নেই। তবে মহাভারতের বিরুদ্ধতা না করেও তিনি দেবযানী ও শুক্রাচার্যের চরিত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কিছু পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন। শর্মিষ্ঠা-চরিত্রে সংস্কৃত নাটকের নায়িকার চিরাচরিত কোমল-লালিত্যই অনুসৃত হয়েছে।

দ্বিতীয় নাটক "পদ্মাবতী" এর অব্যবহিত পরেই রচিত, অবশ্য প্রকাশিত হয় কিছু পরে, ১৮৬০ সালে। গ্রীক পুরাণের কাহিনীকে আশ্রয় করে মধুসূদন প্রথমেই সাহসের পরিচয় দিলেন। শুধুমাত্র কাহিনীটি গ্রহণই করলেন না, তাকে সম্পূর্ণত দেশীয় রূপ দান করলেন তিনি। পূর্বসংস্কারে আচ্ছন্ন না হলে পদ্মাবতীর কাহিনীটি যে বিদেশী তা বুঝবার উপায় নেই। বেশ নিপুণতার সঙ্গে গ্রীক apple of discord-এর কাহিনী ভারতীয় রূপে প্রাণ লাভ করেছে। গ্রীক স্বর্ণআপেল গল্পের পরিণতিতে প্যারিসের হেলেন-লাভই মাত্র নয়, আছে ট্রয়যুদ্ধ এবং সর্বধ্বংসের অগ্নিযজ্ঞ। 'পদ্মাবতী' নাটকে আছে শচী, রতি ও মুরজা নাম্নী তিন দেবীর স্বর্ণআপেল লাভের বাসনা, রাজা ইন্দ্রনীল কর্তৃক রতিকে সুন্দরী-শ্রেষ্ঠা আখ্যা দান এবং পরিশেষে ইন্দ্রনীলের পদ্মাবতী লাভ; এবং কিছু বিপৎপাতের পরে স্থায়ী মিলন। শেষ মিলনদৃশ্যের পরিকল্পনায় শকুন্তলার

প্রভাব খুবই স্পষ্ট। পদ্মাবতী নাটক নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এক। শর্মিষ্ঠার তুলনায় এটি নাট্যগুণে অনেক সমৃদ্ধ। ঘটমানতা এবং সংঘাতভিত্তি আদ্যন্ত রক্ষা করার চেষ্টা হয়েছে। অবশ্য বিবৃতিধর্মকে একেবারে পরিহার করা যায় নি। সংলাপে বহু স্থানে সংস্কৃতানুগ আলঙ্কারিকতা ও অকারণ দৈর্ঘ্য এখনও বজায় আছে। দুই। চরিত্রচিত্রণে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিন দেবীর ব্যক্তিচরিত্রের পার্থক্যটি যেমন সূক্ষ্মভাবে আঁকা হয়েছে তেমনি তাদের মানবিক স্বাভাবিকতাও উজ্জ্বলভাবে ফুটেছে। নারদ চরিত্রের কৌতুককর রূপ এবং য়ুরোপীয় ধরনের ভিলেন কালপুরুষ বেশ ভাল ভাবেই চিত্রিত হয়েছে। তিন। ভারতীয় নাম কিন্তু গ্রীক স্বভাবসম্পন্ন দেবতা এই নাটকে প্রথম তিনি সৃষ্টি করেছেন। মেঘনাদবধ কাব্যে এই ধারার অনুসরণ লক্ষণীয়। চার। কালপুরুষের সংলাপে অমিত্রাক্ষর রচনার প্রথম প্রয়াসের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এ-ক্ষেত্রেও মধুসূদনের নাট্যরুচির বিশেষ প্রশংসা করতে হয়। ঐ চরিত্রটির কল্পনায় যেমন বিশিষ্টতা আছে, তেমনি সে আদ্যন্তই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথা বলেছে। ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে চরিত্রটিকে তিনি বলি দেন নি।

মধুসূদন "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা" (১৮৬০) নামে দু'খানি প্রহসন লিখেছিলেন। সমকালীন বাংলা সাহিত্যের এ দু'খানি শ্রেষ্ঠ প্রহসন এবং এযাবৎ উৎকৃষ্টতর প্রহসন বাংলা ভাষায় রচিত হয় নি। এ-যুগের প্রায় অসংখ্য প্রহসনের মধ্যে এ দু'টির অনন্যতা শুধুমাত্র রচনা ভঙ্গির জন্যই নয়, সমাজচেতনার বিশিষ্টতা এবং ব্যাপকতার দ্বারাও সিদ্ধ। প্রহসন রচনা করতে বসে অধিকাংশ নাট্যকারই সমাজের নানা সমস্যা, কিংবা ব্যক্তিচরিত্রের বিচিত্র দুর্বলতাকে অবলম্বন করেন। মধুসূদনের নাটকে সমাজ-সমস্যার চিত্র আছে, ব্যক্তিগত দুর্বলতাকেও বিষয়রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বিধবা-বিবাহ কিংবা কৌলিন্যপ্রথাকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করার তুলনায় এ দু'টির স্বাতন্ত্র্য কত গভীর। এ দু'টি প্রহসনে সমগ্র যুগসঙ্কট যেন প্রতিফলিত হয়েছে। নবযুগের উল্লাস-উদ্বেলতার অন্তরালে নব্যপন্থীদের উচ্ছৃঙ্খলতা এবং প্রাচীনপন্থীদের বর্বরতা যে-গভীর অন্ধকারের সৃষ্টি করে রেখেছে সেদিকে মধুসূদনের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ দৃষ্টিপাত ঘটেছে। দ্বিতীয়ত, বিস্ময়কর নিরপেক্ষতা ও বাস্তববোধ নিয়ে তিনি প্রহসন দু'টি রচনা করেছেন। কোন পন্থার প্রতিই কৃপাবর্ষণ করেন নি। তৃতীয়ত, দু'টি প্রহসনই নক্সাধর্মী বিচ্ছিন্ন নাট্য-চিত্র না হয়ে পূর্ণাঙ্গ কাহিনী-ভিত্তিক রচনা হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা' প্রায় সব

দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ নাটকের লক্ষণযুক্ত। চতুর্থত, চরিত্রসৃষ্টিতে বহু ক্ষেত্রে শ্রেণীধর্ম প্রশ্রয় পেলেও, অধিকাংশ চরিত্রই প্রাণবন্ত। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' য়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র চরিত্রই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। পঞ্চমত, সংলাপ রচনায় চলিত ভাষার ব্যবহার সার্থক, তীক্ষ্ণ এবং প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ চরিত্রানুযায়ী। গ্রাম্য ভাষার ও উচ্চারণ ভঙ্গির ব্যবহারে, ইংরেজীমিশ্রিত বুলিতে, ফার্সীমিশ্রিত কথায় তিনি ব্যক্তি-মানুষের মুখভাবকেও অনেকটা ধরে রেখেছেন।

মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" (১৮৬১) টডের রাজস্থান গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। টডের রাজস্থান কিম্বদন্তীবহুল হলেও সে-কালে ইতিহাস রূপেই সম্মানিত হত। টডের রাজস্থান থেকে বহুযত্নে ও পরিশ্রমে কাহিনীটি তিনি গ্রহণ করেছেন, তাঁর পত্রে এ-বিষয়ে স্বীকৃতি আছে। এটিকে ঐতিহাসিক নাটকরূপে তাই গ্রহণ করা যায়। বাংলা ভাষার এই প্রথম ঐতিহাসিক নাটকেই স্বাদেশিকতার সুর বেজেছে। অবশ্য সেকালে এই চেতনা যথেষ্ট স্পষ্ট এবং তীব্র হওয়া সম্ভব ছিল না। এই সুর তাই কৃষ্ণকুমারীতে ক্ষীণভাবেই মাত্র অনুভব করা যায়। কৃষ্ণকুমারী একটি ট্রাজেডি। এর পূর্বে বাংলা ভাষায় আরও দু'খানি ট্রাজেডি রচিত হয়েছে। "বিধবা-বিবাহে"র সাফল্য স্বীকার্য হলেও নিরপরাধ কৃষ্ণকুমারীর আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে অজ্ঞাত নিয়তির প্রবল শক্তি এবং মানবজীবনের দৈবতাড়িত অনিবার্য পরিণতি এমন একটা শুষ্ক হাহাকারে চিত্ত ভরে দেয় যা অনাস্বাদিতপূর্ব। এই নাটকের ঘটনাসংস্থানে যেমন-নৈপুণ্য আছে তেমনি আছে চরিত্রচিত্রণে ও সংলাপরচনায় সাফল্য। সংলাপে কোথাও কোথাও সংস্কৃতানুকারিতা থাকলেও সহজ স্বাভাবিকতাই বেশী। মদনিকা ও ধর্মদাসের চরিত্র ও সংলাপে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, চাতুর্য, খলতা বা সহৃদয়তা বিচিত্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিলাসবতীর চরিত্রকল্পনায় সংস্কৃত বসন্তসেনার চরিত্রের কিছু প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু বারবনিতার চরিত্রে প্রকৃত প্রণয় আবিষ্কার করে মধুসূদন নবমানবতাকেই জয়ী করেছেন। কৃষ্ণকুমারী-চরিত্রের বিকারহীন সরলতা এবং ভীমসিংহের মধ্যে দেশপ্রেম ও সন্তান বাৎসল্যের দ্বন্দ্ব এবং তার স্পর্শে জড়িত একটি গম্ভীর বিষণ্ণতা সুচিত্রিত হয়েছে। অবশ্য প্রথম শ্রেণীর ট্রাজেডি একে বলা যায় না। সংলাপের দৈর্ঘ্য, স্বগতোক্তির বাহুল্য, গঠনরীতির রোমান্টিক অতিবিস্তার এর নাট্যরসকে কিছুটা তরল করে ফেলেছে।

মধুসূদন শেষজীবনে "মায়া-কানন" নামে যে নাটকটি লিখেছিলেন তাতে

নাটকীয় গুণ অধিক নেই। কবির ব্যক্তিগত জীবনের হতাশার প্রতিফলন এই রচনাটিতে স্পষ্ট।

দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩)

পরিচয়॥ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধুর অবদানের মূল্য সুপ্রচুর। মধুসূদনের অব্যবহিত পরেই তিনি নাট্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। প্রধানত মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সাধনায় বাংলা নাটক প্রাথমিক পর্বের বিচিত্র দুর্বলতা ও অসঙ্গতি কাটিয়ে ওঠে। যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে বাংলা নাটকের শৈশব চলেছে এঁদের দু'জনের হাতেই তার অবসান ঘটে। তার পথ খোঁজার পালা শেষ হয়। মধুসূদন ও দীনবন্ধু বাংলা নাটকের ঐতিহাসিক ভবিষ্যৎ দেখিয়ে দেন।

নাট্যগ্রন্থাবলী॥ দীনবন্ধুর প্রথম নাটক "নীলদর্পণ" প্রকাশিত হয় ১৮৬০ সালে। প্রথম সংস্করণে নাট্যকারের নাম ছিল না। কারণ স্বভাবতই রাজরোষের ভয়। নীলদর্পণের ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। সমাজ-জীবনের উপরে এই একটিমাত্র গ্রন্থ সেকালে যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে আঙ্কল টমস্ কেবিনের সঙ্গে সত্যই এর তুলনা করা চলে। ইংরেজ নীলকরেরা অতিরিক্ত মুনাফার লোভে কিভাবে বাংলার চাষীদের উপর অত্যাচার চালিয়েছিল তার মর্মন্তুদ চিত্র এই নাটকে স্থান পেয়েছে। এই মুনাফাবাজীতে ইংরেজ শাসনকর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ছিল এবং দরিদ্রতম রায়ত থেকে শুরু করে অবস্থাপন্ন জোতদারেরা পর্যন্ত এর ফলে বিপর্যস্ত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে অত্যাচারিত নীলচাষীরাই সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এদেশের ইতিহাসে প্রথম সাধারণ হরতাল পালন করেছিল। কলকাতার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাংবাদিকতা প্রভৃতির মাধ্যমে যে তুমুল আলোড়ন গড়ে তুলেছিলেন দীনবন্ধুর নাটক তাতে ভাবাবেগ সঞ্চারিত করল। বুদ্ধির ও যুক্তির সঙ্গে হৃদয় যুক্ত হল। জনসাধারণের মধ্যে এই হৃদয়গত আবেদনের প্রভাব অনেক বেশী গভীর। নানা অর্থনৈতিক কারণে পরে নীলচাষ বন্ধ হয়ে গেল। "নীলদর্পণে"র ভূমিকার গুরুত্বও এ ব্যাপারে বড় কম ছিল না। কিন্তু নীলদর্পণ নাটক এদেশের মানসগঠনে ব্যাপকতর প্রভাব বিস্তার করেছিল। নীলদর্পণ সমকালীন আর পাঁচটি সমাজ-সংস্কারমূলক নাটকের অনুরূপ নয়। এর মধ্যে একটি বৃহৎ রাজনৈতিক প্রশ্নকে উদ্যত করে তোলা হয়েছে। নীলচাষীদের উপরে ইংরেজ নীলকরদের

অত্যাচার, ইংরেজ আদালতের পক্ষপাতমূলক বিচারব্যবস্থা, নবীনমাধব-তোরাপদের প্রতিরোধ চেষ্টা পরোক্ষত কিন্তু গভীরভাবে বাঙালীর জাতীয় চেতনাকে পুষ্ট করতে লাগল। ১৮৬০ সাল থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধ জুড়ে, প্রাক্-স্বাধীনতা কাল পর্যন্ত নীলদর্পণ বাঙালীর স্বাধীনতা-কামনাকে তীব্র করেছে, স্বাজাত্যাভিমানকে সমর্থন করেছে। নীলদর্পণের ঐতিহাসিক প্রভাব নীলচাষ আন্দোলনকে অবলম্বন করলেও তার মধ্যে মাত্র সীমাবদ্ধ ছিল না। বিংশ শতকের প্রারম্ভের পূর্বে জাতির রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার প্রতি অপর কোন নাটকই এতবড় প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি।

নাট্যসৌন্দর্যের দিক থেকে নীলদর্পণে নানাবিধ ব্যর্থতা আছে। কাহিনী-গঠনে যথেষ্ট পরিমাণে সংহতির পরিচয় দিতে পারেন নি নাট্যকার। নবীন-মাধব এবং ক্ষেত্রমণিদের কাহিনীর মধ্যে অচ্ছেদ্য নিবিড়তা ঘটানো সম্ভব হয় নি। সংস্কৃত আলঙ্কারিকতার প্রতি আকর্ষণ এবং স্বতন্ত্র চিন্তা-উপলব্ধির মধ্যে নাট্যকারের মন আন্দোলিত হয়েছে। নীলবিদ্রোহের কাহিনীতে তোরাপের ন্যায় চাষীকে নায়কত্বে বরণ করবার আন্তরিক আগ্রহকে সংযত করে ধীরোদাত্ত নায়কের অনুসন্ধানে নবীনমাধবের নিকটে তাঁকে পৌঁছতে হয়েছে। বৃহৎ কৃষক-গোষ্ঠীর সর্বব্যাপক সর্বনাশের ট্রাজেডির স্থানে নবীন-মাধবদের পারিবারিক করুণ কাহিনীর বিস্তৃত বিবরণ তাঁকে দিতে হয়েছে। সে পরিবারের বেদনা ব্যাপক কৃষকসমাজের ট্রাজেডির প্রতিভূ হতে পারে নি। নীলদর্পণে দীনবন্ধু নাট্যসৌন্দর্যের দিক থেকে একমাত্র সফলতা দেখিয়েছেন চাষীদের চরিত্রাঙ্কনে, পদী ময়রানী, গোপী নায়েবের মত ইতর শ্রেণীর মানুষদের অন্তর-বেদনার উদ্ঘাটনে। এদের সংলাপের প্রাণবন্ত ভঙ্গি ও ব্যক্তিগত স্বরবৈশিষ্ট্য দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার উজ্জ্বল নিদর্শন।

নীলদর্পণে দীনবন্ধু এক অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। ১৮৬০ সালেই তিনি কৃষক জনসাধারণের জীবন ও সংগ্রামকে নাট্যভাত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তখনও কাল প্রস্তুত হয় নি। কালকে অতিক্রম করার ক্ষমতা ছিল না দীনবন্ধুর। কালপুরুষ মধুসূদনের পক্ষে যে-জাতীয় সিদ্ধি আয়ত্তাতীত ছিল না, দীনবন্ধুর কাছে তাই ছিল ব্যর্থ সাধন। সমকালীন নাগরিক সভ্যতার কদর্যতাকে একহাতে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেছেন দীনবন্ধু, গ্রাম্যবর্বরতার প্রতি জানিয়েছেন ধিক্কার, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ভদ্রলোকের নিস্তরঙ্গ জীবন বড় বেশী বিবর্ণ মনে হয়েছে তাঁর কাছে। তিনি অন্তর্থক জীবনআবেগ খুঁজেছিলেন বাংলার কৃষকদের মধ্যে, গণঅভ্যুত্থানের পটভূমিতে তাঁর প্রথম নাট্যকাহিনীকে

স্থাপিত করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩০ সালের পূর্বে এ-জাতীয় বাস্তবতার জীবন্ত ভাষারূপায়ণ বাংলা সাহিত্যে ঘটে নি। সামগ্রীক নাট্যরসের দিক থেকে নীলদর্পণ তাই ব্যর্থ হয়েছে। সংলাপে-সরসতায়-প্রাণবন্ত চারিত্ররূপে এর যে বিচ্ছিন্ন অংশগুলি সাহিত্যকর্মরূপে অমরত্বের দাবীদার তা মহত্তর সাফল্যের সম্ভাবনা বহন করে।

নীলদর্পণ রচনার মধ্য দিয়ে দীনবন্ধুর অন্তরের শিল্পীসত্তা অনুভব করেছিল তাঁর মানসপ্রবণতাকে নাট্যভাত করবার সময় আসে নি। তিনি তাই কৌতুক-কথার দিকে ফিরলেন, রোমান্সরস আস্বাদে তৃপ্তি খুঁজলেন। কিন্তু "নবীন তপস্বিনী" (১৮৬৩), "কমলে কামিনী" (১৮৭৩) নাটক একেবারেই ব্যর্থ হল। রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী গঠনের প্রতিভা তাঁর ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই বলেছিলেন, "...যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। তাঁহার লীলাবতী, মালতী, কামিনী, সৈরিন্ধ্রী, সরলা প্রভৃতি রসজ্ঞের নিকট তাদৃশ আদরণীয়া নহে। তাঁহার বিনায়ক, রমণীমোহন, অরবিন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে না। কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভুতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।" রোমান্টিক কমেডি "লীলাবতী"ও চরিত্রগঠন, কাহিনীনির্মিতি এবং নাট্যরস-সৃষ্টি সব দিক দিয়েই ব্যর্থ হয়েছে, বরং এ-সব নাটকে দুই-একটি কৌতুক রসাত্মক পার্শ্বঘটনা ও পার্শ্বচরিত্র সৃষ্টিতে তিনি দক্ষতা দেখিয়েছেন। নবীন তপস্বিনীর জলধর-প্রসঙ্গ স্থূল হলেও উপভোগ্য, এবং লীলাবতীর হেমচাঁদ-নদেরচাঁদ কৌতুকরসে উজ্জ্বল।

দীনবন্ধুর তিনটি প্রহসন তুলনামূলকভাবে উন্নততর রচনানৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। "বিয়ে পাগলা বুড়ো" (১৮৬৬), "সধবার একাদশী" (১৮৬৬) এবং "জামাইবারিক" (১৮৭২) সর্বাংশে ব্যর্থ হয় নি। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র কাহিনী-অংশে সামাজিক ব্যঙ্গ অপেক্ষা ব্যক্তি-চরিত্রের দুর্বলতাকে কেন্দ্র করে বর্ষিত কৌতুকই বড় হয়ে উঠেছে। রচনাটিকে একেবারে কৌতুকচিত্র বলে অভিহিত করা যায় না, মামুলী হলেও একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনী এ-রচনায় স্থান পেয়েছে। স্থূল হাস্যরসের সৃষ্টিতে এ-নাটক অনেকটা সফল হয়েছে। "সধবার একাদশী" অবশ্য নাট্যচিত্রের উর্ধ্বস্তরে উঠতে পারে নি। বিচ্ছিন্ন চিত্রের মধ্যে সংহতিসূত্র আবিষ্কার করে নাটকীয় প্লট-নির্মাণে দীনবন্ধু এখানে ব্যর্থ হয়েছেন। এ-নাটকের প্রধানতম আকর্ষণ নিমে দত্তর চরিত্র।

চরিত্রটি আনুপূর্বিক সুগঠিত নয়। কাহিনীরসের পূর্ণতার অভাব এবং নাট্য-দ্বন্দ্বের দুর্বলতাই এর জন্য দায়ী। কিন্তু চরিত্রচিত্র হিসেবে নিমে দত্তকে অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষিত কিন্তু লক্ষ্যহীন জীবনের উচ্চহাস্য এবং অর্ধস্ফুট হাহাকার যেন এই ব্যক্তিটির মধ্যে রূপ লাভ করেছে। সমাজ-সংসার-ঐতিহ্য-পরিবেশ সব কিছুর প্রতি তাঁর বিদ্রূপ-বাণ উদ্যত। কিন্তু এর অনেকগুলি শর সে নিজের প্রতিও নিক্ষেপ করেছে, নিজের পতনের অসঙ্গতি তার নিজের ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গহাস্য সঞ্চিত করেছে। নানারূপ স্থূল রঙ্গকথায় ও বখামীর বিবরণে নাটকটি পূর্ণ হলেও নিমে দত্তর চরিত্র "সধবার একাদশী"কে ভাঁড়ামীর পর্যায় থেকে উন্নীত করেছে। "জামাই বারিক" ঘরজামাই প্রথা এবং বহুবিবাহজনিত লাঞ্ছনাকে ব্যঙ্গ করে রচিত। এ প্রহসনটি একান্তভাবেই কয়েকটি ব্যঙ্গচিত্রের শিথিল গ্রন্থন। কাহিনী-সূত্রটি অত্যন্ত ক্ষীণ। জীবন্ত চরিত্রের বালাই নেই, আছে কয়েকটি ব্যঙ্গাত্মক ক্যারিকেচার। স্থূল হাস্যরস সৃষ্টিতে অবশ্য তিনি এ-নাটকেও কতকটা সাফল্য দেখিয়েছেন।

নাট্যকার হিসেবে বিশিষ্টতা ও ইতিহাসে স্থান॥ আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে দীনবন্ধুর নাট্যপ্রতিভার প্রকৃত মূল্যকে কিছুটা বাড়িয়ে দেখা হয়েছে। তাঁর চেয়ে উৎকৃষ্টতর প্রহসন পূর্বেই মধুসূদন লিখেছেন। এবং এমন একটিও নাটক বা প্রহসন তিনি লেখেন নি যাতে সামগ্রীক সাফল্য এসেছে।

দ্বিতীয়ত, প্রহসন-রচনা তথা কৌতুকরস সৃষ্টিতে তাঁর স্বাভাবিক প্রবণতা থাকলে অন্তত সেক্ষেত্রে তার অধিকতর সিদ্ধি ঘটত। তাঁর হাস্যরস প্রায়ই স্থূলতাকে অতিক্রম করতে পারে নি। হাস্যরস সৃজনে তিনি অভিনবত্ব দেখিয়েছেন ব্যঙ্গের উতরোলের পশ্চাতবর্তী বেদনার ভিত্তি আবিষ্কারে। "তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক জীবন-সুখ বিফলীকৃত শিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন।" (—বঙ্কিমচন্দ্র) প্রহসনকারের ব্যঙ্গদৃষ্টির তুলনায় এ-বোধ গভীরতর। তোরাপ-চরিত্রে ব্যঙ্গের উপাদান নেই অথচ সে কৌতুকস্পর্শ বর্জিত নয়। আবার ক্ষেত্রমণির উপরে অত্যাচার, ক্ষেত্রমণির মৃত্যু, রেবতীর ক্রন্দন, রোগ-উডের অত্যাচারমুখী চরিত্রের সাধারণ লক্ষণের মধ্যেও সংকীর্ণ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, রায়তদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য দীনবন্ধুর যে-সাফল্যের ইঙ্গিত করে তার সঙ্গে হাস্যরসের প্রতি তাঁর বিশিষ্ট

প্রবণতার কোন সম্পর্ক নেই। দীনবন্ধু মাটির নিকটের মানুষ এবং উদ্দাম উন্মুক্ত জীবন, রক্ততরঙ্গিত স্থূল ও প্রবল মানসিকতার চিত্র আঁকতে চেয়েছেন। সেখানেই তাঁর মনের মুক্তি। বাংলা নাটকের শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই মনোভাব বহু পরবর্তী যুগপ্রবণতার পূর্বাভাস দেয়।

তৃতীয়ত, মধুসূদনের কাছে দীনবন্ধুর ঋণের পরিমাণ অনেক। 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'র প্রভাব "বিয়ে পাগলা বুড়ো"তে বেশ স্পষ্ট, 'একেই কি বলে সভ্যতা'র নিশ্চিত প্রভাব আছে "সধবার একাদশী"র পরিকল্পনায়। এমন কি তোরাপ প্রভৃতি একাধিক চরিত্র, মায় তাদের মুখের কথ্য ভাষা 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ'র আদর্শে অঙ্কিত।

মনোমোহন বসু (১৮৩১—১৯১২)

পরিচয়॥ মনোমোহন বসু ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যশিষ্য ছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের অপরাপর সাহিত্যশিষ্যের তুলনায় তাঁর প্রবণতা ছিল পিছনের দিকে। অবশ্য সাংবাদিক গুরুর কাছ থেকে তিনি যে-স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন তাঁর কর্মজীবন ও ভাবজীবনে তার গুরুতর প্রভাব পড়েছে। এদিকে তিনি সমকালের তুলনায় পশ্চাৎমুখী নন, বরং প্রগতিশীল। হিন্দুমেলার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি স্বাদেশিকতাকে নিজ জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, দেশবাসীর মধ্যে এর বহুল প্রচার কামনা করেছিলেন। কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যে তাঁর ভূমিকাকে যথেষ্ট প্রগতিশীল বলা চলে না। আমাদের নাটকের ইতিহাসে পিছন ফেরার সুর প্রথম বাজালেন মনোমোহন বসু, রাজকৃষ্ণ রায়ের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রে তা-ই মহাসঙ্গীতে পরিণত হয়েছে।

অতীত সুরের চর্চা॥ মনোমোহন বসুর সাহিত্যিক খ্যাতি দ্বিমুখী। কবি-আখড়াই জাতীয় সঙ্গীতরচনায় তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কবি-যাত্রার পরিবেশেই তাঁর শিল্পী-মন পুষ্ট হয়েছিল। যে যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্ক ত্যাগ করে বাংলা নাটকের সূচনা হয়েছিল তারই অনুপ্রবেশ ঘটল মনোমোহন বসুর মাধ্যমে। অথচ প্রথম পর্বের অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ চেষ্টার পরে মধুসূদনের নাটকে ইংরেজী নাট্যাদর্শ অনেকটা জয়যুক্ত হয়েছিল। দীনবন্ধুর নাটক-প্রহসনেও নব্য আদর্শেরই অনুসরণ চলেছে। মনোমোহনের নাট্যকার রূপে আবির্ভাবের পূর্বে য়ুরোপীয় ধরনের রঙ্গমঞ্চের ব্যাপক প্রচলন সখের থিয়েটারের মাধ্যমে আমাদের দেশে ঘটেছে। মনোমোহন সেখানে যাত্রার আসরের আদর্শ ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। যাত্রাভিনয়ের অস্বাভাবিকতা দোষ সংশোধন

করে নাটকের নব্য চেহারা গঠনের প্রস্তাব করলেন মনোমোহন। সঙ্গীত বাহুল্যকে সমর্থন করলেন ; বললেন "ভারতবর্ষ যে ইউরোপ নয়, ইউরোপীয় সমাজ আর স্বদেশীয় সমাজ যে বিস্তর বিভিন্ন, ইউরোপীয় রুচি ও দেশীয় রুচি যে সম্যক স্বতন্ত্র পদার্থ, তাহা তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না।" মনোমোহন যাত্রার ঢঙে নাটকে প্রচুর গান সংযুক্ত করলেন। তরল ভক্তিরসকে করে তুললেন প্রধান আবেদন। এই বিপরীত পথে গমন বাংলা নাটকের সম্ভাব্য বিকাশকে ব্যাহত করেছে। জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের দোহাই তুলে অতি দুর্বল এবং অবক্ষয়কালীন সাহিত্য-রূপকে আশ্রয় করার প্রবৃত্তি নাট্য-সাহিত্যের ভবিষ্যতকে পুষ্টি থেকে ভ্রষ্ট করেছে।

নাট্যগ্রন্থাবলী॥ "প্রণয় পরীক্ষা" (১৮৬৯) নামক সামাজিক এবং "নাগাশ্রমের অভিনয়" নামক প্রহসন রচনা করলেও তারা আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। মনোমোহনের প্রধান আকর্ষণ পৌরাণিক বিষয়ের প্রতি। তাঁর প্রথম নাটক "রামাভিষেক"(১৮৬৭) এবং "সতী" (১৮৭৩) থেকেই ভক্তিরসের প্রাচুর্য পৌরাণিক নাটকের পূর্বতন রূপটিকে বদলে দিল। "হরিশচন্দ্র" নাটকে ভক্তিরসের সঙ্গে হিন্দুমেলায় লালিত স্বাদেশিকতার সুরটিও বেজেছে। "পার্থ-পরাজয়" নাটকে বভ্রুবাহনের সঙ্গে যুদ্ধে অর্জুনের পরাজয়কাহিনী বিবৃত হয়েছে। "রাসলীলা" ও "আনন্দময়" নামক অপর দুটি পুরাণাশ্রিত নাটকও তিনি লিখেছিলেন।

রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯—৯৪)

পরিচয়॥ সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায়ের পরিচয় দিতে গিয়ে জীবনীকার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্ষেপে তাৎপর্যপূর্ণ কথাই বলেছেন,—"বঙ্গবীণাপাণির ঐকান্তিক সেবা করিয়া যে-সকল সাহিত্যসাধক বাংলাদেশে গ্রাসাচ্ছাদনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ কবি এবং সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায় তাঁহাদের অগ্রণী। সে সময়ে লোকে যাহা কল্পনা করিতে পারিত না, তাহাই করিতে গিয়া তাঁহাকে ঘোরতর দুর্দশায় পড়িতে হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত তিনি জয়ী হইতে পারেন নাই। সাহত্য হইতে নাটক, নাটক হইতে রঙ্গমঞ্চ এবং রঙ্গমঞ্চ হইতে মুদ্রাযন্ত্র ও পুস্তকপ্রকাশ—এগুলি তাঁহার জীবনের সুখকর পরিবর্তন নহে।......তাঁহাকে অতি দ্রুত রচনা করিতে হইয়াছে, অসংখ্য পুস্তক তিনি লিখিয়াছেন।......এই কারণেই তাঁহার অল্প লেখাই সার্থক ও সুন্দর হইতে পারিয়াছে।"

নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশখানা ছোট বড় নাটক ও প্রহসন রাজকৃষ্ণ রায় রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নাটক আছে, আছে গীতিনাট্য এবং প্রহসন জাতীয় রচনা। তাঁর প্রথম নাটক "পতিব্রতা" নামক নাট্যগীতি প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালে এবং শেষ নাটক "বেনজীর বদরেমুনীর" ১৮৯৩ সালে। তখন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের যুগ চলছে। তিনি নিজেও কিছুকাল একটি রঙ্গমঞ্চ-পরিচালনা করেন। তাঁর বহু নাটকই সমকালীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মিটিয়েছে। পৌরাণিক নাটকের মধ্যে "অনলে বিজলী", "হরধনুভঙ্গ", "যদুবংশ ধ্বংস", "তরণীসেন বধ", "চন্দ্রহাস", "নরমেধ যজ্ঞ" প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ-জাতীয় নাটকেই তিনি স্বচ্ছন্দ। মূল রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে রাজকৃষ্ণ রায়ের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তিনি সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের কাব্যানুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। পৌরাণিক নাটকগুলিতে তিনি কাশীরামদাস-কৃত্তিবাসের অনুসরণ না করে সংস্কৃত মহাকাব্যের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত মহাকাব্যোচিত উদ্দাম-গম্ভীর রসের চর্চা করা তাঁর সাধ্যায়ত্ত ছিল না। তিনি কাহিনীমাত্র সেখান থেকে গ্রহণ করেছেন। অতঃপর মনোমোহন বসু প্রদর্শিত পথ ধরে তরল ভক্তিরস প্রচারে মেতে উঠেছেন। তাঁর পৌরাণিক নাটকে যাত্রার প্রভাবও বেশ গভীর। সঙ্গীত বাহুল্য তাঁর নাট্যাবলীর অন্যতম লক্ষণ।

ঐতিহাসিক নাটক রূপে তিনি "রাজা বিক্রমাদিত্য", "মীরাবাঈ", "বনবীর" প্রভৃতিকে পরিচিত করতে চেয়েছেন। প্রথমটি নেহাৎই কিম্বদন্তীমূলক, দ্বিতীয়টি ভক্তিমূলক ও সঙ্গীতপ্রধান। তৃতীয়টি কতকটা ইতিহাসানুস্মৃতি আছে। তাঁর প্রহসন বা গীতিনাট্যগুলির মধ্যে কোন বিশিষ্টতা নেই।

নাটকে তিনি ছন্দ-সংলাপ কোথাও কোথাও ব্যবহার করে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দ, ভাঙা অমিত্রাক্ষর (বা তথা-কথিত গৈরিশছন্দ) এবং পদ্যপংক্তিকগদ্য (বা ক্ষীণভাবে গদ্য কবিতার প্রাক্-রূপ) ব্যবহারে তিনি সাহসিকতা ও বিচিত্রতা-প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন।

ইতিহাসের বিচার ॥ নাট্যকার হিসেবে তিনি যাত্রাধর্মী পুরাতন পন্থার প্রবক্তা। ইংরেজী প্রভাবের ধারাকে রুদ্ধ করে মধ্যযুগীয় ভক্তিরস ও যাত্রা-প্রাণতা প্রবর্তনে মনোমোহন বসুর পূর্ব সাধনাকে তিনি উত্তরপুরুষ গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ঐতিহাসিক নিয়তি তাকে পরিহার্য পুরাতনের সঙ্গে অসম সন্ধি করতে বাধ্য করেছে। রাজকৃষ্ণ সেই সূত্রের অন্যতম মুখ্য গ্রন্থি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪৯-১৯২৫)

পরিচয় ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টার মানুষ ছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে তিনি নবজাগ্রত স্বাদেশিকতার একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। স্বদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার সাধনায়,হিন্দুমেলার সংগঠনে এবং আদি-ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতারূপে তিনি সমকালীন তরুণদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যেও য়ুরোপীয় পদ্ধতির একজন প্রধান শিল্পীরূপে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল ঘনিষ্ঠ। নাটক, গল্প, কবিতা এবং সাহিত্যতত্ত্বের কিছু উৎকৃষ্ট গ্রন্থ ফরাসী থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ফরাসী প্রভাবকে আমাদের সাহিত্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সংস্কৃত এবং মারাঠী ভাষার সম্পদেও বাংলাকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। কোন বিশিষ্ট ধারা সৃষ্টি করতে না পারলেও এই প্রচেষ্টার মূল্য আছে।

নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের প্রধান গ্রন্থগুলি প্রায় সবই বাংলায় ভাষান্তরিত করেছিলেন। তাছাড়া, অন্যান্য অনুবাদ নাটকের মধ্যে সেক্‌সপীয়রের "জুলিয়াস সিজার" এবং ফরাসীদেশের বিখ্যাত নাট্যকার মলিয়েরের রচিত কৌতুক নাটকের বঙ্গানুবাদ "হঠাৎ নবাব" এবং "দায়ে পড়ে দারগ্রহ" উল্লেখযোগ্য। "পুনর্বসন্ত", "বসন্ত-লীলা", "ধ্যান-ভঙ্গ" প্রভৃতি যে-সব গীতিনাটিকা তিনি লিখেছিলেন তার মূল্য বেশী নয়। তবে তাঁর প্রথম প্রহসন "কিঞ্চিৎ জলযোগ" (১৮৭২) এবং "এমন কর্ম আর করব না "(বা অলীকবাবু), "হিতে বিপরীত" প্রভৃতি কৌতুকরসাশ্রিত নাটিকাগুলি একদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে নাট্যকার যে সুরুচিসম্মত স্মিতহাস্যের সৃষ্টি করেছেন তাতে ব্যঙ্গের জ্বালা বা আঘাতের তীব্রতা নেই, কিন্তু উপভোগ্যতা আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সবচেয়ে ভাল রচনা ইতিহাসাশ্রিত নাটকগুলি। মধুসূদনের কৃষ্ণকুমারী নাটকের পরে প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক নাট্যধারা আর বিকাশলাভ করে নি। দীনবন্ধু প্রকৃত ঐতিহাসিক নাটক লিখতে না চাইলেও "নীলদর্পণ" তথ্যগত দিক থেকে না হলেও রসের দিক থেকে ঐতিহাসিক নাটকের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। রাজকৃষ্ণ রায় দু'একখানা নাটককে ঐতিহাসিক বলে চিহ্নিত করলেও সেগুলি ঐ নামের যোগ্য নয়। কোথাও

কিম্বদন্তীমূলক কাহিনী, কোথাও ভক্তিরসাশ্রিত বিষয়বস্তু (যেমন "বিক্রমাদিত্য" ও "মীরাবাঈ" নাটকে) ঐতিহাসিক আখ্যাপত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। সেদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভূমিকার মূল্য আছে। মধুসূদনে যে-ধারার সূত্রপাত মাত্র লক্ষ্য করেছি তারই বিকাশ ঘটল জ্যোতিরিন্দ্রনাথে। তাঁর চারটি ঐতিহাসিক নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল,—১। ইংরেজী নাট্যসম্মত আঙ্গিক, ২। দেশাত্মবোধ, ৩। রোমান্টিক প্রণয়কাহিনী—এই তিনের সংযোগ। তিনি "পুরুবিক্রম" (১৮৭৪) রচনা করলেন সেকেন্দার এবং পুরুর যুদ্ধ-কাহিনীকে অবলম্বন করে। অবশ্য একটি রোমান্টিক প্রেমকাহিনী এ নাটকের ঘটনাকে গ্রন্থিবহুল এবং আবেগমথিত করে তুলেছে। "সরোজিনী" (১৮৭৫) আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের পটভূমিতে রচিত। মেবারবাসীর বীরত্ব-পূর্ণ সংগ্রাম, কিন্তু প্রধান মেবারী সেনাপতিদের প্রণয়কলহে দুর্বল হয়ে পড়ায় তাদের পরাজয়, মেবার রাজকন্যা সরোজিনীর অগ্নিতে আত্ম-বিসর্জন এ নাটকে বিবৃত হয়েছে। "অশ্রুমতী"তে (১৮৭৯) প্রতাপ সিংহের কন্যা অশ্রুমতী, শত্রু মানসিংহ, ভ্রাতা শক্তিসিংহ, মোগলসম্রাট সেলিম প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র-দ্বন্দ্ব, দেশপ্রেম এবং প্রণয়-সংঘাত বেশ তীব্র, ঘনপিনদ্ধ ও জটিল আকারে দেখা দিয়েছে। "স্বপ্নময়ী" নাটকে বাংলাদেশের শোভাসিংহের ঐতিহাসিক বিদ্রোহের কাহিনী থাকলেও কাল্পনিক প্রণয়কথাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনেক নাটক-প্রহসনই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল।

ইতিহাসে বিশিষ্ট ভূমিকা ॥ মধুসূদন সচেতনভাবে এবং কিছুটা সাফল্যের সঙ্গে তাঁর নাটক-প্রহসনে ইংরেজী ধারার অনুসরণ করেছিলেন। দীনবন্ধুতে সেই ধারা অনেকটা বহমান ছিল। বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য ধারার ন্যায় এই পথেই বাংলা নাটকেরও মুক্তি আসত। কিন্তু মনোমোহন বসু-রাজকৃষ্ণ রায়-গিরিশচন্দ্রের চেষ্টায় বাংলা নাটক মুক্তির প্রকৃত পথ থেকে ভ্রষ্ট হল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইংরেজী নাট্যকলার অনেকটা সফল অনুসরণের মধ্য দিয়ে যাত্রাওয়ালাদের বিপরীত কোটির আদর্শকেই বড় করে তুলেছিলেন। তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী এবং জনচিত্তে অনেক বেশী প্রভাববিস্তারকারী গিরিশচন্দ্রের সাধনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধারা দ্রুত আবৃত হয়ে গেল।

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)

পরিচয় ॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা দেশে যে নাট্য-আন্দোলন দেখা দিয়েছিল নানা কারণে গিরিশচন্দ্রকে তার শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়ে

থাকে। পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অজস্র নাটকের পরিচালক, রঙ্গমঞ্চের অধ্যক্ষ, নটনটীদের অভিনয়-শিক্ষক এবং প্রধান ভূমিকাভিনেতা হিসেবে তিনি সমকালে বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। সেই জনপ্রিয়তার ঢেউ একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। বাংলা নাট্য-আন্দোলনের প্রধান পুরুষ হিসেবে তাঁর এ-ভূমিকা অস্বীকৃত হবার নয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নাটক-রচনার প্রতিভা। গিরিশ-চন্দ্রের নাটকের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য বিচার করতে গিয়ে নাট্যান্দোলনের অপরাপর বিভাগে তাঁর বিশিষ্ট অবদানের কথা ভুলে যাওয়া সহজ নয়। কিন্তু এ-বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পন্থার আশ্রয় নেওয়াই কর্তব্য। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ও অভিনয়কলার বিকাশে গিরিশচন্দ্রের গৌরবময় ভূমিকার কথা মেনে নিয়েও বলব তাঁর নাটকের মূল্য নির্ণয়ে অন্য সব কিছু নিরপেক্ষভাবেই অগ্রসর হতে হবে।

গিরিশচন্দ্র রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই বাংলা উপন্যাস ও আখ্যান-কাব্যের নাট্যরূপ দিতে শুরু করলেন। সেই সব নাট্যরূপও পুরানো হয়ে যাওয়ায় তাঁকে স্বয়ং নাট্যরচনায় হাত দিতে হল। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রঙ্গ-মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর নাটক রচনার প্রেরণাও এসেছিল মঞ্চগামী জন-সাধারণের মনোরঞ্জন করবার জন্য। জনমনোরঞ্জনবাসনা কদাচিৎ উচ্চ শিল্পকর্মের জন্ম দিতে পারে। ইতিহাসে সমকালীন জনপ্রিয়তা ও শিল্পোৎ-কর্ষের সমন্বয় খুব অল্পই ঘটেছে। গিরিশচন্দ্রকে জনমনোরঞ্জনের পিছনে ছুটতে হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক এবং নানা জাতের ক্ষুদ্র নাটক মিলিয়ে প্রায় একশত খানা বই তিনি লিখেছিলেন। নিত্য নূতন নাটকের যোগান দিয়ে রঙ্গমঞ্চের জঠর তাঁকে পূর্ণ করতে হয়েছে। এই পরিবেশের কথা মনে রেখে গিরিশচন্দ্রের নাটকের বিচার করা কর্তব্য।

সাহিত্যিক উৎকর্ষের বিচারে গিরিশচন্দ্রকে সচরাচর যতটা প্রশংসা করা হয়ে থাকে তার অল্পাংশও করা চলে না। কিন্তু বাংলা মঞ্চানুগ নাটকের ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার উদ্ভব ঘটে নি। এবং বাঙালী নাট্যকারদের মধ্যে তিনি কিছুটা বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই দাবি করতে পারেন।

গিরিশচন্দ্রের মন ও ইতিহাসের বিচার ॥ বাংলা নাট্যসাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের দান বিচারের অপেক্ষা রাখে। বাংলা রঙ্গমঞ্চের ছোট বড় বহু নাট্যকারের উপর তিনি গুরুতর প্রভাব বিস্তার করে-ছিলেন। দর্শকদের রুচি নিয়ন্ত্রণেও তাঁর ভূমিকা একান্তভাবে অবহেলার নয়।

কিন্তু মধুসূদনের পূর্ব থেকে ইংরেজী নাট্যধারার অনুসরণে বাংলা নাটক গড়ে তুলবার যে আশা প্রকাশ পেয়েছে এবং মধুসূদনের হাতে যা নিশ্চিন্ত প্রতিষ্ঠা পেয়েছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে ধারাকে সাধ্যমত এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন, গিরিশ-চন্দ্র তার সঙ্গে আপন মানসসামীপ্য অনুভব করেন নি। যে যাত্রার ধারা বাংলা নাটকের জন্মকাল থেকেই পরিত্যাজ্য বলে ঘোষিত হয়েছিল সেই ধারাই মনোমোহন বসু-রাজকৃষ্ণ রায়ের চেষ্টায় নাট্যক্ষেত্রে স্থানলাভ করল। গিরিশ-চন্দ্র জাতীয় ঐতিহ্যের নামে এই ধারাটিকে আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু তিনি জনসাধারণের চাহিদা বুঝতেন। য়ুরোপীয় নাটকের বহিরঙ্গে প্রবৃত্তির যে সংঘর্ষ, ঘটনা-সংঘাতের যে তীব্রতা নাট্যচমৎকারিত্বের সৃষ্টি করে তা সহজেই জন-মনকে আকর্ষণ করতে পারে এ তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। যাত্রারীতির সঙ্গীতবাহুল্য এবং জীবনসংঘাতের স্থানে তরল রসের সাধনা আর অপরদিকে ইংরেজী নাটকের বহিরঙ্গের ঘটনাসংঘাত—এদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সমন্বয় সৃষ্টি করার সুযোগ কম। কিন্তু গিরিশচন্দ্র তাই করার চেষ্টা করেছেন। ইংরেজী নাটকের প্রাণকেন্দ্রে জীবন ও ভাগ্যের যে চিত্র প্রকাশিত তাকে আয়ত্ত করতে তিনি চান নি। দ্বিতীয়ত, গিরিশচন্দ্র সর্বদা ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্যমানবচেতনাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। মধ্যযুগের ভক্তিবাদে তাঁর চিত্ত পূর্ণ ছিল। এই কারণেই সমাজসংস্কার আন্দোলনগুলির প্রতি তাঁর বিরূপতার শেষ ছিল না। তৃতীয়ত, গিরিশচন্দ্রকে হিন্দু রিভাইভ্যালিষ্টরূপে অভিহিত করা হয়। এই আখ্যা খুব অসঙ্গতও নয়; কিন্তু বঙ্কিম-বিবেকানন্দ যেখানে প্রাচীন হিন্দু-আদর্শকে নব্যমানববাদী ধ্যান-ধারণার সঙ্গে সমন্বিত করতে চেয়েছিলেন, যুক্তিবাদকে আশ্রয় করে ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানমার্গের মিলন সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, গিরিশচন্দ্র সেখানে অলৌকিকতা, অন্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাস প্রভৃতিকেই প্রধান করে তুলেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য হওয়া সত্ত্বেও বিবেকানন্দের উদারতা তাঁর ছিল না, ছিল না তাঁর প্রজ্ঞাদৃষ্টি।

তবে একথা ঠিক ঐতিহাসিক নাটকে গিরিশচন্দ্র অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ ভাবে হলেও কালোপযোগী স্বাদেশিকতার মন্ত্র প্রচার করেছেন। সামাজিক নাটকের ক্ষেত্রেও সমকালীন সমাজচিত্র অঙ্কনে তিনি পূর্ববর্তী উন্নত প্রহসনের ঐতিহ্যকে নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে তাঁর ত্রুটি-বিচ্যুতি নাটকীয় উৎকর্ষের দিক থেকে হানিকর হলেও বাংলা নাটকের ইতিহাসে সাধারণভাবে কোন অতীতমুখী ধারা সৃষ্টি করে নি।

নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ গিরিশচন্দ্র স্বাধীনভাবে প্রথম লিখলেন কয়েকটি

গীতিনাট্য ; "আগমনী" (১৮৭৭), "অকালবোধন", "দোললীলা", "মোহিনী প্রতিমা" প্রভৃতি। এই নাটকগুলি একেবারেই বৈশিষ্ট্যহীন।

গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক নাটকের জন্যই সবচেয়ে বেশী খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর প্রতিভার মূল বৈশিষ্ট্যগুলি এই ধরনের নাটকে সর্বাধিক প্রকাশ পেয়েছে। এই নাটকগুলি সংখ্যায়ও সবচেয়ে বেশী এবং সমকালে ও পরবর্তী নাট্যধারায় তথা জনমানসে প্রভাব বিস্তারের দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। "রাবণ বধ", "সীতার বনবাস", "অভিমন্যু বধ", "সীতার বিবাহ", "ব্রজবিহার", "রামের বনবাস", "সীতাহরণ", "পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস", "দক্ষযজ্ঞ", "ধ্রুব-চরিত্র", "নল-দময়ন্তী", "কমলে কামিনী", "বৃষকেতু", "শ্রীবৎস-চিন্তা", "প্রহ্লাদ-চরিত্র", "প্রভাসযজ্ঞ", "মহাপূজা", "জনা", "পাণ্ডবগৌরব", "মণিহরণ", "নন্দদুলাল", "হরগৌরী" প্রভৃতি পুরাণাশ্রিত নাটক ছাড়া ঐতিহাসিক ও আধা-ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের নিয়ে লেখা ধর্মমূলক নাটকগুলিকেও এই শ্রেণী-ভুক্ত করাই সঙ্গত। "চৈতন্যলীলা", "নিমাই সন্ন্যাস", "বিল্বমঙ্গল", "পূর্ণচন্দ্র", "নসীরাম", "কালাপাহাড়", "শঙ্করাচার্য" প্রভৃতি নাটককে নিঃসংশয়ে এই শ্রেণীভুক্ত করা চলে। এই নাটকগুলির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হল— এক। ধর্মবোধ ও নীতিবাদের প্রচার। "চৈতন্যলীলা" থেকে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শও তাঁর নাটকে প্রতিফলিত হতে থাকে। তরল ভক্তিরস এবং মধ্য-যুগীয় দেববাদে সুগভীর বিশ্বাস এই নাটকগুলিতে ধরা পড়েছে। দুই। অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাচুর্য নাটকগুলিকে ঘটনাগত চমৎকারিত্ব দান করেছে। তিন। যাত্রাধর্মী সংগীতপ্রাচুর্য এবং চরিত্রবিচ্যুত রসসৃজন চলেছে। তার সঙ্গে য়ুরোপীয় নাটকের আদর্শে ঘটনাসংঘাতকে যুক্ত করার চেষ্টা করেছেন নাট্যকার। চার। বিবেক, দয়া, স্নেহ, মোহ প্রভৃতিকে ব্যক্তিরূপ দিয়ে উপস্থিত করেছেন গিরিশচন্দ্র। পাঁচ। সংস্কৃত নাটকের বিদূষক গিরিশচন্দ্রের হাতে একেবারে নবরূপে দেখা দিয়েছে। সরল কথার লঘু কৌতুকের মধ্য দিয়ে তিনি গভীর ধর্মের তত্ত্বোপদেশ দিয়েছেন। যুগপৎ হাস্যরস ও ভক্তিরস সৃষ্টিতে এই চরিত্রগুলি এক ধরনের সার্থকতা পেয়েছে। এদের কল্পনার পিছনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক নাটকগুলির মধ্যে "পাণ্ডবগৌরব" এবং "জনা"ই প্রধান। ভক্তসাধকদের জীবনী বিষয়ক নাটকের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় "বিল্বমঙ্গল" এবং "বুদ্ধদেবচরিতে"র। পাণ্ডবগৌরবের বিষয়ের মধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে।... আশিশু পালনের কর্তব্যে পাণ্ডবেরা ভগবান কৃষ্ণের ভক্ত

হয়েও তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। কাহিনী-কল্পনায় নাট্যদ্বন্দ্বের সুযোগ ছিল ; ভীমচরিত্রে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বের সম্ভাবনাও। কিন্তু ভক্তিভাবনার আধিক্যে শেষরক্ষা হয় নি। বুদ্ধদেবচরিত সম্পূর্ণ দেবকাহিনীতে পরিণত হয়েছে। জনা-চরিত্রে মধুসূদনের প্রভাব আছে। কিন্তু অতিনাটকীয়তা এবং অর্থহীন উচ্ছ্বাস-আধিক্য তার স্বাভাবিক মানবত্ব বিনষ্ট করেছে। ট্রাজেডি-রচনার সম্ভাবনা ভক্তিচেতনার দ্বারা লুপ্ত হয়েছে। বিল্বমঙ্গল বিশেষ কোন প্রত্যাশা নিয়ে আসে না। প্রবৃত্তি থেকে নিবৃত্তিতে উত্তরণের সহজ ভক্তিরসাত্মক কাহিনী হিসেবে এটি মোটামুটি উপভোগ্য।

ঐতিহাসিক নাটকরূপে "সিরাজদ্দৌলা", মীরকাশিম", "ছত্রপতি শিবাজী" ও "অশোকে"র নাম করা উচিত। অশোকে অবশ্য ধর্মভাবের ও অলৌকিকতার আধিক্য আছে। অপরগুলিতে ইতিহাসের সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা অনুসৃতি ঘটেছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসেবে এই নাটকগুলিতে স্বাদেশিক-চেতনার প্রকাশ আছে। সিরাজদ্দৌলা-চরিত্রে কর্মপ্রবণতা ও ভাবনাধিক্যের (Action and Contemplation) মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সামান্য চেষ্টা আছে। করিমচাচার চরিত্রে কালগত অনৌচিত্য দোষ আছে, অন্যথায় এটি কিছু সফল হতে পারত। শেষ পর্যন্ত সুলভ করুণ রসে নাটকের ট্রাজিক সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে।

গিরিশচন্দ্র অবশ্য সবচেয়ে বেশী ব্যর্থতা দেখিয়েছেন প্রহসনরচনায়। "সভ্যতার পাণ্ডা","বেল্লিক বাজার", "পাঁচ কনে" প্রভৃতি রচনা রুচিহীন এবং রসহীন। আসলে গম্ভীর সুরের চর্চায়-ই নাট্যকারের প্রবণতা। আদর্শবাদ, ভক্তিরস, নীতিকথার রাজ্যে তাঁর সহজ বিহার।

গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলিতে সমকালীন কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের ছবি ধরা পড়েছে। "প্রফুল্ল" (১৮৮৯), "হারানিধি", "বলিদান", "শাস্তি কি শান্তি" প্রভৃতি নাটকগুলিকে সমাজচিত্র রূপে গ্রহণ করা চলে ; তবে বিশিষ্ট কোন সামাজিক সমস্যা এর মধ্যে প্রতিফলিত নয়। রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশচেষ্টা এ ধরনের নাটকে লক্ষণীয়। খুন-জখম, মাতলামী, মামলা-মোকদ্দমা, জাল-জুয়াচুরির দ্বারা ঘটনাসংঘাত রচনার চেষ্টা আছে। এই নাটকগুলিতে গিরিশচন্দ্র নানাবিধ নীতি-উপদেশ দান করতে চেয়েছেন। চরিত্রকল্পনায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য অপেক্ষা 'ভাল কিম্বা মন্দ' এইরূপ সহজ শ্রেণীগত পরিচয়কেই গুরুত্ব দিয়েছেন। ট্রাজেডি-রচনার চেষ্টা তাই পরিণত হয়েছে মেলোড্রামায়। এই সব নাটকের মধ্যে "প্রফুল্ল"ই শ্রেষ্ঠ। অপরগুলিতে

কোন না কোন দিক থেকে প্রফুল্লরই অনুসরণের চেষ্টা আছে। প্রফুল্ল অবশ্য ট্রাজেডি হিসেবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। নায়ক যোগেশের চরিত্র-কল্পনার ব্যর্থতা এবং সমগ্র নাটকীয় পরিকল্পনাই এর জন্য দায়ী। একদল যন্ত্রের ন্যায় অত্যাচার করেছে, অপরদল অত্যাচারিত হয়েছে—এরূপ ঘটনা-বিবরণ ট্রাজেডিসৃষ্টিতে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবে সমকালীন নীচুতলার কলকাতার মানুষ খুবই প্রাণবন্ত হয়ে ফুটেছে এই নাটকে। জগমণি-কাঙালীচরণের মত মূর্তিমান শয়তান, ভজহরির মত বিবেকবান জুয়াচোর, মদনের মত বাউণ্ডুলে পাগল তাদের মুখের ভাষাসহ এই নাটকে রূপ পেয়েছে। এই জাতীয় চরিত্রাঙ্কনে গিরিশচন্দ্রের অনস্বীকার্য পারদর্শিতা ছিল। এইদিকে অধিক চর্চা করলে তিনি নাট্যকার হিসেবে আরও বেশী সাফল্য লাভ করতে পারতেন।

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩—১৯২৯)

পরিচয়॥ অমৃতলাল বসু অভিনেতা এবং নাট্যপরিচালক হিসেবে দীর্ঘকাল পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শেও তিনি বহুকাল কাটিয়েছেন। নাট্যকার রূপেও তিনি বিশিষ্টতার দাবি করতে পারেন। নিজের প্রবণতা সম্বন্ধে আরও সচেতন হলে তিনি বিভিন্ন ধরনের নাট্যরচনায় আপনাকে নিয়োজিত করতেন না। তাঁর নাটকীয় প্রতিভা ছিল প্রহসনকারের। রঙ্গ-ব্যঙ্গ-কৌতুকসৃষ্টিতেই তাঁর শিল্পী-মন সবচেয়ে বেশী সাড়া দিত, কারণ তাঁর শিল্পী-দৃষ্টি জীবনের বাঁ দিকের উপরেই লক্ষ্য স্থির রেখেছিল। গুরুর প্রভাবও তাঁর উপরে বড় বর্তায় নি। কারণ গিরিশচন্দ্র মুখ্যত গম্ভীর,গভীর ও ভাবাকুল দৃষ্টিতে জীবনকে বুঝতে চেয়েছেন। তাঁর প্রহসনজাতীয় রচনা ছিল একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। তাই সেই ঐতিহ্য নিয়ে অমৃতলাল যাত্রা শুরু করেন নি।

নাট্যগ্রন্থাবলী॥ অমৃতলাল প্রহসন ছাড়া গম্ভীর ভাব ও গভীর জীবনরসকে যেখানেই নাট্যভাত করতে গিয়েছেন সেখানেই নিষ্করুণ ব্যর্থতা তাঁকে বহন করতে হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ "হীরকচূর্ণ", "তরুবালা", "হরিশ্চন্দ্র", "বিমাতা বা বিজয়বসন্ত" প্রভৃতি নাটকের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। এদের চরিত্রচিত্রণে যেমন প্রাণরসের অভাব তেমনি কৃত্রিমতায় পূর্ণ এদের সংলাপ। যে দু'খানা গীতিনাট্য তিনি লিখেছিলেন তারা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।

তিনি "খাসদখল", "নবযৌবন" নামে দু'খানা পূর্ণাঙ্গ কমেডী লিখেছিলেন।

কিন্তু এখানেও প্রহসন-লক্ষণের বাড়াবাড়ি চোখে পড়বে। কোন গভীর জীবন-সমস্যা কিংবা রোমান্টিক মাধুর্য এদের মধ্যে দেখা যায় না। গভীরতা, গাম্ভীর্য এবং মাধুর্যের রাজ্যে অমৃতলাল কখনই প্রবেশ করতে চান নি, ঘটনাচক্রে কখনো প্রবেশ করতে হলেও তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন নি।

আসলে জীবনের লঘু অসঙ্গতির প্রতিই তিনি বক্র কটাক্ষপাত করেছেন। বিশেষ করে সমাজ-পরিবর্তনের পটভূমিতে নূতন ও পুরাতনের দ্বন্দ্বে যে তরঙ্গ উঠেছিল তার মধ্যকার আতিশয্যদুষ্ট, বিপর্যস্ত, সহজ বুদ্ধি ও যুক্তিতে পরিহার্য অংশের উপরেই বিদ্রূপের আঘাতে তিনি হাস্যের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাঁর রচিত চরিত্রগুলি তাই শ্রেণীবিশেষের ক্যারিকেচারে পরিণত হয়েছে। ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন তাঁর প্রহসনের পাত্রপাত্রীদের ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্যকে আবৃত করেছে, শ্রেণীবিশেষের প্রতি বিদ্বিষ্ট মনোভাব তাদের স্বাভাবিকতাকে বিনষ্ট করেছে। সিচুয়েসন সৃষ্টির বিশিষ্টতায় তাঁর নাটকে হাস্যরস উদ্বেল হয় নি, বাচন-ভঙ্গিতে pun, wit ইত্যাদির ব্যবহার থাকলেও তা-ই প্রধান হয়ে ওঠে নি। হাস্যের অন্তরালবর্তী বেদনা আবিষ্কারে দীনবন্ধুর মত অন্তর্দৃষ্টি তাঁর ছিল না। রঙ্গাত্মক নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টি এবং ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন সত্ত্বেও ব্যক্তিচরিত্রে পূর্ণতা দানে মধুসূদনসুলভ সামর্থ্য তাঁর ছিল না। মধুসূদনের অতিরঞ্জন বাস্তবের এত নিকটবর্তী যে তাদের মাঝখানের সীমারেখাটি স্পষ্ট করে টানা সম্ভব নয়। অমৃতলালের অতিরঞ্জন বাস্তবতা-স্বাভাবিকতাকে সমূলে অস্বীকার করেছে। কোথাও কোথাও এই অতিরঞ্জন উদ্ভটের স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে। অমৃতলালের অতিরঞ্জন এবং উদ্ভটত্ব উভয়ের মূলেই তীক্ষ্ণ সমাজ-ব্যঙ্গ সক্রিয়। স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার এবং তার ফলে নারীর স্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনা, বিধবাবিবাহ, ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা ও হিন্দুধর্মের সংস্কার, জাতিভেদ প্রথার বিলোপ প্রভৃতি সামাজিক অগ্রগতিমূলক প্রতিটি কর্ম অমৃতলালের "বাবু", "বৌমা", "বিবাহ বিভ্রাট", "তাজ্জব ব্যাপার", "একাকার" প্রভৃতি প্রহসনে ব্যঙ্গাত্মক ধিক্কার লাভ করেছে। অমৃতলাল বসুর দৃষ্টিভঙ্গি প্রগতিবিরোধী ছিল, তবে রুচির বিকার বা অশ্লীলতা তাঁর প্রহসনে বড় দেখা যায় না। অবশ্য "চাটুয্যেবাঁড়ুয্যে" কিংবা "তিলতর্পণে"র সাফল্য অধিকতর। প্রথমটিতে ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং নাট্যমুহূর্ত সৃষ্টির কৌশল হাস্যরসের কারণ হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে সম-কালীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের উদ্ভট অতিরঞ্জন রঙ্গরস উদ্দাম করে তুলেছে।

প্রগতিবিরোধিতায় আচ্ছন্ন না হলে প্রহসনের ধারায় অমৃতলাল বসু কিছু উন্নততর দান রেখে যেতে পারতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩—১৯১৩)

পরিচয় ॥ য়ুরোপভ্রমণের অভিজ্ঞতা, য়ুরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় এবং স্বভাবজ কবিত্বের অধিকার নিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা দেশের নাট্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রঙ্গমঞ্চের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন তিনি ছিলেন না। গিরিশচন্দ্রের নায়কত্ব মেনে নিয়ে তিনি নাট্যসাহিত্যের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেন নি। তিনি য়ুরোপীয় নাটকের পথ অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। পুরাণের ভক্তিতরল রাজ্য থেকে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রভাব থেকে মুক্ত করে বাংলা নাটককে নূতন পথে চালিত করবার বাসনা সম্ভবত তাঁর ছিল। কিন্তু গীতিধর্মের অতিরিক্ত প্রভাব নাটকের ইতিহাসে তাঁর ভূমিকাকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশিত গুরুত্ব দান করে নি।

নাট্যগ্রন্থাবলী ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান রচনায় বিশেষ দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। এই গানের সূত্রেই পরে তিনি নাটকের জগতে প্রবেশ করলেন। তাঁর নিজের ভাষায় "প্রথমতঃ প্রহসনগুলির অভিনয় দেখিয়া সেগুলির স্বাভাবিকতায় ও সৌন্দর্যে মোহিত হইতাম বটে, কিন্তু সেগুলির অশ্লীলতা ও কুরুচি দেখিয়া ব্যথিত হই। ঐ সময়ে 'কল্কি অবতার' একখানি প্রহসন গদ্যেপদ্যে রচনা করিয়া ছাপাই। পরে আমার পূর্বরচিত কতকগুলি হাসির গান একত্রে গাঁথিয়া 'বিরহ' নাটক রচনা করি।…তৎপরে উক্তরূপে 'ত্র্যহস্পর্শ' রচনা করি এবং উহাও ষ্টারে অভিনীত হয়। পরে 'প্রায়শ্চিত্ত' রচনা করি এবং সেখানি ক্লাসিকে অভিনীত হয়।" প্রহসন রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল আদৌ সাফল্য অর্জন করেন নি। এদের মধ্যেকার হাসির গানগুলি অবশ্য খুবই উপভোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচলিত নাট্যধারাকে প্রবল আঘাত দিলেন পুরাণাশ্রিত নাটক রচনা করতে বসে। মনোমোহন বসুর পূর্ব পর্যন্ত পুরাণ-কাহিনী অবলম্বনে নাটকরচনা করতে গিয়ে নাট্যকারেরা পুরাণকে সোজাসুজি অনুসরণ করতে চেয়েছেন। রোমান্টিক কমেডি লেখাই ছিল মধুসূদনসহ তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য। মনোমোহন এবং পরে রাজকৃষ্ণ পৌরাণিক নাটকে তরল ভক্তিরস, যাত্রাসুলভ আঙ্গিক এবং গীতিবাহুল্য আমদানি করলেন। গিরিশচন্দ্রও ধর্মকথা প্রচারের বাহনরূপে পৌরাণিক নাটককে গ্রহণ করলেন। তবে যাত্রাসুলভ পদ্ধতির সঙ্গে ইংরেজী নাটকসুলভ ঘটনার ঘনঘটার সম্পর্ক বিধানে তিনি তৎপর হলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক নাটকে আধুনিক মনোভাব

নিয়ে আসতে চাইলেন। তাঁর "সীতা" এবং "পাষাণী" কাব্যনাট্য জাতীয় রচনা, "ভীষ্ম" অবশ্য পূর্ণাঙ্গ নাটক। এদের কোথাও যাত্রারীতির কিছুমাত্র অনুসরণ নেই, ভক্তিরসের স্পর্শ মাত্র নেই, অলৌকিক ঘটনার আধুনিক যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা আছে। সীতা নাটকে তিনি সীতার চরিত্রে আধুনিক রোমান্টিক প্রকৃতিপ্রীতি, রামচরিত্রে কর্তব্যনিষ্ঠা ও প্রেম-চেতনার দ্বন্দ্ব এবং বশিষ্ঠের ব্রাহ্মণ্যকুসংস্কার ও শূদ্রের অধিকারবোধের সংঘাতের চিত্র এঁকেছেন। পাষাণী নাটকে অহল্যার চরিত্রস্খলনে একালীন অবৈধ প্রণয়ের পশ্চাতের মনস্তত্ত্বের সন্ধান তিনি করেছেন। ভীষ্ম নাটকে নায়কের কর্তব্যরক্ষা ও চিরকৌমার্যের প্রতিশ্রুতি পালনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব বেঁধেছে সহজ মানুষের প্রণয়াকুতির। নাট্যরচনা হিসেবে নানা ধরনের শিথিলতা, অতিমাত্রায় কবিত্ব, ঘটনা ও আবেগের অসামঞ্জস্য এদের সম্পূর্ণ সার্থক করে তোলে নি। কিন্তু পুরাণাশ্রিত নাটকে যে নব্যধারা প্রবর্তনের সাধনা তিনি করেছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্য আছে। পরবর্তী নাট্যকারেরা নিষ্ঠার সঙ্গে এর অনুসরণ করলে পুরাণাশ্রিত নাটক একালে একেবারে লুপ্ত হত না, আধুনিক চিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে রসাস্বাদের বৈচিত্র্য সাধনে সমর্থ হ'ত।

দ্বিজেন্দ্রলাল "পরপারে", "বঙ্গনারী" প্রভৃতি যে দু-একখানি সামাজিক নাটক রচনা করেছিলেন তা যথেষ্ট নাট্যোৎকর্ষ লাভ করে নি। দ্বিজেন্দ্রলাল পৌরাণিক এবং ঐতিহাসিক নাটকে আধুনিক জীবনসমস্যার সন্ধান করেছেন, কিন্তু প্রহসন বা সামাজিক নাটকে সফল হন নি। সম্ভবত জীবনের ঘটনামূলক, প্রবৃত্তিসংক্ষুব্ধ ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। সমকালীন সামাজিক জীবনের স্তিমিতআবেগ প্রাত্যহিকতা তাঁর মনকে জাগাতে পারে নি।

ঐতিহাসিক মূল্যে এবং নাটকীয় উৎকর্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ঐতিহাসিক নাটকগুলি। হিন্দুযুগ অবলম্বনে "চন্দ্রগুপ্ত" লিখলেও আসলে তাঁর আকর্ষণ ছিল মুঘল ও রাজপুত যুগের প্রতি। অবশ্য এই নাটকের চাণক্য চরিত্র তাঁর একটি অমর সৃষ্টি। তাঁর "তারাবাঈ", "প্রতাপসিংহ", "দুর্গাদাস", "মেবার পতন" ১৯০৩ থেকে ১৯০৮ এর মধ্যে রচিত। এ নাটকগুলিতে তিনি রাজপুত-ইতিহাসের কাহিনী বিবৃত করেছেন। অবশ্য রাজপুত ও মুসলমান সম্রাটদের সংঘর্ষই এই নাটকগুলির বিষয়বস্তু। এই নাটকগুলিতে ইতিহাসের সত্যতা প্রায়ই রক্ষিত হয়েছে। অবশ্য আদর্শবাদের প্রভাব কল্পনাকে যথেষ্ট প্রশ্রয় দিয়েছে। কিন্তু

নাটকের জন্য প্রথম প্রয়োজন যে পূর্ণাঙ্গ মানবিক কাহিনীর তার গঠন এগুলিতে বাধা প্রাপ্ত হয়েছে। উনবিংশ-বিংশ শতকের জাতীয়তাবাদ (বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবজাত) এইসব নাটকের প্রধান সুর। অবশ্য "মেবার পতনে" তিনি জাতীয়তাবাদের উপরেও মানবমৈত্রীর আদর্শকে স্থাপিত করেছেন। চরিত্রচিত্রণ, দ্বন্দ্বমূলক কাহিনীনির্মিতি প্রভৃতির দিকে এ নাটকগুলি যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করে নি। মুঘলজীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে "নুরজাহান" (১৯০৮) এবং "সাজাহান" (১৯০৯) নাটকে। ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব, সিংহাসন নিয়ে তীব্র হানাহানি কামনাবাসনার ফেনিল সংঘাত, ঈর্ষা, সৌন্দর্য-মদিরতা, বিলাস-বিভ্রম ও জ্বালাময়ী মনোভাব এই নাটকদ্বয়ের কাহিনীভিত্তি রচনা করেছে। এখানে স্বাদেশিকতার মন্ত্র উচ্চারিত হয় নি। মুঘলযুগের ঐশ্বর্য ও রক্তাক্ত লোভের সংঘাতময় পটভূমিকায় প্রবৃত্তিঘন মানবের ব্যক্তিচরিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। নুরজাহানের চরিত্রে হৃদয়হীন সৌন্দর্যের অগ্নিদাহ একটি মানবীর জীবন ও ভাগ্যকে ঘিরে যে জাল বুনেছে তার ট্রাজিক ফলশ্রুতি অঙ্কনে দ্বিজেন্দ্রলাল দুর্লভ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সাজাহান নাটকে সাজাহান চরিত্রে বিচারহীন পিতৃত্ব ও সম্রাটত্বের মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র তিনি এঁকেছেন। নুরজাহানের মত তাঁর সাজাহানের ট্রাজেডিও মৃত্যুতে নয়, অন্তর্দ্বন্দ্বজাত সুগভীর আত্মঅবক্ষয়ে। ট্রাজেডির এই নবধারণা সমকালীন য়ুরোপীয় সাহিত্যপাঠের ফল। সাজাহান নাটকের ঔরংজীবের চরিত্রটিও নিষ্ঠুরতা, শাঠ্য ও সুপ্ত মানবতার মিশ্রণজাত এক বিচিত্র সৃষ্টি। নানা দোষ ত্রুটি থাকলেও সাজাহানই দ্বিজেন্দ্রলালের শ্রেষ্ঠ রচনা বলে মনে হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল য়ুরোপীয় ধাঁচের রোমান্টিক ট্রাজেডি ও ঐতিহাসিক নাটক রচনার ক্ষেত্রে আরও বেশী সফল হতে পারতেন। কিন্তু অতিভাবালুতা, নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শবাদ, বায়বীয় প্রেমধারণা, কবিত্বের বাড়াবাড়ি ও সংলাপে যথাযথ ভাষার অপ্রয়োগ তাঁকে উন্নততর নাট্যকারের মহিমা থেকে ভ্রষ্ট করেছে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭)

পরিচয়॥ রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। অনেকগুলি নাটক রচনা করে তিনি বঙ্গ নাট্য-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তিনি অনেক গল্প-উপন্যাসও

রচনা করেছিলেন। তাঁর নাটকের সংখ্যা দেখে বোঝা যায় সমকালীন রঙ্গমঞ্চের চাহিদা তিনি অনেকাংশে মিটিয়েছিলেন। তখন বাংলা রঙ্গমঞ্চে গিরিশচন্দ্রের প্রভাব প্রবলভাবে চলেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদও সেই প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। কিন্তু সমসাময়িক শক্তিমান নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালকেও তিনি একেবারে অবহেলা করতে পারেন নি। তবে গিরিশচন্দ্রের তুলনায় তাঁর মধ্যে ভক্তির আবেগতারল্যের অভাব ছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় কবিত্ব শক্তিও তাঁর ছিল না। তাই যাত্রার যে ধারা গিরিশচন্দ্রের নাটকের একটি প্রধান শক্তি, ক্ষীরোদপ্রসাদে তার প্রভাব অল্প, আবার দ্বিজেন্দ্রলাল-অনুসৃত ইংরেজী নাট্যধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও তিনি নিয়ত সে-পথে পরিক্রমণ করতে চান নি। ক্ষীরোদপ্রসাদের জীবনচেতনা ছিল অগভীর, নাট্যকলা বিষয়েও কোন তীক্ষ্ণ বোধ ছিল না। কিন্তু পরিমিত শক্তি নিয়েও তিনি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তবে রঙ্গালয়গামী জনসাধারণের মনোরঞ্জন করতে করতে আপন অন্তরেই তিনি কিছু বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলেন এরূপ প্রমাণ আছে।

নাট্যগ্রন্থাবলী॥ ক্ষীরোদপ্রসাদ চল্লিশখানার বেশী ছোট বড় নাটক লিখেছেন। তার মধ্যে ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক আছে অনেকগুলি। সামাজিক নাটক কিন্তু একখানাও নেই। কাল্পনিক বিষয়বস্তু অবলম্বনে রচিত নাটক কয়েকখানা আছে, আছে অনেকগুলি রঙ্গনাট্য, গীতিনাট্য ও নাট্যকাব্য জাতীয় রচনা। কিন্তু প্রহসন নেই একখানাও। বাস্তব সমাজ-সমস্যা ক্ষীরোদপ্রসাদের চেতনাকে বিদ্ধ করতে পারে নি। তাঁর মত খ্যাতনামা নাট্যকার এতগুলি ভিন্ন জাতীয় নাটকের মধ্যে একখানাও সামাজিক নাটক, অন্ততপক্ষে একটি প্রহসনও রচনা করলেন না, এ যেন ভাবাই যায় না। আসলে বর্তমান থেকে ঐতিহাসিক রোমান্সের অথবা বর্ণাঢ্য পৌরাণিক রাজ্যে তিনি প্রস্থান করতে চেয়েছেন। আরও বেশী স্বচ্ছন্দ হয়েছেন তিনি রঙ্গনাট্য ও কাল্পনিক গীতিনাট্যের খেয়ালী তারল্যের (Fancy) রাজ্যে।

ক্ষীরোদপ্রসাদের প্রথম নাটক "ফুলশয্যা" (১৮৯৪) নামক দৃশ্যকাব্য। তাঁর শেষ নাটক "নরনারায়ণ" ১৯২৬ সালে প্রকাশিত। তিনি "আলিবাবা", "জুলিয়া," "বেদৌরা", "কিন্নরী", "রূপের ডালি" প্রভৃতি রঙ্গনাট্য-গীতিনাট্য জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি গীতিবহুল হাল্কা সুরের রচনা। তরল ও খেয়ালী কল্পনাবিলাসের এমন একটা লঘু আস্বাদ এখানে আছে যার মূল্য রসিক পাঠক অস্বীকার করতে পারে না। "আলিবাবা" এই শ্রেণীর রচনার

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ক্ষীরোদপ্রসাদের এই ধরনের নাটিকা প্রণয়নে সহজ প্রবণতা ছিল এবং বেশ খানিকটা দক্ষতাও তিনি লাভ করেছিলেন। লক্ষণীয়, আরবী-পারসিক লঘুরস কাহিনীর দিকে তাঁর বেশ আকর্ষণ ছিল।

"সাবিত্রী", "মন্দাকিনী", "ভীষ্ম", "নরনারায়ণ" প্রভৃতি পৌরাণিক নাটক তিনি লিখেছিলেন। পৌরাণিক বিষয়ের আরও অনেকগুলি নাটককে তিনি "গীতিকাব্য-নাট্যকাব্য" শ্রেণীভুক্ত করেছেন; যেমন, "বভ্রুবাহন," "বৃন্দাবন-বিলাস," "রাধাকৃষ্ণ" প্রভৃতি। তাঁর প্রথমদিকের পৌরাণিক নাটকগুলি একান্ত-ভাবেই বিশেষত্বহীন। গিরিশচন্দ্রাদির মত ভক্তির আবেগ ও ধর্মোন্মাদনায় সাধারণ স্তরের দর্শকদের এরা যেমন মাতিয়ে তোলে না, তেমনি নব পন্থানু-সন্ধানের সাহসের চিহ্নও এদের মধ্যে কোথাও ধরা পড়ে না। তাঁর বিশিষ্ট পৌরাণিক নাটক দু'টি হল "ভীষ্ম" এবং "নরনারায়ণ"। দু'টি নাটকই বিংশ শতকে রচিত। দ্বিজেন্দ্রলালের পৌরাণিক নাটকের নবধারা তখন অভিজ্ঞতার সামগ্রী হয়েছে। তিনি সেদিকে একেবারে অন্ধ ছিলেন না। অবশ্য নবধারার প্রবক্তা হয়ে উঠবার মত সাহস বা মানসিকতা কোনটিই তাঁর ছিল না। "ভীষ্ম"র মধ্যে দূরাগত স্বপ্নের মত বাস্তব জীবনতৃষ্ণার সন্ধান তিনি করতে চেয়েছেন, কিন্তু কাহিনীতে নাট্যসংহতি বিধান করতে পারেন নি। নাট্যকারের দ্বিধা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে "নরনারায়ণে"। নরনারায়ণে রবীন্দ্রনাথের "কর্ণকুন্তী সংবাদে"র প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে, "গান্ধারীর আবেদনে"র প্রভাব পড়েছে কিছু পরোক্ষভাবে। অবশ্য কর্ণের দৈব-লাঞ্ছিত পৌরুষের চিত্র তিনি নিশ্চিন্তভাবে আঁকতে পারেন নি। শ্রীকৃষ্ণ নররূপী নারায়ণ কিনা এই আধ্যাত্মিক জিজ্ঞাসায় তিনি অধিক ব্যাকুল হয়েছেন। সংলাপে বিবৃতিধর্ম, কখনও আবেগবাহুল্য, কখনও আবেগের অভাব, গদ্য-পদ্যের বিচারহীন মিশ্রণ শিল্প-সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়েছে। কর্ণ ব্যতীত অপরাপর চরিত্রের একান্ত অকিঞ্চিৎকরতা এ নাটকের অপর প্রধান ত্রুটি।

ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে "বঙ্গের প্রতাপাদিত্য" (১৯০৩), "পদ্মিনী", "চাঁদবিবি", "বাঙ্গালার মসনদ", "পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত", "বঙ্গে রাঠোর" "আলমগীর" (১৯২১) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটকেই ইতিহাসের সামান্য অনুসরণ আছে। অতি নাটকীয় ঘটনাবিস্তার, অস্পষ্ট স্বাদেশিকতা, অবাস্তব বীরবীয় চরিত্র-সৃষ্টিতে এই রচনাগুলি পরিপূর্ণ। ইতিহাস ও কল্পনার যে রাসায়নিক যোগাযোগে ঐতিহাসিক নাটক সফল

হয় ক্ষীরোদপ্রসাদের তা অজ্ঞাত ছিল। এই নাটকগুলির মধ্যে আলমগীর কথঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। এ নাটকের বাচনরীতিতে অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বপূর্ণ ভাষার অনুকরণ চেষ্টা ধরা পড়ে। ঘটনা ও চরিত্রের অতিবিস্তার নাটকটিকে শিথিলবদ্ধ করে ফেলেছে। তবে চরিত্রচিত্রণে বেশ কিছু সাফল্য তিনি লাভ করেছিলেন। সাম্রাজ্যলোভ-শঠতা-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে মানবতার দ্বন্দ্ব আলমগীরের চরিত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ সমকালীন অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাবে হিন্দু-মুসলমানের মিলনসঙ্গীত রচনার জন্য আলমগীরের চরিত্রই বেছে নিয়েছিলেন। অবশ্য এ-কল্পনা একান্তভাবে অনৈতিহাসিক। রাজসিংহ চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব, উদিপুরীর শ্রেয়সাধনা, কামবক্সের কল্যাণধর্মী ও কবিসুলভ ব্যক্তিত্বও সুঅঙ্কিত।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশক পর্যন্ত নাট্যরচনা করেও ক্ষীরোদপ্রসাদ ঊনবিংশ শতকোচিত প্রগতি-ভাবনার কতটুকুই বা গ্রহণ করতে পেরেছিলেন ভাবলে বিস্মিত হতে হয়॥

॥ দুই ॥

কাব্য-কবিতা

ভূমিকা

এক॥ বাংলা কবিতা মধুসূদনের সাধনার মধ্য দিয়ে নবযুগে প্রতিষ্ঠিত হল। নবযুগের প্রাণলক্ষণ ও রূপচেতনা বাংলা কাব্যকে গুণগত সমুন্নতি দান করল। য়ুরোপীয় বিশেষ করে ইংরেজী সাহিত্যের অন্তর-প্রেরণাকে আত্মসাৎ করে বাংলা কাব্যের নবপরিণতি সম্পন্ন হল। সৃষ্টির প্রাচুর্যে এবং সাহিত্যিক উৎকর্ষে পূর্ববর্তী পর্বের কাব্য-কবিতার সঙ্গে এর তুলনা করা চলে না। তদুপরি মধ্যযুগের বাংলা কবিতার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে আধুনিক কবিতা এদেশের নবজাগৃতির ঐতিহাসিক নিয়তিকেই অনুসরণ করল। মধুসূদনোত্তর বাংলা কাব্যের সঙ্গে পুরাতন কাব্যধারার কোন সম্পর্ক রইল না। ইংরেজী কাব্যধারার সঙ্গে মৈত্রী দৃঢ় হতে লাগল।

দুই। বাংলা কবিতার দু'টি ধারা এই পর্বে লক্ষ্য করা যায়— আখ্যানকাব্য-মহাকাব্যের ধারা এবং গীতি-কবিতার ধারা। রঙ্গলালে সামান্যত সূচিত হলেও প্রথম ধারাটি মধুসূদনে পুষ্ট হল। মধ্যযুগের আখ্যানকাব্যের সঙ্গে জীবনদৃষ্টি, গল্পগঠন, চরিত্রচিত্রণ ও বর্ণনাভঙ্গি কোন দিক থেকেই এর

মিল নেই। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের রচনায় এর বহুল চর্চা দেখা গেল। ঈশানচন্দ্র এবং অক্ষয় চৌধুরীতে এই কাব্যধারা গীতিধর্মের কাছে কিরূপে আত্মসমর্পন করছে তার নজির মিলল। বাংলা আখ্যানকাব্যে মধুস্থদন থেকেই রোমান্টিক গীতিস্থরটি প্রবলভাবে অনুভব করা যায়। হেমচন্দ্রের আখ্যানে গীতিরস স্বল্প হলেও নবীনচন্দ্রে উচ্ছ্বাসের প্রাধান্য দেখা গেল। বাঙ্গালীর জাতীয় স্বভাব এর জন্য দায়ী। সম্ভবত. অন্যতম কারণ হল যুগের প্রভাব। যে-য়ুরোপীয় সাহিত্যের সামীপ্য বাংলা কবিতা লাভ করেছে সেখানে ক্লাসিক গল্পকথনের দিন বহু পূর্বে গত হয়েছে, রোমান্টিক গীতিকবিতার জয়জয়কার চলেছে। বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য তাই প্রথম থেকেই বড় দ্বিধাহীন হতে পারে নি।

তিন ॥ মহাকাব্যের যুগ গত হয়েছিল বহুপূর্বে। মধুস্থদনের প্রতিভায় মহাকবির প্রাণধর্ম যে বজায় ছিল তা খুবই বিস্ময়কর। তিনি উদাত্ত গম্ভীরের রস, মানব-মহিমার বিপুল বিস্তারকে কাব্যভাত করলেন মেঘনাদবধে। লক্ষণীয়, তিনি এই কাব্যেও রোমান্টিক গীতিধর্মকে বহুলাংশে প্রশ্রয় দিয়েছেন, এবং দ্বিতীয় মহাকাব্য রচনা করায় মনের সমর্থন কখনো পান নি। মহা-কাব্যের রাজ্য থেকে বিদায় নিয়ে তিনি গীতিকবিতার রাজ্যে প্রবেশ করলেন। "বীরাঙ্গনা" দুইরাজ্যের যোগস্থত্র নির্দেশ করল। মধুস্থদনের পরবর্তী যে কবিরা মহাকাব্য লিখেছেন তাঁদের মহাকবিস্থলভ জীবনদৃষ্টি ছিল না, বিশেষ করে গদ্য-কাহিনীকথনের নূতনরীতি অর্থাৎ উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটায় মহাকাব্য তথা আখ্যায়িকা কাব্যরচনার সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছিল। ইতিহাসের এই ঘোষণা শুনতে না পেয়ে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র ব্যর্থ হয়েছেন।

চার ॥ আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা মধুস্থদনের হাতে জন্ম নিল, কিন্তু তার নির্দ্বন্দ্ব পুষ্টি ঘটল বিহারীলালে। এই ধারাই বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ পথ খুলে দিল।

পাঁচ ॥ গীতিকবিতার একটি বিশেষ রূপ সনেটও মধুস্থদন প্রথম নিয়ে এলেন। দেবেন্দ্রনাথ-কামিনী রায় প্রভৃতি স্বল্পসংখ্যক কবির সাধনায় এই কাব্যরীতিটি বেঁচে রইল উত্তরাধিকারের জন্য।

মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-৭৩)

পরিচয় ॥ কাশীরাম দাসকে অভিনন্দিত করে একটি সনেটে মধুসূদন বলেছিলেন,

> কঠোরে গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
> (সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
> সগর-বংশের যথা সাধিলা মুকতি,
> পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
> সেইরূপ ভাষাপথ খননি স্ববলে,
> ভারতরসের স্রোতঃ—আনিয়াছ তুমি
> জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !

এর মধ্যে আত্মকথনের ব্যঞ্জনা আছে। ভগীরথের মত দুরূহ তপস্যা তাঁর, কাশীরাম দাসের মত নব্যগৌড়ের রস-তৃষ্ণা তিনি নিবৃত্ত করেছেন, তবে শুধুমাত্র ভারতরসের স্রোত দিয়ে নয় ; বিশ্বসাহিত্যের সুধাধারাকে তিনি আমন্ত্রিত করেছেন বাংলা কাব্যের শুষ্কখাত শীর্ণ নদীতে। বহু ভাষায় অভিজ্ঞ মধুসূদন য়ুরোপীয় কবিদের কাব্যসাহিত্য মন্থন করে বাংলা সাহিত্যে নবপ্রাণ-ধারা সঞ্চারিত করেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায়, "I never read any poetry except that of Valmiki, Homer, Vyasa, Virgil Kalidas, Dante (in translation), Tasso (do) and Milton মধুসূদন বলেছেন, দৈবশক্তির সমর্থন থাকলে এই কবিকুলগুরুরা কোন ব্যক্তিকে প্রথম শ্রেণীর কবিতে পরিণত করতে পারে। একথা কতটা সত্য সে বিচার না করেও বলা যায় এঁদের সহবাস একটা ভাষার কাব্যসাহিত্যে নবযুগ আনয়ন করতে পারে। বাংলা কবিতায় তাই-ই ঘটল। রাতারাতি মধ্যযুগের শেষ চিহ্ন ঝেড়ে ফেলে বাংলা কাব্য বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে সহজ সখ্য স্থাপন করল। নূতন ভাবভাবনায় যেমন তিনি বাংলা কাব্যকে দীক্ষিত করলেন, তেমনি নবীন রূপচেতনাকে আমন্ত্রণ জানালেন বাংলা কবিতার প্রাঙ্গণে।

কাব্যগ্রন্থাবলী ॥ নাট্যকাররূপে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আগমন। "শর্মিষ্ঠা" নাটক রচনা করে পাঠকসমাজকে চমকে দেওয়ার পূর্বে তিনি ইংরেজী ভাষায় কাব্যচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তাতে যথেষ্ট সফলতা আসে নি। কাব্যরচনা করে প্রথম শ্রেণীর কবির আসন লাভ করার বাসনা তাঁর বাল্যাবধি ছিল।

কিন্তু যে বাংলা ভাষাকে তিনি চিরকাল তাচ্ছিল্য করে এসেছেন সেই ভাষাই যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান দেবে এ তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ঘটনা-চক্রে নাট্যরচনার মাধ্যমে তিনি বাংলা সাহিত্যের আসরে নামলেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যে একাধিক নাটক-প্রহসন রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন। "পদ্মাবতী" নাটক রচনা করতে গিয়ে তিনি একটি চরিত্রের সংলাপে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছিলেন। নূতন কাব্য রচনার ভূমিকা করা হল এখানেই। এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কাব্য রচনা করে বাংলা কাব্য-ভাষার সংস্কার সাধনে তিনি ব্রতী হলেন। "তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য" রচিত ও প্রকাশিত হল (১৮৬০), পরবর্তী কাব্য "ব্রজাঙ্গনা" (১৮৬১) "মেঘনাদবধ" কাব্যের পরে প্রকাশিত হলেও তিলোত্তমাসম্ভব শেষ হওয়ার পূর্বেই আরব্ধ হয়ে মেঘনাদবধ শেষ হওয়ার বহু পূর্বে সমাপ্ত হয়। কবির তৃতীয় কাব্য "মেঘনাদবধ" (১৮৬১) তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য। তাঁর চতুর্থ কাব্য "বীরাঙ্গনা" (১৮৬২) রচনার পরে তিনি য়ুরোপ চলে যান। য়ুরোপ প্রবাসকালে তিনি সনেট লিখতে শুরু করেন। তাঁর সনেটগুচ্ছ "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" নামে প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ সালে। এছাড়া কতগুলি মহাকাব্য তিনি আরম্ভই মাত্র করেছিলেন, সে সব রচনা বেশী দূর অগ্রসর হয় নি। বীরাঙ্গনার দ্বিতীয় ভাগে আরও দশটি পত্র সংযোজনের ইচ্ছা তাঁর ছিল। কয়েকটি অসম্পূর্ণ রচনায় তার সাক্ষ্য আছে। কয়েকটি গীতিকবিতা এবং কিশোরসেব্য কিছু নীতি-মূলক কবিতাও মধুসূদন লিখেছিলেন। ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলেও মাত্র তিন চারটি বছরই তিনি কাব্যসাধনা করেছিলেন। ধূমকেতুর মত স্বল্প-কালের জন্য এবং আকস্মিকভাবেই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু ধূম-কেতুর মত স্বল্পস্থায়ী চমক সৃষ্টি করে তিনি ফুরিয়ে যান নি, দীর্ঘস্থায়ী কাব্য-ঐতিহ্য তিনি উত্তরাধিকারের জন্য রেখে গিয়েছিলেন।

মধুসূদন একটিমাত্র প্রস্তুতির কাব্য লিখেছিলেন "তিলোত্তমাসম্ভব"। তাঁর অপরাপর কাব্যকবিতায় নানা ধরনের ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলেও অপরিণতির লক্ষণ নেই প্রায় কোথাও। তিলোত্তমাসম্ভব অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। পুরাতন কাব্য-কবিতার ভাষা, ছন্দ ও রীতিতে মৌলিক পরিবর্তন না ঘটালে কাব্যসাহিত্যে নবযুগ সম্ভাবিত হবে না এ বোধ তাঁর ছিল। সেই বোধ থেকেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের জন্ম। পূর্বে বাংলা কবিতা সাধারণত পয়ার ছন্দে লেখা হত। মধুসূদনের ছন্দে পয়ারের কাঠামোটি বজায় আছে। প্রত্যেক পংক্তিতে চৌদ্দটি করে মাত্রা, আট মাত্রার পরে একবার থামতে হয়, ছয় মাত্রার পরে

আর একবার। কিন্তু পুরাতন কাঠামো সত্ত্বেও মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর সম্পূর্ণ নূতন বস্তু। এক। পয়ারে প্রত্যেক দুই পংক্তির শেষে মিল থাকে, অমিত্রাক্ষর ছন্দে মিল থাকে না। দুই। মিলের অভাব শব্দঝঙ্কারের দ্বারা পূরণ করা হল। যুক্তব্যঞ্জনবিশিষ্ট শব্দব্যবহারের আধিক্য এবং যমক-অনুপ্রাসাদির প্রয়োগে ধ্বনিগত সুষমা অব্যাহত রাখাই শুধু হল না, বহু পরিমাণে বাড়িয়ে তোলা হল। তিন। পয়ারে প্রত্যেক পংক্তিতেই অর্থ শেষ করতে হত। কবির অনুভূত ভাব দীর্ঘ হলে পংক্তিতে পংক্তিতে ভেঙ্গে বলতে হত। অমিত্রাক্ষরে পংক্তিতে পংক্তিতে ভাবের গতি ব্যাহত নয়। দুই পংক্তি, চার পংক্তি—ভাব প্রকাশ করতে যতটা স্থান দরকার তা গ্রহণ করার স্বাধীনতা কবির রইল। এমন কি যে কোন সংখ্যক মাত্রার পরে কোন পংক্তির মাঝামাঝি জায়গায়ও ভাবের উপরে সমাপ্তির যতি টানায় বাধা রইল না। চার। বাংলা ভাষার উচ্চারণে accent এবং quantity-র অভাব লক্ষণীয়। তাই syllable, accent এবং quantity-র নিপুণ নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে মিলটন তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে যে সঙ্গীত বাজিয়েছেন বাংলা ছন্দে স্বাভাবিকভাবে সে সিদ্ধি সম্ভব ছিল না। মধুসূদন সেই অসাধ্যসাধন করলেন। ফলে "অক্ষরগুলি পূর্বের মতই পায়ে পায়ে ঠিক চলিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মাথা শস্যশীর্ষের মত দুলিতে আরম্ভ করিল, আমাদের বর্ণবৃত্তেও অক্ষরের স্বরবৃদ্ধি ছন্দকে তরঙ্গিত করিতে লাগিল।" (—মোহিতলাল)।

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যটির কাহিনী-অংশ মহাভারত থেকে গৃহীত। কাহিনীটি সামান্য, মূলের সঙ্গে কবির বিশেষ কোন বিরুদ্ধতাও গল্পাংশে প্রকাশ পায় নি। কাব্যের চারটি সর্গে বিস্তৃত ঘটনা কয়েক পংক্তিতে বর্ণনা করা চলে। প্রথম সর্গে রাজ্যচ্যুত চিন্তাভারগ্রস্ত ইন্দ্রের নিদ্রাকর্ষণের নানা চেষ্টা, অবশেষে ইন্দ্রাণীর সঙ্গে তার মিলন; দ্বিতীয় সর্গে ব্রহ্মলোকের বহির্ভাগে দেবতাদের সঙ্গে ইন্দ্রের পুনর্মিলন এবং স্বর্গোদ্ধারের জন্য নানা পরামর্শ; তৃতীয় সর্গে ব্রহ্মার সঙ্গে ইন্দ্রাদির সাক্ষাৎ ও সুন্দ-উপসুন্দের মধ্যে শত্রুতা আনবার জন্য বিশ্বকর্মা কর্তৃক তিলোত্তমাসৃষ্টি; চতুর্থ সর্গে তিলোত্তমার রূপদর্শনে সুন্দ-উপসুন্দের দ্বন্দ্ব ও বিনাশ। কাহিনীটি একাগ্র, বাহুল্যবর্জিত এবং পার্শ্বকাহিনীর জটিলতায় বহুখণ্ড নয়। যদিও কাহিনী-নির্মাণে কবি যথেষ্ট দৃষ্টি দেন নি, তবুও য়ুরোপীয় কাব্যপাঠের সংস্কার অবচেতনার মধ্য থেকে এই জাতীয় সম্পূর্ণায়ত গল্পগঠনে কবিকে সাহায্য করেছে, কোন শাখাপথে তাঁকে দিক্‌ভ্রান্ত করে নি। কিন্তু ঘটনা, বর্ণনা ও বিবৃতির মধ্যে ভারসাম্যের অভাব আখ্যানগত

আকর্ষণসৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া চিত্র-রচনার প্রাচুর্যে বর্ণনীয় বিষয় অনেক সময় আচ্ছন্ন হয়েছে এবং কবি ছন্দসংগীতের প্রবাহ প্রবলভাবে সমগ্র চেতনা দিয়ে অনুভব করায় চিত্রের উপরে চিত্র আপতিত এবং উপমার উপমায় বা অলঙ্কারের অলঙ্করণে অস্পষ্টতা প্রকট হয়ে উঠেছে। এ-কাব্যের চরিত্রচিত্রণে নেই গভীরতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য কিংবা জীবনজিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতা। মনে রাখা উচিত এ-কাব্যের কবি একটি নূতন ছন্দ আবিষ্কার করে মত্ত হয়ে উঠেছেন। তিলোত্তমাসম্ভবে সেই নব ছন্দস্রোতে ভেসে যাওয়া, পার্থিব যাবতীয় বস্তু-সৌন্দর্য খণ্ড খণ্ড ভাবে উপলব্ধি এবং মাত্র প্রসঙ্গত একটি কাহিনীকথনই কবির অভিপ্রেত। কিন্তু এ-কাব্যের তিলোত্তমাকে কেন্দ্র করে কবির যে সৌন্দর্য-চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যমূল্য আছে। তিলোত্তমা প্রাকৃতিক জগতের তিল তিল উত্তমের সমন্বয়েই মাত্র গঠিত নয়, সে প্রকৃতি-জগতের প্রাণনির্যাস। পৃথিবীর খণ্ড খণ্ড বস্তুশোভায় তারই সৌন্দর্য যেন বিকীর্ণ হয়ে আছে। তারই পদপাতে পৃথিবীতে যে প্রেম জাগছে, তারই পলকপাতে প্রকৃতির বস্তুনিচয়ে যে সৌন্দর্যের তরঙ্গোদ্বেলতা, সে সম্পর্কে যেন তিলোত্তমার নিজের চেতনামাত্র নেই। তারই রূপে মুগ্ধ সুন্দ-উপসুন্দ যে অন্যোন্য সংগ্রামে নিহত, এতে তার বেদনাবোধ নেই। নেই আনন্দোচ্ছ্বাসও। তিলোত্তমার এই কল্পনার মূলে য়ুরোপীয় রোমান্টিক কবিকুলের ভাবাদর্শ যে অনেকখানি কার্যকর হয়েছে তাতে সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। এ-কাব্যে রূপসিদ্ধি ও কাব্যকল্পনাগত নানা দুর্বলতা আছে। কিন্তু মনে রাখা দরকার এটিই কবির প্রথম কাব্য, এটি কাব্যরাজ্যের সিংহাসন অধিকারের প্রস্তুতিমাত্র; এবং নানা দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও পূর্ববর্তী যে কোন বাংলা কাব্যের তুলনায় এটি শ্রেষ্ঠ, "পদ্মিনী" উপাখ্যানের সঙ্গে এর পার্থক্য গুণগত।

কবির "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" সমকালীন অপর তিনটি কাব্য থেকে ভাব ও রূপরীতিতে স্বতন্ত্র। তিলোত্তমাসম্ভব, মেঘনাদবধ কিংবা বীরাঙ্গনায় কবি প্রধানত পুরাণ-কল্পনার—বিশেষ করে রামায়ণ-মহাভারতের বিপুল গম্ভীরের রাজ্যে ভ্রমণ করেছেন। এসব কাব্যে মাধুর্যের যে সুর বেজেছে তাও উদাত্ত গাম্ভীর্যের নৈকট্যচ্যুত হয় নি। ব্রজাঙ্গনার বিষয় পুরাণাশ্রিত নয়, পদাবলীর রাজ্য থেকে সঙ্কলিত এবং এর মাধুর্যও অবিমিশ্র। ছন্দের দিক থেকেও অপর তিনটি কাব্যের সঙ্গে ব্রজাঙ্গনার গুরুতর পার্থক্য আছে।—কাহিনী আগাগোড়া মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। কবি এগুলিকে য়ুরোপীয়

"ওড" জাতীয় কবিতা বলে পরিচিত করেছেন। ব্রজাঙ্গনার কবিতাগুলিকে আধুনিক ধরনের খাঁটি গীতিকবিতা বলে চিহ্নিত করা যায় না। কবির ব্যক্তি 'আমি'র বেদনাতুর কণ্ঠ রাধাবিরহের এই কবিতাগুলির পিছন থেকে উঁকি মারে না। এই কাব্যে মিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হলেও মধুসূদনের হাতের স্পর্শে তা বিচিত্র কারুকর্মে পূর্ণ হয়ে দেখা দিয়েছে। এ-কাব্যে তিনি নানা রকমের অন্ত্যানুপ্রাস ব্যবহার করলেন। হ্রস্ব ও দীর্ঘ চরণের মধ্যে চরণান্তিক মিল সৃষ্টি করে, কখনো বা বিকল্প চরণে মিল স্থাপন করে, কখনো প্রথম চার পংক্তিতে বিকল্প চরণে মিল এবং শেষ দুই পংক্তিতে পর পর মিল ব্যবহার করে, ত্রিপদী ও পয়ারের ঢঙ মিলিয়ে বহু বিচিত্র ও জটিল স্তবক নির্মাণ তিনি এ-কাব্যে করেছেন। মিত্রাক্ষরের এই বিচিত্র চেহারা সেকালে বাংলা কাব্যে কল্পনারও অতীত ছিল; কিন্তু তবুও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে এই সব কারু-কর্মের মধ্যে যেন কবির প্রাণতরঙ্গ শ্রুত নয়। প্রেমজিজ্ঞাসার দিক থেকেও ব্রজাঙ্গনার প্রশংসা করা চলে না। রাধা তাঁর কাছে Mrs. Radha। কিন্তু তাঁর মানবীহৃদয়ের অকৃত্রিম ও গভীর প্রেমানুভূতি এ-কাব্যে প্রকাশিত হয় নি। মনে হয় এ-কাব্য রচনাকালে মধুসূদনের কবিপ্রাণের উদ্বোধন ঘটে নি। গীতি-কবিতার দেহনির্মাণে ব্যর্থতায়, চিত্ররচনার স্থূলত্বে, মামুলি উপমাদির অতি-ভারে, রাধার চরিত্রজিজ্ঞাসার অভাবে এবং কবির আত্মপ্রতিফলন না ঘটায় এ-কাব্যের ব্যর্থতা প্রায় সর্বাঙ্গীন। কবির চিত্তজাগরণের এরূপ অভাব আর কোন কাব্যেই ঘটে নি।

মেঘনাদবধ মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য। বীরাঙ্গনার সুমার্জিত দেহলাবণ্য এবং ছন্দসঙ্গীতের পূর্ণতর মূর্তি এ-কাব্যে নেই, চতুর্দশপদীর কিছু কবিতার মৃত্যুদীর্ণ দুর্লভ প্রশান্তিও হয়তো এখানে অপেক্ষিত। কিন্তু সরলতায়, উল্লাসে ও হাহাকারে মধুসূদনের কবিপ্রাণ এখানে সর্বাধিক মুক্ত। নিখিলের বিস্তারে তাঁর কাব্যপক্ষ এতখানি প্রসারিত হয় নি আর কখনও। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যের কাহিনী-অংশ রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছেন। কাহিনী-অংশ সংক্ষেপে এই : বীরবাহুর মৃত্যুর পরে ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ কর্তৃক সৈনাপত্য গ্রহণ; নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে পূজারত নিরস্ত্র বীরের লক্ষ্মণের হাতে মৃত্যুবরণ; ক্রুদ্ধ রাবণের যুদ্ধযাত্রা এবং শক্তিশেলে লক্ষ্মণের আহত হওয়া; ঔষধাদি আনয়ন করে লক্ষ্মণের জীবনদান; মেঘনাদের মৃতদেহ সৎকার। কাহিনীর এই মূল কাঠামোর মধ্যে নানা কাব্যিক ঘটনাবিস্তার ও পল্লবিত বর্ণনার সমারোহ আছে। মেঘনাদবধ কাব্যে বর্ণনার সৌন্দর্য ও সংঘাতময় ঘটনার [illegible]

সমন্বয় সাধিত হয়েছে। বিশেষ করে রাবণ, মেঘনাদ, প্রমীলা, লক্ষ্মণের চরিত্র-সৃষ্টিতে কবি দুর্লভ জীবনানুভূতির পরিচয় দিয়েছেন।

মেঘনাদবধের কাহিনী-অংশ রামায়ণ থেকে গৃহীত হলেও কবির বিশিষ্ট জীবনজিজ্ঞাসার স্পর্শে তা একেবারে নূতন মূর্তিতে দেখা দিয়েছে। মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্যে উচ্চশ্রেণীর কবিরূপেই মাত্র দেখা দেন নি, কবি-বিদ্রোহীর ভূমিকা নিয়ে এসেছেন। বাল্মিকী রামায়ণে রাম যেমন আদর্শ মানুষ, বিরাট শক্তিমান ব্যক্তিত্ব, আর্য পিতার, সন্তানের, স্বামীর, নৃপতির আদর্শ মূর্তি, তেমনি কৃত্তিবাসে তিনি স্বয়ং ভগবানের অবতার। মধুসূদন নূতন যুগের মানুষ এবং নূতন ভাব-ভাবনার মানুষ। আর্য রাম যে মহান কীর্তি ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন আজ তা অর্থহীন, আবার কৃত্তিবাসের ভক্তিদ্রাবী ভগবৎচেতনায়ও তাঁর শ্রদ্ধা নেই। কাজেই এ-কাহিনীর দিকে তিনি তাকিয়েছেন একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ থেকে। সম্ভবত কৃত্তিবাস-কল্পিত রামের দুর্বল রোদনপ্রবণ ও বাঁকাশ্যাম মূর্তিই তাঁকে প্রথম এ চরিত্রটির সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হিসেবে নয় সেকালের হিন্দু কলেজের একজন দুর্দান্ত ছাত্রের মেজাজ নিয়ে তিনি বাঙালীর এই দুর্বলতম সহানুভূতির কেন্দ্রে আঘাত দিতে চেয়েছিলেন। যাঁরা পূজিত তাঁরাই ধিকৃত হলেন, যারা ছিল নিন্দার্হ তারাই মাহাত্ম্য পেল। বিদ্রোহীর এই মনোভাব তিলোত্তমায় কেবল ছন্দসাধনায় সক্রিয় ছিল, এখানে তা ভাববস্তু ও চরিত্র-চিত্রণের ভিত্তিতে আশ্রয় নিল। তৃতীয়ত, রাবণ-ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির মধ্যে প্রচুর বীরত্বের যে যে উপকরণ মহার্কবিরা উপ্ত রেখেছেন, কিন্তু যাকে কবিপ্রাণের ভালবাসার কণামাত্র দেন নি, সেই শক্তিধর কিন্তু স্রষ্টা কর্তৃক অবহেলিত এবং পাঠকের সহানুভূতিবঞ্চিত মানুষের প্রতি মধুসূদনের রোমান্টিক মন আকর্ষণ অনুভব করেছিল। চতুর্থত, ঊনবিংশ শতকে জাতীয় স্বাধীনতাবোধ বাংলাদেশে দানা বাঁধছিল। মধুসূদনের চেতনায় তার যে রূপ ধরা পড়েছিল তাতে পরদেশ আক্রমণকারী রাম-লক্ষ্মণের তুলনায় স্বদেশরক্ষাকারী রাবণ-ইন্দ্রজিতের প্রতিই সহানুভূতির পাল্লা ভারী হবার কথা, বিভীষণ ধার্মিক ও পুণ্যাত্মা না হয়ে বিশ্বাসঘাতকরূপেই প্রতিভাত হওয়া স্বাভাবিক। সর্বোপরি, রাবণের দুর্দম শক্তি কিন্তু নিয়তিলাঞ্ছিত সর্বনাশ কবির অন্তরের সঙ্গে সহজেই নিজের সামীপ্য ঘটিয়েছিল। রাবণ রামায়ণের অন্যতম বীরমাত্র হয়ে থাকে নি, কবি-আত্মার প্রতিফলনে সে যেন স্বয়ং মধুসূদন হয়ে উঠেছে—বিপুল শক্তি, বিপুল কামনা [illegible] বিপুলতর ব্যর্থতায় যে একই সময়ে স্বকাল এবং চিরকালের মানব।

মেঘনাদবধ কাব্যের দেবচরিত্রচিত্রণে এবং যুদ্ধ-বর্ণনায় হোমারের, নরক বর্ণনায় ভার্জিল ও দান্তের এবং ছন্দ ও রচনভঙ্গির ক্ষেত্রে মিলটনের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন। এইসব পাশ্চাত্ত্য মহাকবিরা বিশেষ করে মিলটন কবির ভাব-কল্পনার উপরে গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছেন।

ভারতীয় মহাকাব্যের আদর্শের প্রতি মধুসূদনের কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি য়ুরোপীয় মহাকাব্যের আদর্শও যে সর্বাংশে অনুসরণ করতে পেরেছিলেন এমন মনে হয় না। তবে মেঘনাদবধ মহাকাব্যের অন্তরলক্ষণ থেকে বঞ্চিত নয়। উদাত্ত গাম্ভীর্য, জীবনের ব্যাপকতা ও মাহাত্ম্যের সামগ্রীক অনুরণন বাংলা ভাষার এই একটিমাত্র কাব্যে লাভ করা যায়। কিন্তু ক্লাসিকতার অন্তরে সুপ্রচুর রোমান্টিক গীতিসুরকে প্রশ্রয় দিয়ে মধুসূদন কোথাও কোথাও মহাকবির ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছেন বটে, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাসের নব্য ধারার প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন।)

"বীরাঙ্গনা কাব্য" রোমক কবি ওভিদের "হিরোইড্‌স" বা "এপিস্টল্‌স অব হিরোইন্‌স"-এর আদর্শে রচিত। কিন্তু জীবনদৃষ্টি, চরিত্রসৃষ্টি ও বাচন-ভঙ্গির মৌলিকতা তার দ্বারা কিছুমাত্র ব্যাহত হয় নি। এই কাব্যে রামায়ণ-মহাভারতের জগৎ থেকে কয়েকটি নারীচরিত্রকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কবি। কিন্তু তাদের মধ্যে আধুনিক নারীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ এবং সর্ববাধা অতিক্রমকারী প্রেমশক্তির চিত্র তিনি অঙ্কিত করেছেন। সর্বশক্তি-মান হৃদয়ের নির্দেশ মানতে গিয়ে ভানুমতী ভীতি ও দৌর্বল্যের পরিচয় দিয়েছে, জনার আত্যন্তিক সাহস ভীতত্রস্ত স্বামীকেও ধিক্কার দিয়েছে; দ্রৌপদী মাতৃ-ভক্তি, ধর্মবোধ ও পঞ্চস্বামীসম্ভোগের অন্তরালে শুধুমাত্র একজনের একান্ত ভালোবাসার জন্য লোলুপ হয়ে উঠেছে; তারা ঋষি-পত্নীত্বকে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিত্যাগ করে ঘর ছাড়বার জন্য পা বাড়িয়েছে; উর্বশী দেবরাজদত্ত সুধাপাত্রটি ভ্রূভঙ্গিসহ ঈষৎ সরিয়ে দিয়ে মুক্ত স্বাধীন বিলাসপক্ষ গুটিয়ে সংসারপিঞ্জরে আশ্রয় চাইছে; রাজকুমারী শূর্পণখা নিভৃত শয়নকক্ষ ছেড়ে গোদাবরীর তীরে তীরে প্রিয়তমের প্রতীক্ষায় রাত্রিযাপন করেছে; সর্বত্রই প্রেমের জয়, হৃদয়ের অনন্যপারতন্ত্র্য সাধিত হয়েছে। বীরাঙ্গনা পত্রকাব্য নামে পরিচিত। পত্রাকারে রচিত হলেও এ-কাব্যের গঠনভঙ্গিতে গীতিধর্ম, নাট্যরস, পৌরাণিক কাহিনী-পটভূমি এবং চরিত্রচিত্রণ অদ্বয় সম্বন্ধে বদ্ধ হয়েছে। ব্যক্তিগত প্রবণতাকে অনেকটা সংবরণ করে চরিত্র-চিত্রণে মধুসূদন বিশেষ সফল হয়েছেন এই কাব্যে।

মধুসূদনের শেষ কাব্য "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" বাংলা সাহিত্যের প্রথম সনেটগুচ্ছ। পেত্রার্কার অনুসরণে সনেট লিখতে প্রবৃত্ত হলেও কবি সর্বত্র পেত্রার্কার সনেট-আঙ্গিকে স্থির থাকেন নি। কোথাও কোথাও মিলটনের প্রভাব তাঁর লেখায় দেখা গিয়েছে, কোথাও আবার সনেটের ক্ষুদ্রসীমায় তাঁর কবি-চিত্তের মুক্তপক্ষ বিপুল বাসনা অস্বস্তি অনুভব করেছে। সনেটে নিম্নোক্ত বিষয়গুলিকে কবি অবলম্বন করেছেন ; এক। ভারত তথা বাংলার কবিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কাব্যবস্তুর রসাস্বাদন। দুই। জাতীয় সংস্কৃতির কথা। তিন। ভাষা-ছন্দ-কাব্যরূপ ও রসপ্রসঙ্গ। চার। বিদেশী কবি-পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। পাঁচ। প্রেম। ছয়। নীতি ও ধর্মতত্ত্ব। সাত। প্রকৃতি। নানা বিষয় অবলম্বন করে রচিত সনেটগুলিতে কবির ব্যক্তিপ্রাণের আকুতিই মূলত স্পষ্ট হয়ে ধরা দিয়েছে। সমগ্র জীবনব্যাপী সমরতরঙ্গে উদ্বেলিত হতে হতে কবি-হৃদয়ের শক্তি, সাহস ও আশা আজ শ্রান্ত এবং নির্বাণোন্মুখ। সে-সংগ্রাম এখন অতীতের স্বপ্নে আর স্মৃতিতে বিচরণ করেই সমাপ্ত। কবি-অন্তরের অন্দরমহলে আজ এক শ্রান্ত শান্তির কামনা। চতুর্দশপদী কবিতায় এই উৎসমুখী কবিমনই ধরা পড়েছে। চূড়ান্ত কাব্যবিচারে সর্বত্র এ কবিতাগুচ্ছ সনেটের আস্বাদ বহন না করলেও এখানে কবিহৃদয়ের অজস্র মণিরত্ন সঞ্চিত হয়ে আছে। নিজের বুকের রক্ত আর চোখের জলে ভিজিয়ে এই রত্নকণিকা ছড়িয়ে কবি আপন বিদায়-পথকে চিহ্নিত করে গিয়েছেন।

ইতিহাসের বিচার॥ মধুসূদন বাংলা কাব্যে নূতন ইতিহাসের সৃষ্টি করেছেন। যুগসন্ধির কবি ঈশ্বর গুপ্ত বা রঙ্গলালের তুলনায় কবিক্ষমতার দিক থেকেই তিনি যে কেবল বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন তা নয়, কাব্যেতিহাসে নূতন ধারা সৃষ্টি করে ভবিষ্যতের পথ আলোকিত করার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন দ্বিধাহীন।

মধুসূদন মহাকাব্যের রচয়িতা। মেঘনাদবধের কাব্যগুণ যাই থাক না কেন, মহাকাব্যের ধারা কাব্যের ইতিহাসে অতীতের বস্তুতে পরিণত হয়েছে। বাংলা কাব্যে এই ধারা নবীন হলেও পৃথিবীর সভ্য মানুষের মন মহাকাব্যের জগৎ থেকে বহু পূর্বে বিদায় গ্রহণ করেছে। বাংলা সাহিত্যেও এই নবীন ধারা যথেষ্ট এবং উপযুক্ত উত্তরসূরী পায় নি। পরবর্তী কৃত্রিম ও ব্যর্থ মহাকাব্য রচয়িতারা এই ধারাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন নি। তাই অনেকে মনে করেন ধারাসৃষ্টিতে মধুসূদন ব্যর্থ হয়েছেন; অনেক দুর্বলতর কবি বিহারীলাল প্রবর্তিত রোমান্টিক গীতিকবিতাই বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ নির্ণয় করেছে। নির্দ্বন্দ্ব

রোমান্টিক গীতিকবি হিসেবে বিহারীলালের ভূমিকা অবশ্যস্বীকার্য হলেও তারও ভিত্তি রচিত হয়েছে মধুসূদনের হাতে। তিনি মহাকবি এবং গীতিকবি। তাঁর চতুর্দশপদী নিঃসংশয়ে রোমান্টিক গাতিকবিতার অগ্রদূত। এই সনেট রূপের প্রবর্তন করে তিনি বাংলা কাব্যের সমগ্র ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করেছেন। তাছাড়া কবির দুটি কবিতায় ("আশার ছলনে ভুলি" এবং "রেখো মা দাসেরে মনে") লিরিকের পূর্ণমূর্তি প্রথম দেখতে পাই। আবার তাঁর মেঘনাদবধ-তিলোত্তমা-বীরাঙ্গনায় রোমান্টিক মানস নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ক্লাসিসিজম মধুসূদনের প্রতিভার অচ্ছেদ্য অংশ হলেও কবি তার মধ্যে বদ্ধ হয়ে থাকেন নি। রোমান্টিক আত্মপ্রসারণ, সৌন্দর্যচেতনা কবিকে ভবিষ্যতের পথিকৃত করে তুলেছে।

মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্যে চরিত্রজিজ্ঞাসায় মধুসূদন যে নবধারার সৃষ্টি করলেন বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পূর্বসূরীত্ব তার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। কাহিনী-সংগঠনেও তিনি যে নূতন ভঙ্গিকে আমন্ত্রণ জানালেন তা উপন্যাসের নব্যগঠনরীতিকে কিছুটা পথ দেখিয়েছে। কবিতার ছন্দের মুক্তিসাধনে, চিত্রকল্প রচনার নবীনতায়, শব্দচয়নের নিষ্ঠা ও শিল্পবোধে মধুসূদন পুরাতন কাব্যযুগের উপরে যবনিকা পুরোপুরি টেনে দিলেন, নূতন জগতের দ্বার করলেন উন্মুক্ত।

ইতিহাসের বিচার মধুসূদনকে বাংলা সাহিত্যে নূতন জীবনবোধের হোতা-রূপে বিশেষ করে নব্যকাব্যের জনকরূপে নিশ্চয়ই অভিনন্দন জানাবে।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০৩)

পরিচয় ॥ হেমচন্দ্র সমকালে পাঠক ও সমালোচকদের কাছে অত্যুচ্চ প্রতিভা-সম্পন্ন মহাকবি বলে অভিনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু একালের সমালোচক তাঁর সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন, "তিনি ভাষা ও ছন্দে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না, তাঁহার কাব্যের কোন অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল না, বিলাতী কাব্য পাঠে যাঁহারা অভ্যস্ত, তিনি বৈদেশিক কাব্যসাহিত্য হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ তাঁহাদেরই চিত্ত-বিনোদন করিয়াছেন, তিনি সুলভ ভাবুকতায় গা-ভাসাইয়া চলিতেন, ইত্যাদি প্রত্যেক উক্তিই কোন-না-কোন দিক দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য…।" বিদেশী কাব্য-সাহিত্যের অনুসরণ করলেও তাদের অন্তর-প্রেরণাকে আত্মস্থ

করবার মত কিছুমাত্র শক্তি হেমচন্দ্রের ছিল না। মধুসূদনের যে প্রভাব তাঁর কাব্যের উপরে পড়েছে তাও ঐ একই কারণে বহিরঙ্গ ভেদ করে অন্তরের বস্তু হয়ে উঠতে পারে নি।

কাব্যগ্রন্থাবলী॥ নানা ধরনের কাব্য এবং খণ্ড কবিতা-সঙ্কলন হেমচন্দ্র অনেকগুলি লিখেছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য "চিন্তা-তরঙ্গিনী" ১৮৬১ সালে প্রকাশিত হয়। "বীরবাহু" (১৮৬৪) একটি আখ্যান কাব্য। খণ্ড কবিতার সঙ্কলন "কবিতাবলী" (১ম ১৮৭০, ২য় ১৮৮০), "চিত্তবিকাশ" (১৮৯৮) সেকালে খুবই খ্যাতি অর্জন করেছিল। অন্যান্য কাহিনী ও বর্ণনা প্রধান কাব্যের মধ্যে "আশাকানন" (১৮৭৬), "ছায়াময়ী" (১৮৮০), "দশমহাবিদ্যা" (১৮৮২) উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্রের বিপুলাকৃতি মহাকাব্য "বৃত্রসংহার, দুইভাগে প্রকাশিত হয়, ১৮৭৫ এবং ১৮৭৭ সালে।

"চিন্তাতরঙ্গিনী" প্রতিবেশী এক বন্ধুর আত্মহত্যার ঘটনা অবলম্বনে রচিত। রচনাভঙ্গিতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব আছে। ১৮৬১ সালের জুলাই মাসে রচিত গ্রন্থের ভূমিকায় রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদিত হয়েছে "কবিতা কেশরী রায়-গুণাকরের পর কবিতা রচনা করিয়া যশঃলাভ করা অসাধ্য।" তখন কিন্তু মধুসূদনের "তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য" এবং "মেঘনাদবধকাব্যের" প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়ে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। বিস্ময়কর যে হেমচন্দ্রের চোখ সেদিকে পড়ে নি। হেমচন্দ্রের এই প্রথম রচনাটির স্থানে স্থানে আন্তরিকতার সুর বাজলেও কাব্য হিসেবে এটি একেবারে মূল্যহীন।

আখ্যান কাব্য "বীরবাহু" চিন্তাতরঙ্গিনীর তুলনায় কিছু পরিণত রচনা। ভূমিকায় কবি বলেছেন, "উপাখ্যানটি আদ্যোপান্ত কাল্পনিক, কোন ইতিহাস-মূলক নহে। পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।" কনোজের যুবরাজ বীরবাহু কিরূপ বীরত্বের সঙ্গে পাঠান কর্তৃক অপহৃত পত্নী হেমলতাকে উদ্ধার করেছিল সে ঘটনাই এ কাব্যের কাহিনীভিত্তি। মুসলমান বিরোধী হিন্দু জাতীয়তার প্রচারই এ গ্রন্থের লক্ষ্য। যে স্বাজাত্যবোধ প্রচারের জন্য হেমচন্দ্রের এত খ্যাতি তাও যে সমকালীন সঙ্কীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িক বুদ্ধি অতিক্রম করতে পারে নি একথা দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয়।

হেমচন্দ্রের "আশাকানন" একখানি রূপককাব্য (allegory)। কাব্যের

ভূমিকায় লেখক গ্রন্থটির পরিচিতি প্রসঙ্গে বলেছেন, "আশাকানন একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য। মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তিসকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। ইংরাজী ভাষায় এরূপ রচনাকে 'এলিগারি' কহে।" কাব্যের এই ভঙ্গিটি নূতন এবং য়ুরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবেই পরিকল্পিত, কিন্তু কাব্য-সৌন্দর্যের দিক থেকে রচনাটি অকিঞ্চিৎকর।

কবির "ছায়াময়ী" কাব্যটি দান্তের ডিভাইন কমেডিয়ার অনুসরণে রচিত। রচনাভঙ্গির দুর্বলতা সত্ত্বেও গ্রন্থটি একেবারে মৌলিকতা বর্জিত নয়। দান্তের গ্রন্থে নরক, নরকপ্রায়শ্চিত্ত ও স্বর্গ সম্বন্ধে যে-সব কথা লিখিত হয়েছে তা বাইবেলের অনুসরণে ভক্ত খ্রীষ্টানের কথা। হেমচন্দ্র হিন্দু পৌরাণিক আদর্শের দ্বারা নবীনতা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন।

"দশমহাবিদ্যা" পূর্বোক্ত কাব্যগুলির তুলনায় বিশিষ্ট। শক্তির দশরূপকে প্রাচীন তন্ত্রশাস্ত্রে দশমহাবিদ্যা বলা হয়েছে। কালী, তারা, ষোড়শী, ছিন্নমস্তা, প্রভৃতি এই দশরূপের অন্তর্গত। সতীহারা হয়ে মহাদেব যখন চিন্তিত ও দুঃখিত হয়ে পড়লেন তখন নারদের পরামর্শে তিনি বুঝলেন সতীর মৃত্যু হতে পারে না। তিনি বিভিন্ন রূপে দশ দিকে বিরাজিতা। দশমহাবিদ্যার বর্ণনায় ভারতচন্দ্রপ্রমুখ পুরানো কবিদের আগ্রহ দেখা যেত। হেমচন্দ্র কিন্তু কাব্যের প্রাচান বিষয়বস্তুর মধ্যে আধুনিক যুগসুলভ যুক্তিবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি দেবীর দশরূপের মধ্যে মানব-সভ্যতার দশটি বিভিন্ন স্তরের অস্তিত্ব খুঁজেছেন। রূপনির্মিতির দুর্বলতায় কবির পরিকল্পনা অবশ্য কাব্যরূপে বিশেষ সাফল্যলাভ করে নি।

হেমচন্দ্র খণ্ড কবিতায় মহাকাব্য-আখ্যানকাব্যের তুলনায় অধিক পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। বেশির ভাগ কবিতায় অবশ্য উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতার মত ভাষায় কবির স্বাজাত্যবোধ প্রকাশ পেয়েছে। বহু কবিতায় তিনি রাজপুত-চারণ এবং মারাঠী ব্রাহ্মণের পরোক্ষ জবানীতে স্বাধীনতার কামনা ব্যক্ত করেছেন। আসলে কবি ইংরেজ-অধীন ভারতের কথাই বলতে চেয়েছেন। কবির কণ্ঠে উত্তেজনা যতটা প্রকাশ পেয়েছে কাব্যোচিত রূপ-চিত্রণ ততটা সফল হয় নি।—

আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত—অন্য কব কি ?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন. তারাও প্রধান.

দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।
বাজ রে শিঙ্গা, বাজ্ এই রবে,
সবাই স্বাধীন, এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

যে-সব খণ্ড কবিতায় কবি রাজনৈতিক বা সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গরস ফোটাতে চেয়েছেন, সে-সব ক্ষেত্রে তিনি বেশ সাফল্য অর্জন করেছেন। ব্যঙ্গাত্মক কবিতা রচনায় হেমচন্দ্রের বেশ দক্ষতা ছিল। সম্ভবত তাঁর কবিচিত্তে রোমান্টিক ভাবোচ্ছ্বাসের পরিমাণ একান্ত স্বল্প থাকায় এই সাফল্য এসেছে। কয়েকটি কবিতায় হেমচন্দ্র সহজ সরল ভাষায় ব্যক্তি বেদনার কথা বলেছেন। অন্ধ-কবির এই আকুতিতে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ আলোড়িত হয় না ঠিকই, কিন্তু অকৃত্রিম অনুভূতি এবং সহজ প্রকাশ-ভঙ্গির গুণে এর গীতি আবেদন অস্বীকৃত হবার নয়—

প্রতিদিন অংশুমালী, সহস্র কিরণ ঢালি,
পুলকিত করিবে সকলে ;
আমার রজনী শেষ হবে না কী? হে ভবেশ!
জানিব না দিবা কারে বলে?
আর না সুধার সিন্ধু আকাশে দেখিব ইন্দু
প্রভাতে শিশির বিন্দু জলে,
শিশির বসন্ত কাল আসে যাবে চিরকাল
আমি না দেখিব কোন কালে!

হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" সমকালে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছিল। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্রকে মধুসূদনের সমকক্ষ কবি বলে ঘোষণা করেছিলেন। নিঃসন্দেহে এ সিদ্ধান্ত চরম বিচারবিভ্রাটের নিদর্শন। বৃত্রসংহারের সহজ যাত্রাধর্মী বীররসে, বর্ণনার পরিচিত ভঙ্গি ও ছন্দের তারল্যে, বিচিত্র রসের উত্তেজনাকর আবেদনে সস্তা স্বাজাত্যবোধে পাঠকসাধারণ মেতে উঠেছিল। কিন্তু রসজ্ঞ সমালোচকও যে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন এ খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার।

বৃত্রসংহার পুরাণকাহিনী অবলম্বনে রচিত, তবে এতে কবিকল্পিত বহু বিষয়ের সংযোজন ঘটেছে। সর্বোপরি হেমচন্দ্র প্রাচীন পৌরাণিক বিষয়ের উপরে উনিশ শতকের একটি ব্যাখ্যার আরোপ করতে চেয়েছেন। সে ব্যাখ্যাটি

স্বদেশপ্রেম ঘটিত। সংক্ষেপে বৃত্রসংহারের কাহিনীটি এখানে বিবৃত হল। শিববলে বলীয়ান বৃত্রের কাছে পরাজিত দেবতারা পাতালে পলায়িত। দানবেরা স্বর্গ অধিকার করেছে। বৃত্রপত্নী ঐন্দ্রিলা আপন অহঙ্কার তৃপ্ত করবার জন্য শচীকে দাসী রূপে পেতে চাইল। ইন্দ্রপুত্র জয়ন্তকে পরাজিত করে বৃত্রপুত্র রুদ্রপীড় শচীকে বন্দী করে নিয়ে এল। ঐন্দ্রিলা কর্তৃক শচী অপমানিত হলে কৈলাসে মহাদেব বিচলিত হলেন, বৃত্রের উপর থেকে আপন আশীর্বাদ প্রত্যাহার করে নিলেন। তপস্যায় রুদ্রকে সন্তুষ্ট করে ইন্দ্র বৃত্রের বধোপায় জানতে পারল। দধীচির অস্থি নিয়ে এসে বজ্র নির্মিত হল। অবশেষে দীর্ঘস্থায়ী ভয়ানক যুদ্ধের পরে বজ্রাঘাতে বৃত্রাসুর প্রাণত্যাগ করল।

ঘটনায় এবং বিন্যাসে বৃত্রসংহারে মহাকাব্যের লক্ষণ আছে। জগৎ-বাসীর কল্যাণে দধীচির আত্মত্যাগ, স্বর্গের অধিকার নিয়ে দেব-দানবের সংগ্রাম, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল, সূর্যলোক-নক্ষত্রলোক, কুমেরু-সুমেরু প্রভৃতির বর্ণনা, ঘটনার প্রাচুর্য, বীর ও রৌদ্র রসের ছড়াছড়ি—মহাকাব্যের উপযোগী বিপুলতা ও গাম্ভীর্যের সমস্ত উপকরণই এখানে সংগৃহীত হয়েছিল। তিলোত্তমাসম্ভব এবং মেঘনাদবধকাব্য থেকে যেমন অনেক কিছুই হেমচন্দ্র সরাসরি গ্রহণ করেছিলেন, তেমনি ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের প্রতি অটল আনুগত্যও তিনি দেখিয়েছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের মধ্যে সেই শক্তি ছিল না যাতে এই সব উপকরণ আত্মসাৎ করে মহাকাব্যের আস্বাদ সৃষ্টি করতে পারেন। প্রাণহীন বিবৃতি, অকারণ রৌদ্ররস এবং অগভীর কারুণ্যে কাব্যটি পরিপূর্ণ। সত্যকার ক্লাসিক প্রেরণার লেশমাত্র ছিল না হেমচন্দ্রের, বৃত্রসংহারে তাই কৃত্রিম ক্লাসিকতার অনুসরণ চলেছে। স্বাদেশিকতার প্রচারের দিক থেকেও লেখকের দ্বিধা সর্বত্র প্রকট। মধুসূদনের অনুসরণে তিনি দানবের প্রতি সমর্থন জানাতে চেয়েছেন, কিন্তু হিন্দুর স্বাভাবিক প্রবণতাবশে দেবতাদের প্রতিই তাঁর হৃদয় ধাবিত হয়েছে। রাজ্যহারা দেবতারা এবং আক্রান্ত দেশ রক্ষায় তৎপর দানবেরা তাঁর জাতীয়তাবাদী সহানুভূতিকে দ্বিধাবিভক্ত করেছে।

চরিত্র-সৃষ্টির দিক থেকেও হেমচন্দ্র ব্যর্থ হয়েছেন। বৃত্রের এই চিত্রটি বীর্যপূর্ণ,—

> ত্রিনেত্র, বিশালবক্ষ, অতি দীর্ঘকায়,
> বিলম্বিত ভুজদ্বয়, দোদুল্য গ্রীবায়
> পারিজাত পুষ্পহার বিচিত্র শোভায়।

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস;
পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ—

কিন্তু শিবভক্তির অতিরেক, নারীসুলভ পুত্রস্নেহকাতরতা, যাত্রাধর্মী রৌদ্ররস তাকে সর্ব মাহাত্ম্য বঞ্চিত করেছে। তার মৃত্যু ঘটেছে, কিন্তু সে মৃত্যুতে ট্রাজেডির হাহাকার ও গৌরব নেই। ঐন্দ্রিলা চরিত্রে গর্ব ও তেজ কিছু প্রকাশ পেয়েছে। রুদ্রপীড় বীরত্ব দেখাবার জন্য যাত্রাদলের নায়কের মত চাঞ্চল্য প্রকাশ করেছে; তার পত্নী ইন্দুবালা বাঙালী পরিবারের অশ্রুমুখী দুর্বলা নারীতে পরিণত হয়েছে। দেবচরিত্রগুলিও মোটেই প্রাণবন্ত নয়।

কবি কাব্যটির কোথাও কোথাও অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করেছেন, কিন্তু বীর ও রৌদ্ররসাত্মক স্থান ছাড়া অন্যত্র মিত্রাক্ষরের বৈচিত্র্যের আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। তাঁর মিত্রাক্ষর ছন্দ তরল এবং সঙ্গীতবিহীন। তাঁর অমিত্রাক্ষর মিলহীন পয়ার মাত্র—যতিপাতের স্বাধীনতা সেখানে নেই। ধ্বনিঝঙ্কার নেই, ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা নেই। আসলে মধুসূদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষরের অন্তর-তাৎপর্যটি হেমচন্দ্র অনুধাবনই করতে পারেন নি।

ইতিহাসের প্রশ্ন॥ শুধুমাত্র সৃষ্টিক্ষমতার খর্বতার জন্যই নয়, বাংলা কাব্যের ভবিষ্যৎ পথনির্দেশেও হেমচন্দ্র ইতিহাসের দাবি মানেন নি। কৃত্রিম ক্লাসিকতার অনুসরণ করে তিনি সমকালে খ্যাতি পেয়েছেন, কিন্তু একাগ্র চিত্তে গীতিকবিতা-খণ্ডকবিতার চর্চা করে বাংলা কবিতার স্বাভাবিক গতিকে তরান্বিত করতে পারেন নি। মধুসূদনের কাব্যের যে ধারাটি স্বাভাবিক ভাবে মধুসূদনের নিজের মধ্যেই সমাপ্ত তার পথ ধরে হেমচন্দ্র এগিয়েছেন, যে ধারাটি ভবিষ্যতের সম্পদ, তাকে বিকশিত করে তোলার জন্য যত্ন পান নি।

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)

পরিচয়॥ নবীনচন্দ্র আখ্যানকাব্য, খণ্ডকবিতা এবং মহাকাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি নিজেকে হেমচন্দ্রের শিষ্যশ্রেণীয় বলে আখ্যাত করতেন। মধুসূদনের দ্বারাও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন; অবশ্য স্বল্প শক্তির অধিকারী কবি মহাকবির ভাব ও রচনাভঙ্গির যতটা অনুসরণ করতে পারেন ততটাই তিনি করেছেন। নবমানবতাবাদের মন্ত্র তিনি অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলেন, মধ্যযুগীয় ধর্ম-সংস্কারকে পরিত্যাগ করতে পারেন নি। একদিকে নব্যযুক্তিবাদ অপরদিকে উচ্ছ্বসিত ভক্তির

মধ্যে পড়ে নবীনচন্দ্র আন্দোলিত হয়েছেন; তাকে সমন্বিত করবার শক্তি তাঁর ছিল না। নবীনচন্দ্রের কবি-স্বভাবে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের প্রাচুর্য ছিল। হেমচন্দ্রের কবিপ্রতিভার মূলেই ছিল কাব্যোচিত আবেগের অভাব, নবীনচন্দ্রের মধ্যে অভাব তো ছিলই না, ছিল অতিরেক আর ছিল না তাকে নিয়ন্ত্রিত করবার মত শৈল্পিক সংযম। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের শিল্পী-স্বভাবের এই প্রধান দিকটির আলোচনা প্রসঙ্গে ইংরেজ কবি বায়রনের সঙ্গে তাঁর তুলনা করেছেন, "নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ।···এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বাইরনের লিপি-প্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। চরিত্রের আশ্লেষণে দুইজনের একজনও কোন শক্তি প্রকাশ করেন নাই—বিশ্লেষণে দুইজনেরই কিছু শক্তি আছে। নাটকের যাহা প্রাণ—হৃদয়ে হৃদয়ে "ঘাত প্রতিঘাত" দুইজনের একজনের কাব্যে তাহার কিছুমাত্র নাই। কিন্তু অন্যদিকে দুইজনেই অত্যন্ত শক্তিশালী। ইংরেজিতে বাইরনের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাবসকল, আগ্নেয়গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে তখন তাহার বেগ অসহ্য।" এই ভাবোচ্ছ্বাসকে সংযত, সংহত করে, কাব্যরূপদানই কবির কাজ; নবীনচন্দ্র তাতে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছেন।

কাব্যগ্রন্থাবলী॥ নবীনচন্দ্র প্রথম খণ্ডকবিতা লিখতে শুরু করেন। খণ্ড কবিতার সঙ্কলন "অবকাশরঞ্জিনী" নামে দুই ভাগে প্রকাশিত হয় (১৮৭১ এবং ১৮৭৮)। তিনি "পলাশীর যুদ্ধ" (১৮৭৫), "রঙ্গমতী", "ক্লিওপেট্রা" প্রভৃতি আখ্যান-কাব্য; "রৈবতক" (১৮৮৭), "কুরুক্ষেত্র" (১৮৯৩), "প্রভাস" (১৮৯৬) নামক মহাকাব্য এবং খৃষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে কয়েকটি কাব্যও রচনা করেন। তাঁর আত্মজীবনী "আমার জীবন"ও উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা।

প্রথম ভাগ "অবকাশরঞ্জিনী"র কবিতাগুলি অপরিণত কৈশোরের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। দ্বিতীয় ভাগ তুলনামূলক ভাবে কিছু পরিণতি লাভ করেছে। এই গ্রন্থে সঙ্কলিত খণ্ড কবিতাগুলির কতকাংশ গীতিকবিতার মর্যাদা পেতে পারে। নবীনচন্দ্র অবকাশরঞ্জিনীর প্রথম ভাগের জন্য তাঁর আত্ম-জীবনীতে বাংলা ভাষার প্রথম গীতিকবিতার মর্যাদা দাবি করেছেন। এ দাবি গ্রাহ্য হবার নয়। প্রথমত, মধুসূদনের "আশার ছলনে" এবং "রেখো মা দাসেরে মনে" বহুপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে, সনেটগুলিও এর পূর্বে আত্মপ্রকাশ করেছে। দ্বিতীয়ত, নব্য গীতিকবিতার মধ্যে কবির ব্যক্তি-আমির যে আর্তি

প্রত্যাশিত এখানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তবে দ্বিতীয়ভাগে গীতিকবিতার লক্ষণ আছে। তার পূর্বে বিহারীলালেরও অনেক রচনা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। অবকাশরঞ্জিনীর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলিতে হেমচন্দ্রের প্রভাব আছে। অবশ্য হেমচন্দ্রের উত্তেজনা নবীনচন্দ্রে নেই। দুই-একটি কবিতায় হেমচন্দ্রের গদ্যাত্মক মঞ্চবক্তৃতার ঢঙ্ থেকে মুক্ত হয়ে তিনি দেশাত্মবোধকে প্রকৃত কাব্যরূপে বিধৃত করতে সফল হয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে "অশোকবনে সীতা" কবিতার নাম করা চলে। কবির নিকটে দুঃখিনী পরাধীনা ভারতমাতা অশোকবনে বন্দিনী সীতার মূর্তির সঙ্গে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে—

জিজ্ঞাসিনু—"বল মাতা, কে তুমি দুঃখিনী ?
এমন বিষাদমূর্তি কিসের কারণ ?"
বলিল রমণী অশ্রু মুছিয়া অঞ্চলে,—
"দুঃখিনী ভারতলক্ষ্মী আমি, বাছাধন !
আমিই অশোকবনে সীতা বিষাদিনী।"

অবকাশরঞ্জিনীর কবি হেমচন্দ্রের ন্যায় ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় কিছুমাত্র সফল হন নি। তাঁর কবিচিত্তের আবেগের আতিশয্যই এর জন্য দায়ী। তবে প্রেমের কবিতা রচনায় কবির কিছু বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। দেহভাবনাময়, পরিমার্জনাহীন রূপবিহ্বলতা, প্রগল্‌ভ মদির উচ্ছ্বাস এই কবিতাগুলিতে প্রকাশিত।—

শর্বরি ! তোমার অঙ্কে চাপিয়া হৃদয়,
হাসিয়াছি, কাঁদিয়াছি,
মরিয়াছি, বাঁচিয়াছি,
দহিয়াছি, সহিয়াছি তীব্র জ্বালারাশি
শর্বরি ! কহ না তুমি কেন ভালবাসি ?

নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধে" বিষয়বস্তুর দিক থেকে নূতনত্ব আছে। রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র প্রধানত পৌরাণিক বিষয় অথবা রাজস্থানের পুরাতন কাহিনী অবলম্বন করে স্বদেশপ্রেমের কথা বলেছেন। নবীনচন্দ্র কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ শক্তিকে ঘটনার মধ্যে স্থান দিলেন। ইংরেজ ও সিরাজের যুদ্ধকাহিনী অবলম্বন করে পলাশীর যুদ্ধ রচিত হল। জগৎশেঠ প্রভৃতির ষড়যন্ত্রে এবং মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজের পরাজয় ও মৃত্যু হল, বাংলাদেশ

ইংরেজের করতলগত হল, পলাশীর যুদ্ধের এই-ই বিষয়। নবীনচন্দ্রের মনে সমকালীন বুদ্ধিজীবীদের মত ইংরেজ-ভক্তির প্রাচুর্য ছিল। স্বাধীনতার কামনা এবং সাম্রাজ্যবাদী রাজশক্তির প্রতি আস্থা এই দুটি বিপরীত কোটির প্রত্যয় এঁদের মধ্যে পাশাপাশি বিরাজ করেছে। পলাশীর যুদ্ধে দেশপ্রেমিক মোহনলাল যথেষ্ট বীরত্ব দেখিয়েও ইংরেজ বিজয়ের মধ্যে শুভ ভবিষ্যৎ দেখে উল্লাস প্রকাশ করেছেন

"রঙ্গমতী" বা রাঙ্গামাটি চট্টগ্রামের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। তার পট-ভূমিকায় একটি কাল্পনিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে এই কাব্যে। বীরেন্দ্র-কুসুমিকার প্রণয়কে অবলম্বন করে বীরেন্দ্রের বীরত্বের নানা বর্ণনা এতে স্থান পেয়েছে; মগ-মুঘল পোর্তুগীজদের যুদ্ধ, ব্যাঘ্রাদি হত্যা থেকে শুরু করে শিবাজীর দ্বারা অনুপ্রাণিত স্বাধীনতার বাসনাকে তরল ও উচ্ছ্বসিত ভাষায় এ কাব্যে প্রকাশ করা হয়েছে। কাব্য হিসেবে এটির মূল্য সামান্য। তেমনি সামান্য মূল্য "ক্লিওপেট্রা"রও। শেষোক্ত কাব্যের বিষয়বস্তু বাংলা সাহিত্যের পক্ষে অভিনব। ভাবকল্পনার তারল্য এবং রচনার শিথিলতা এর কাব্যোৎকর্ষের অন্তরায় হয়েছে।

নবীনচন্দ্রের "রৈবতক," "কুরুক্ষেত্র," "প্রভাস" এই তিনটি কাব্য আসলে একটি বিরাট কাব্য-কল্পনার তিনটি অংশ। তিনটি অংশ হলেও এদের স্বয়ংসম্পূর্ণতার দাবিও অবহেলা করবার নয়। কবি মহাকাব্যের আদর্শে এই কাব্যত্রয় রচনার পরিকল্পনা করেছিলেন; মহাকাব্যে জীবনের যে বিস্তৃত, বিচিত্র ও গম্ভীর-মহান সুর ধ্বনিত হয় এই কাব্যগুলির মধ্যেও তার অনেকখানি অনুভব করা যায়। কিন্তু মহাকাব্যোচিত কল্পনা কবির রচনাভঙ্গির শিথিল তারল্যের জন্য উপযুক্ত মহান-গম্ভীর আস্বাদ বহন করে আনে না।

ঊনবিংশ শতকের কবিরা রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণের কাহিনী অবলম্বন করে কাব্য রচনা করেছেন। কিন্তু প্রাচীন বিষয়ের মধ্যে তাঁরা নানাবিধ নূতন ভাবনা ও কল্পনা প্রবেশ করিয়েছেন। নবীনচন্দ্রও সেই ধারানুযায়ী মহাভারতের কাহিনী এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরিত্রকে অবলম্বন করলেন এবং আপন শিক্ষা, রুচি, ভাবনা ও কল্পনা অনুযায়ী তাকে পরিবর্তিত করলেন। নবীনচন্দ্র-পরিকল্পিত নব মহাভারতের রূপটি এখানে সংক্ষেপে বিবৃত হল। ভারতে আর্য-অনার্যের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত লেগেই আছে। সমগ্র দেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত। প্রাচীন সরল বৈদিক ধর্মের অবসান ঘটেছে।

স্বার্থনিরত ব্রাহ্মণগণ নানাবিধ জটিল পূজার্চনার ব্যবস্থা করেছে। ভারতে—

এক ধর্ম এক জাতি একমাত্র রাজনীতি
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত
জননার খণ্ডদেহ হবে না মিলিত।

এই মহামিলন সাধনের উদ্দেশ্যেই শ্রীকৃষ্ণ মানবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি গীতায় বর্ণিত নিষ্কাম কর্ম এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কল্পিত অনাবিল প্রেমভক্তির মধ্য দিয়েই এই আদর্শ ঐক্যবদ্ধ ভারতরাজ্য সৃষ্টি করবেন। ব্যাসের জ্ঞান, অর্জুনের শক্তি, সুভদ্রার সেবা, শৈলজার প্রেম এই কার্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রধান সহায়। অপরদিকে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য রক্ষণশীলতা এবং হিংসার প্রতিমূর্তি দুর্বাসা এই আদর্শের প্রধান বাধা। নবীনচন্দ্রের পরিকল্পিত মহাভারত "ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত" নামে অভিহিত হয়েছে। নবীন-চন্দ্রের মধ্যে একদিকে আছে ঐতিহাসিক চেতনা, যুক্তিবোধ এবং স্বাদেশিকতা, ঐক্যবদ্ধ ভারত গঠনের স্বপ্ন, ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার, পুরাণকাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিকতার সন্ধান, কৃষ্ণ-জীবনের কোন কোন অলৌকিক পর্যায়ের যুক্তিপ্রবুদ্ধ মানবিক ব্যাখ্যা। এখানে নবীনচন্দ্রের ভাবচিন্তায় ঊনবিংশ শতকীয় নব্য মানবতাবোধ প্রকাশিত। অপরদিকে গীতার নিষ্কাম কর্ম এবং বৈষ্ণবীয় প্রেমধর্মের মাহাত্ম্যকীর্তনের মধ্যে ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন লক্ষণীয়।

"রৈবতক" কাব্যে কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রা ও অর্জুনের প্রেম ও বিবাহের কাহিনী বর্ণিত। বলরাম দুর্যোধনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহ দিতে চেয়ে-ছিলেন। দুর্যোধন সসৈন্যে দ্বারকায় এল। কিন্তু সুভদ্রার স্বীকৃতি ও সাহচর্যে অর্জুন সকলকে পরাজিত করে সুভদ্রাকে বিবাহ করল। দুর্বাসা প্রথমাবধি এই বিবাহের বিরোধী ছিল, কিন্তু তার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। অর্জুন কৃষ্ণের বাহুবলের প্রতীক, সুভদ্রা সেবার। কৃষ্ণবিরোধী দুর্বাসা শক্তি ও সেবার এই সম্মিলনের মধ্য দিয়ে কৃষ্ণের বলবৃদ্ধির বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। "কুরুক্ষেত্র" কাব্যে চক্রব্যূহের মধ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় অর্জুনের বীরপুত্র অভিমন্যুর মৃত্যু-কাহিনা বিবৃত হয়েছে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে অর্জুনের বুদ্ধি জড়তামুক্ত হল। কৃষ্ণ-প্রচারিত তত্ত্ববুদ্ধিতে তার চিত্ত উদ্বুদ্ধ হল; আর সুভদ্রার সেবাধর্ম বিশ্বব্যাপ্ত মহিমা লাভ করল—"মাতৃস্নেহপূর্ণ বুকে আজি দেখিতেছি সব অভিমন্যু উত্তরা আমার"। "প্রভাস" কাব্যে কৃষ্ণের অন্ত্যলীলা বর্ণিত হয়েছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ হয়েছে, খণ্ড-বিখণ্ড ভারত ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, আর্য-অনার্যের মিলন ঘটেছে। "গৃহে গৃহে কৃষ্ণমূর্তি, হৃদয়ে হৃদয়ে। মুখে

মুখে কৃষ্ণনাম যুগযুগান্তর।" কিন্তু দুর্বাসার ষড়যন্ত্র তখনও চলেছে। প্রভাসে দুর্বাসার পাপের ফল দেখান হয়েছে। এদিকে কৃষ্ণের যাদব বংশেও নানারূপ অনাচার প্রবেশ করেছে। পারস্পরিক রেষারেষি এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে যদুবংশের বিলোপ ঘটল। বলরাম ভারতের ঐক্যবদ্ধ নব সভ্যতার বাণী বহন করে পশ্চিম পৃথিবীতে চলে গেলেন। এতকাল বাসুকি এবং জরৎকারু কৃষ্ণের বিরোধিতা করেছে। বাসুকি সুভদ্রার প্রতি এবং জরৎকারু কৃষ্ণের প্রতি কামনাতুর ভালবাসা পোষণ করত। সেই প্রেমের ব্যর্থতাই তাদের কৃষ্ণের শত্রুতে পরিণত করেছিল। প্রভাস কাব্যে তাদের প্রেম দেহভাবনা ও ব্যক্তিচেতনা মুক্ত হয়ে বৈষ্ণবীয় কৃষ্ণভক্তিতে নিমজ্জিত হল।

কাব্য তিনটিতে কাহিনী অপেক্ষা তত্ত্বালোচনা বেশি। ভক্তির প্রবলতা ও তাত্ত্বিক বক্তৃতা সংঘাতসঙ্কুল কাহিনীরসকে দানা বাঁধতে দেয় নি। চরিত্র-গুলির মধ্যে কৃষ্ণ, অর্জুন এবং ব্যাসদেব মূর্তিমান দার্শনিক তত্ত্ব, তাদের রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে হয় না। সুখে-শোকে যাদের হৃদয় বিচলিত, যারা ভালোয় মন্দে মিশ্রিত, তারাই মানবচরিত্র হিসেবে বিশ্বাসযোগ্য এবং সার্থক। দুর্বাসা পাষণ্ডচরিত্র; কবি তাকে কলুষ কালিমায় আবৃত করেছেন। তবুও তার চরিত্রের মানবোচিত দুর্বলতা এবং সক্রিয় চঞ্চলতা তাকে প্রাণময় করে তুলেছে। বাসুকির চরিত্রটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। অনার্য বীরের দৃপ্ত পৌরুষ তার চরিত্রে সুন্দর ফুটেছে। নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সুভদ্রা এবং শৈল সম্পূর্ণই তত্ত্ব। সত্যভামার চঞ্চলতায় প্রাণের স্পর্শ লেগেছে; সুলোচনার ছেলেমানুষীতে কিন্তু শুধুই তারল্য। জরৎকারুর চিত্রে তেজস্বিনী, রূপগর্বিতা প্রতিহিংসাপরায়ণা এবং কামনাতুর নারীমূর্তি ভালই ফুটেছে।

ইতিহাসের প্রশ্ন॥ প্রসঙ্গত কিছু খণ্ডকবিতা-গীতিকবিতা লিখলেও নবীনচন্দ্র মূলত আখ্যানকাব্য-মহাকাব্যের কবি। মধুসূদনের মহাকাব্য রচনার প্রায় তিরিশ বছর পরে নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উপন্যাস-সাহিত্যের প্রকৃত জন্ম এবং বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছে। কাব্যরাজ্যে বিহারীলাল এবং তাঁর ধারাবাহীরা গীতিকাব্যের সম্ভার নিয়ে ভবিষ্যতের পথনির্দেশ করছেন। নবীনচন্দ্র তখনও কৃত্রিম ক্লাসিকতার অনুবর্তন করে চলেছেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যসাধনা ক্ষমতার স্বল্পতার জন্য যেমন অনেকাংশে ব্যর্থ, ইতিহাসের গতিপথ না চিনবার ফলে তেমনি ভবিষ্যতের কাছে মৃত।

মহাকাব্য-আখ্যানকাব্য ধারার পরিণতি

অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী (১৮৫০-৯৮)॥ অক্ষয় চৌধুরী দু'খানি রোমান্টিক গাথা কাব্য লিখেছিলেন ; "উদাসিনী" (১৮৭৪) এবং "সাগর সঙ্গমে" (১৮৮১) নামে। বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের সঙ্গে রোমান্টিক গাথাকাব্যের অনেক পার্থক্য। গীতিকবিতার সঙ্গে কাহিনীরসের সম্মিলনের মধ্য দিয়ে এই জাতীয় কাব্যের জন্ম। বীররসাত্মক আখ্যানকাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের জ্ঞাতিত্ব, আর রোমান্টিক গাথাকাব্য গীতিকবিতার আত্মীয়। বঙ্কিমচন্দ্র "ললিতা তথা মানস" (১৮৫৬) কাব্যে এর সূত্রপাত করেন। কিন্তু এর বিকাশ ঘটল অক্ষয় চৌধুরীর হাতে। তাঁর "উদাসিনী" কাব্যটি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। একটি মধুর প্রেমোপাখ্যান এ কাব্যের অবলম্বন। বাচনভঙ্গিতে গীতি-কাব্যোচিত ভাবোৎসার লক্ষ্য করা যায়। নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যগুলি রচিত হবার পূর্বে "উদাসিনী" প্রকাশিত হয়েছিল। নবীনচন্দ্রের কাব্যে উচ্ছ্বাসের আধিক্য আছে। তা দেখে কেউ কেউ নবীনচন্দ্রের উপরে অক্ষয় চৌধুরীর প্রভাবের সিদ্ধান্ত করেছেন। কিন্তু নবীনচন্দ্রের বীররসাত্মক কাব্যের সুবৃহৎ পরিকল্পনার আড়ম্বরের সঙ্গে এর মূলগত পার্থক্য রয়েছে। অক্ষয় চৌধুরীর গাথাকাব্য ইতিহাসের দিক থেকে অগ্রসর একথা স্বীকার্য। অক্ষয়চন্দ্র "ভারত গাথা" নামে একটি স্বাদেশিকতামূলক গীতিকবিতার সঙ্কলনও প্রকাশ করেছিলেন।

ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৬—১৮৯৭)॥ হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের তুলনায় অনেক স্বল্পখ্যাত ঈশানচন্দ্র বাংলা কাব্যের ভবিতব্যকে চিনেছিলেন। তাঁর প্রকাশিত চারখানি কাব্যের মধ্যে "চিত্তমুকুর" (১৮৭৮), "বাসন্তী" (১৮৮০) এবং "চিন্তা" (১৮৮৭) এই তিনখানিই গীতিকবিতা সঙ্কলন। এক-মাত্র "যোগেশ" (১৮৮১) আখ্যানকাব্য। কিন্তু রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের তুলনায় এ কাব্য একেবারে স্বতন্ত্র জাতের। রোমান্টিক আত্মকথন এর মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। বিবাহিত যোগেশের অপর বিবাহিতা নারী মন্দাকিনীর প্রতি ব্যর্থ প্রেমের তীব্র জ্বালাময় উপলব্ধি ও বেদনাতুর ট্র্যাজেডিই এ-কাব্যে ভাষারূপ পেয়েছে। কাব্যটির রচনাভঙ্গিতে অনেকাংশে সাফল্য এসেছে ভাব-গভীরতা, আন্তরিকতা এবং ভাষাগত সংযমের সংমিশ্রণের ফলে। যোগেশ চরিত্রটিকে কবি নিজেই তাঁর অন্তরাত্মার অভিন্ন সুহৃদ বলে বর্ণনা করেছেন। যোগেশের হাহাকারে তাঁর ব্যক্তিচিত্তের আর্তনাদ প্রতিফলিত

হয়েছে। এ-বিষয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি তাৎপর্যপূর্ণ, "যে কারণে তিনি মাত্র ৪২ বৎসর বয়সে নিজ হাতে নিজের জীবনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার যাবতীয় কাব্যগ্রন্থের মূলে সেই কারণই ছিল; অধিকাংশ কবিতাই, বিশেষ করিয়া যোগেশ কাব্যখানি, একটা অন্তর্গূঢ় জ্বালায় জর্জরিত। সক্ষম রচনা বলিয়াই সেগুলি পাঠকের মনেও জ্বালা ধরাইয়া দেয়।"

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) ॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বৃত্র-সংহারে"র দ্বিতীয় ভাগ যে বৎসর প্রকাশিত হয় সেই একই বৎসর ১৮৭৭ সালে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত উদ্ধার" নামক পূর্ণাঙ্গ রঙ্গকাব্য প্রকাশিত হয়। অন্তঃসারশূন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করে কাব্যটি রচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বীররসাত্মক মহাকাব্যের এটি একটি উৎকৃষ্ট প্যারোডি। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত এই কাব্যটি ব্যঙ্গরচনা হিসেবে উচ্চস্তরেরই শুধু নয়, বাংলা মহাকাব্যের চরম জনপ্রিয়তার যুগে (বঙ্কিমচন্দ্রও যখন বৃত্রসংহারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ) তার প্রতি এই ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ পরোক্ষত সেই ধারার প্রতি কাব্যেতিহাসের অস্বীকৃতির চিহ্নই যেন বহন করে।

বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪)

পরিচয় ॥ বিহারীলাল চক্রবর্তীর পূর্বে আধুনিক গীতিকবিতা বিচ্ছিন্ন ভাবে দু'একটি রচিত হয়েছে মাত্র। অবশ্য চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কথা স্বতন্ত্র। মধুসূদনের হাতেই বাংলা গীতিকবিতার উদ্ভব হলেও তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা বিহারীলাল চক্রবর্তীর কবিতায়। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যে ঐতিহাসিকের দৃষ্টির পরিচয় আছে,—"বিহারীলাল তখনকার ইংরেজী ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসঙ্কুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না,—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত-উক্তিতে বিশ্বহিত, দেশহিত অথবা সভা মনোরঞ্জনের কোন উদ্দেশ্য দেখা গেল না। এই জন্য তাঁহার সুর অন্তরঙ্গরূপে হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া সহজেই পাঠকের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া আনিল।" তিনি নিজে যা অনুভব করেছেন, প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে যে-সৌন্দর্যের উপলব্ধিতে তাঁর হৃদয় পূর্ণ হয়েছে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় গানে গানে তা প্রকাশ করেছেন। নিজের মনের রঙ দিয়ে বাহিরের বস্তুকে

রঞ্জিত করে দেখাই গীতিকবির কাজ। বিহারীলাল বাংলার প্রথম দ্বিধাহীন গীতিকবি।

কাব্যগ্রন্থাবলী॥ "সঙ্গীতশতক" (১৮৬২) বিহারীলালের প্রথম কাব্যগ্রন্থ হলেও প্রকৃত নব্য গীতিকবিতা মিলল "বঙ্গসুন্দরী" (১৮৭০) এবং "নিসর্গ-সন্দর্শনে" (১৮৭০)। কবির শ্রেষ্ঠ কাব্য "সারদামঙ্গল" প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ সালে। "সাধের আসন" কাব্যটি সারদামঙ্গলের উপসংহার স্বরূপ। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য কাব্য হল "বাউলবিংশতি", "শরৎকাল", "কবিতা ও সঙ্গীত" প্রভৃতি।

"নিসর্গসন্দর্শনে" সমুদ্র, আকাশ, ঝড়ের রাত্রি, ঝড়ের পরের প্রভাত প্রভৃতি নানা বিষয়ক প্রকৃতি-চিত্র স্থান পেয়েছে। চিত্রগুলি অবশ্য সাধারণ বর্ণনাধর্ম অতিক্রম করে অন্তরের স্পর্শে প্রায়ই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে নি। স্তবকে স্তবকে খণ্ডিত চিত্রগুলি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভাবরসের একাগ্রতা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। তুলনামূলক ভাবে পরবর্তী "শরৎকাল" গ্রন্থের প্রভাত, মধ্যাহ্ন, সন্ধ্যাসঙ্গীত, নিশীথ সঙ্গীত, নিশান্ত সঙ্গীত প্রভৃতি কবিতায় একই সঙ্গে বাংলা দেশের শরৎঋতুর বিশিষ্ট রূপ ও আমেজ এবং সকাল, সন্ধ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষণে তার রূপ ও রসাবেদনের বিচিত্রতার সঙ্গে কবি-মনের রঙের সহযোগ ভাষাচিত্রে অনেক সার্থকভাবে ধরা পড়েছে। "বঙ্গসুন্দরী" নারীবন্দনামূলক কাব্য। বাংলাদেশের নারীর বিভিন্ন রূপ ও বিচিত্র ভঙ্গি এ-কাব্যের কবিতাগুলির বিষয়রূপে অবলম্বিত হয়েছে। "বাউলবিংশতি"তে বাউল ধরনের কয়েকটি গান সঙ্কলিত হয়েছে। "সারদামঙ্গলে" কবির গীতিস্বভাব, সৌন্দর্যচেতনা ও প্রকৃতিদৃষ্টি পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে। "সাধের আসনে"ও একই ভাবচেতনার অনুবৃত্তি ঘটেছে।

শেষোক্ত দু'টি কাব্যেরই অবলম্বিত বিষয় সারদা বা সরস্বতী। এই দেবীকে কেন্দ্র করে কবির মনে যে সৌন্দর্যাস্বাদ এবং প্রেমোপলব্ধি তরঙ্গিত তাকেই ভাষারূপে কবি আবদ্ধ করেছেন। বিহারীলাল কল্পিত এই দেবীর স্বরূপ নির্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সরস্বতী সম্বন্ধে পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র। কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন তিনি নানা আকারে নানা ভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন। তিনি কখনো জননী, কখনো প্রেয়সী, কখনো কন্যা। তিনি সৌন্দর্যরূপে জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করিতেছেন এবং দয়া স্নেহ প্রেমে মানবের চিত্তকে অহরহ বিচলিত করিতেছেন।" প্রকৃতি জুড়ে যে খণ্ড খণ্ড সুন্দর বস্তুর সমারোহ তা আসলে সর্ব সৌন্দর্যের উৎস সারদারই প্রতিফলন :—

কোটি শশী উপহাসি
উথলে লাবণ্যরাশি,
তরল দর্পণে যেন দিগন্ত আবরে ;
আচম্বিতে অপরূপ
রূপসীর প্রতিরূপ,
হাসি হাসি ভাসি ভাসি উদয় অম্বরে।

বিশ্বসৃষ্টির রহস্য কবি ভেদ করতে চেয়েছেন সারদাকল্পনার মধ্য দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া এরূপ সুগভীর কল্পনার পরিচয় বাংলা কাব্যে বড় নেই। কিন্তু বিহারীলাল অপর দিকে সারদাকে পারিবারিক স্নেহপ্রীতির আসনেও দেখতে চেয়েছেন। বিপরীত প্রান্তকে মেলাবার এই সাধনা শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নি। কিন্তু কবি সাংসারিক প্রেমকে স্বীকার করেই বিশ্বসৌন্দর্যের উৎসে পৌঁছতে চেয়েছেন। এই বিশিষ্ট মনোভঙ্গির অভিনবত্বে সংশয় প্রকাশ করা চলে না। কবি এই সারদাকেই আপন অন্তরে পেতে চেয়েছেন। সারদা তাঁর দেবী, প্রেম তাঁর পূজা। সারদার স্বপ্ন বুকে নিয়ে কবি শ্মশানের ভয়াবহতাকেও ভয় পান না—

তোমারে হৃদয়ে রাখি
সদানন্দ মনে থাকি,
শ্মশান অমরাবতী দুই ভাল লাগে।...
ভক্তিভাবে একতানে
মজেছি তোমার ধ্যানে,
কমলার ধনমানে নহি অভিলাষী।

তিনি সারদার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতে চান, লক্ষ্মীর ধনসম্পদে তাঁর কিছুমাত্র কামনা নেই। সারদাকে পাওয়ার জন্য কবির কণ্ঠে কি গভীর আকুতিই না প্রকাশ পেয়েছে! কিন্তু কবি সারদার রহস্য শেষ পর্যন্ত ভেদ করতে পারেন না—

ধেয়াই কাহারে আমি
নিজে তাহা জানি না।

এই রোমান্টিক অস্পষ্টতা বিহারীলালের কবি-কল্পনার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রোমান্টিক কল্পনা থেকেই এসেছে এক অকারণ বেদনাবোধ। কবি নিজে বলেছেন, "মৈত্রীবিরহ, প্রীতিবিরহ, সরস্বতীবিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল সঙ্গীত রচনা করি।" এই বিরহ-চেতনার

ভিত্তিতে কোন বোধগম্য কারণ নেই। মিলনেও এই বিরহ-বেদনার অবসান ঘটে না। আসলে শাশ্বত সৌন্দর্যের জন্য চিরকালীন অকারণ এবং রোমান্টিক বিরহক্রন্দন সারদামঙ্গল এবং সাধের আসনে ধ্বনিত হয়েছে।

প্রকৃতি-সম্পর্কিত কবিতায় বিহারীলাল একটি নূতন সুর আনলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "সাময়িক অন্য কবির রচনাতেও প্রকৃতি-বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা প্রথাসঙ্গত বর্ণনামাত্র, তাহা কেবল কবির কর্তব্যপালন। তাহার মধ্যে সেই সোনার কাঠি নাই যাহার স্পর্শে নিখিল প্রকৃতির অন্তরাত্মা সজীব ও সজাগ হইয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমপাশে আবদ্ধ করে।" নগরের কৃত্রিম সভ্যতার ঐশ্বর্যপূর্ণ পরিবেশ থেকে কবি দূরে প্রকৃতির উন্মুক্ত কোলে সৌন্দর্য-স্বপ্নে আকণ্ঠ অবগাহন করতে চেয়েছেন—

কভু ভাবি কোন ঝরণার
উপলে বন্ধুর যার ধার—
প্রচণ্ড প্রপাতধ্বনি,
বায়ুবেগে প্রতিধ্বনি
চতুর্দিকে হতেছে বিস্তার—
গিয়ে তার তীর তরুতলে,
পুরু পুরু নধর শাদ্বলে,
ডুবাইয়ে এ শরীর,
শব সম রব স্থির
কান দিয়ে জল কলকলে।
সে সময়ে কুরঙ্গিনীগণ,
সবিস্ময়ে মেলিয়া নয়ন,
আমার সে দশা দেখে,
কাছে এসে চেয়ে থেকে
অশ্রুজল করিবে মোচন।

রোমান্টিক গীতিকবিতার স্রষ্টা হিসেবে বিহারীলাল নব ভাবকল্পনার চর্চা করেছেন, সে ভাবানুভূতির গভীরতা এবং অভিনবত্ব অনস্বীকার্য; কিন্তু রূপরচনায় ততটা সাফল্য তিনি অর্জন করতে পারেন নি। তিনি যত বড় ভাবুক ছিলেন তত বড় শিল্পী ছিলেন না। ভাষার উপরে যে পরিমাণ দখল থাকলে প্রয়োজনের বাহক শব্দকে নমনীয় করে রহস্যময় নিখিলের বেদনাকে স্পর্শ করা যায় তা বিহারীলালের ছিল না। ভাবের ক্রম তাঁর রচনায় প্রায়ই

রক্ষিত হয় নি, চিত্রের সূত্র বারবার হয়েছে ছিন্ন। মাঝে মাঝে দু'চারটি স্তবকে বা দু'একটি পংক্তিতে ব্যঞ্জনা চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু সে সুর প্রায়ই পরবর্তী স্তবকগুলিতে অনুসৃত হয় নি। বিহারীলালের ভাবকল্পনা ছিল কবির ভাবকল্পনা, কিন্তু রূপরচনার নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের অভাবে সম্ভাবনানুযায়ী বড় কবি তিনি হতে পারেন নি। কারণ রূপসিদ্ধি ব্যতিরেকে কাব্যসার্থকতা লাভ অসম্ভব।

ইতিহাসের বিচার ॥ বিহারীলাল যত বড় কবি, বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তার চেয়ে অনেক গভীর প্রভাব তিনি বিস্তার করেছেন। সেইজন্যই সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর এত মর্যাদা। এক। ১৮৬৬ সালে মধুসূদনের চতুর্দশপদীর কবিতাগুলি প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলি ১৮৬৫ সালে রচিত। এই সনেট-গুচ্ছের মধ্যে কবির ব্যক্তিচিত্তের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। কবির "আশার ছলনে ভুলি" এবং "রেখো মা দাসেরে মনে" পরিপূর্ণ লিরিক। এ-কবিতা দু'টির আঙ্গিকে সনেটের সংহতি নেই, আছে একালীন গীতিকবিতাসুলভ বিতানিত ভাবোচ্ছ্বাস। কাজেই আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার তিনিই প্রথম কবি এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু মধুসূদনের কবিপ্রতিভা ছিল ক্লাসিসিজম-রোমান্টিসিজমের বিচিত্র মিশ্রণে গড়া। তাই আধুনিক রোমান্টিক গীতিকবিতার কতগুলি লক্ষণ, যেমন কল্পনার সুদূরাভিসার, অকারণ বিরহ-বিষণ্ণতা, রহস্যময় অস্পষ্টতা তাঁর কবিতায় বড় লক্ষ্য করা যায় না। তদুপরি তিনি গীতিকবিতা রচনার ব্যাপারে কখনই একাগ্র হতে পারেন নি। এই দু'টি দিক থেকে বিহারীলাল গীতিকবিতাকে নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নিজের ব্যক্তিভাবনাকে সর্বনিরপেক্ষভাবে উপস্থিত করায় তিনি যে নির্দ্বন্দ্ব মনের পরিচয় দিয়েছেন, বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ পথটিকে তা পরিষ্কার নির্দেশ করেছে। তিনি গীতিকবিতা ছাড়া অন্যবিধ কবিতা রচনার কথা ভাবেন নি। অথচ পাশাপাশি ব্যর্থ মহাকাব্য ও বীররসাত্মক আখ্যানকাব্য লিখে হেম-নবীন খ্যাতির শীর্ষে উঠে গিয়েছেন। বিহারীলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করায় বাংলা গীতিকবিতার স্বাভাবিক বিকাশ দ্রুততর হয়েছে। দুই। বিহারীলাল সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের মধ্যে বায়রণ-সেক্‌সপীয়রই তিনি বেশি পড়েছিলেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অনুসৃত কাব্যধারার সম্পর্ক নেই; সেক্‌সপীয়র-বায়রণের কাব্য-বৈশিষ্ট্য তাঁর শিল্পীচিত্তে প্রভাব ফেলতে পারে নি। তাঁর সঙ্গে ইংরেজী রোমান্টিক কবিকুলের দূরপ্রসারী কল্পনা-অতিরেক ও নির্বিশেষ সৌন্দর্যধ্যানের

সম্পর্ক অধিক। প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও প্রতিভাগত এই সাদৃশ্য বাংলা কাব্যকে অতিশীঘ্র ইংরেজী রোমান্টিক আন্দোলনের নিকটে নিয়ে ফেলেছে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮–৭৮)

পরিচয়॥ যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল ও অতিচারী সুরেন্দ্রনাথ পরবর্তী জীবনে আপন ব্যক্তিচেতনাকে ঊর্ধ্বগামী করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিসত্তার গভীরে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব ছিল। "কামই তাঁহাকে দিয়াছিল মোক্ষ বা মুক্তি। কবির অন্তর্জীবনের এই ঘাত-প্রতিঘাত অতি বিচিত্র। এই বিচিত্র কাহিনী তাঁহার রচনাবলীতে ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাঁহার সাহিত্য-জীবনের এক দিকে তাঁহার কামজীবন, অন্যদিকে তাঁহার ধর্মজীবন। তাঁহার জীবন দ্বিশিখা-বর্তিকার মত দুই দিকে প্রজ্বলিত হইয়াছিল বলিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই।" (—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। কবির ব্যক্তিচিত্তের এই সুগভীর আলোড়ন তাঁর কবিতার উৎস।

কাব্যগ্রন্থাবলী॥ কবির অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা আছে। এই সব প্রবন্ধ-নিবন্ধে জ্ঞানসাধকরূপে তাঁর পরিচয় ধরা পড়েছে। তুলনামূলক-ভাবে তাঁর কাব্য রচনার সংখ্যা বেশি নয়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত "মহিলা" বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তাঁকে অমরতা দিয়েছে। "হর্ষবর্ধন" নামে তাঁর অপর একটি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকের নামও উল্লেখ করা যেতে পারে। স্বল্পস্থায়ী জীবন এবং স্বল্পপরিমাণ কাব্য রচনা নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যে আপন ক্ষমতাবলেই বিশিষ্ট আসন পেয়েছেন।

সুরেন্দ্রনাথ জননী, জায়া, ভগিনী, দুহিতা প্রভৃতি রূপে নারীর যে মহিমাকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাকে রূপ দিতে চেয়েছেন মহিলা কাব্যে। জননী ও জায়ার মহিমা কীর্তন করে ভগ্নী-অংশ তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন কিন্তু শেষ করে যেতে পারেন নি। সুরেন্দ্রনাথের এই কাব্যের কল্পনা বিহারীলালের "বঙ্গসুন্দরী"র দ্বারা কিছুটা প্রভাবান্বিত হওয়া সম্ভব। কিন্তু বিহারীলালের কুহেলী-আচ্ছন্ন রোমান্টিক মানসাভিসার, ধ্যানবিহ্বলতা এবং শিথিল রচনা-ভঙ্গির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সাদৃশ্য অল্প। এ প্রসঙ্গে মোহিতলালের মন্তব্য উদ্ধারযোগ্য "সুরেন্দ্রনাথের প্রেমের আদর্শে তথা নারীপূজায় পূর্বতন কবিগণের আদিরস বা দেহসম্ভোগের নীতি পুরামাত্রায় আছে।…অতিশয় প্রাকৃত প্রেমের সংস্কারকেই অবলম্বন করিয়া সুরেন্দ্রনাথ দার্শনিক যুক্তি দ্বারা তাহাকে

শোভন ও বুদ্ধি-সম্মত করিয়া তুলিয়াছেন।" বিহারীলাল প্রবর্তিত রোমান্টিক কাব্যধারা থেকে সুরেন্দ্রনাথের ভাবকল্পনার যেমন পার্থক্য আছে তেমনি স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তাঁর সংহত, গাঢ়, স্বল্পোচ্ছ্বসিত ভাষাভঙ্গির। তাঁর উপলব্ধির এবং রচনারীতির মধ্যে ক্লাসিকাল ঘনপিনদ্ধতা থাকলেও কবির জীবন-জিজ্ঞাসার মধ্যে "ব্যক্তি আমি"র অস্তিত্ব গভীরভাবে অনুভব করা যায়। কাজেই সুরেন্দ্রনাথের হাতে গীতিকবিতাই একটি নূতন রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করল একথা বলা যায়।

অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯)

পরিচয় ॥ অক্ষয়কুমার বিহারীলালের ধারার অনুসারী কবি। কিন্তু বিহারীলালের প্রতিভার সঙ্গে তাঁর কবিস্বভাবের মূল পার্থক্য আছে। বিহারীলালের কবিতায় বিশ্বসৃষ্টির রহস্যভেদী যে-কল্পনার পরিচয় পাই অক্ষয়কুমারের কবিতা তা থেকে বঞ্চিত। বিহারীলালের প্রভাবের পাশাপাশি শেলীর প্রত্যক্ষ প্রভাব তিনি অনুভব করেছেন। বিদেশী কবিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় সত্ত্বেও অক্ষয় বড়াল আপন ব্যক্তিস্বভাবকেই স্পষ্টভাবে কাব্য-মধ্যে প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য রোমান্টিক গীতিকবির ন্যায় অক্ষয়কুমারও প্রেম ও প্রকৃতির বন্দনা গান করেছেন। তাঁর প্রেম কল্পনায়ও একদিকের মর্তপ্রেয়সী এবং অপর প্রান্তের কল্পনালক্ষ্মীর সমন্বয় সাধনের প্রয়াস আছে। প্রথম যৌবনে কবিচিত্ত দ্বিধা-পূর্ণ হলেও প্রৌঢ়ত্বে তিনি এক ধরনের সমন্বিত উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন।

কাব্যগ্রন্থাবলী ॥ অক্ষয়কুমার বড়ালের গীতিকাব্যের সঙ্কলন গ্রন্থগুলি হল—"প্রদীপ" (১৮৮৪), "কনকাঞ্জলি" (১৮৮৫), "ভুল" (১৮৮৭), "শঙ্খ" (১৯১০) এবং "এষা" (১৯১২)। প্রথম তিনটি কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। কবির বয়স তখন চব্বিশ থেকে সাতাশ। শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রৌঢ়ত্বের শেষপ্রান্তে বসে লেখা। কবির বয়স তখন পঞ্চাশ-বাহান্ন। প্রথম কাব্যত্রয়ে শিল্পীঅন্তরের একটি গভীর দ্বিধা প্রকাশিত। অক্ষয় কুমারের ভাবকল্পনার এই দ্বিধার গভীরে প্রবেশ করেছেন মোহিতলাল, "তৃপ্তির মধ্যেও তিনি অতৃপ্তির উপাসক, কিন্তু প্রাণের গভীরতর চেতনায় তৃপ্তিই তাঁহার প্রকৃতিসুলভ। তিনি শেলীর মত 'অমূরতি কামনার সমূরতি অধিষ্ঠান' কামনা করেন, কিন্তু তাঁহার কামনা আদৌ অমূরতি নহে—সারাজীবন তাহা সশরীরে তাঁহার অতি নিকটে অবস্থান করিয়াছে, তিনি তাহাকে একটি অমূরতি মহিমায় মণ্ডিত করিয়া নিজের ভাবাভিমান তৃপ্ত

করিতে চাহিয়াছেন।" এই দ্বিধা কাব্য তিনটিকে আশানুগ সাফল্য দিতে পারে নি। শেষোক্ত কাব্য দু'টি রচনার পূর্বে কবির পত্নীর মৃত্যু ঘটেছে। ফলে গৃহের গৃহিণী এবং কল্পনার প্রেয়সীর মধ্যকার সেই দ্বিধার অবসান হয়েছে। কবির জীবনের বাস্তব নারী আজ "অনাদি অনন্ত তুমি অসীম অপার" হয়ে উঠেছে। কবির কাব্যগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল "এষা"। এটি শোককাব্য। মৃত্যুর আলোকে প্রেমের সত্যলাভ করেছেন কবি, যৌবন-কল্পনার সংশয় তিরোহিত হয়েছে। গভীর বেদনার মধ্য দিয়ে তিনি এক প্রশান্তিতে পৌঁছেছেন।

দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৮–১৯২০)

পরিচয় ॥ রবীন্দ্র-সমসাময়িক কবিদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ সেনের শক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল। রবীন্দ্র-রচনাভঙ্গি তাঁর উপরে সামান্যপ্রভাব বিস্তারও করে থাকবে, কিন্তু তার পরিমাণ বেশি নয়। তিনি রবীন্দ্র-প্রভাবের পূর্বযুগের কবি। বিহারীলালের প্রভাব তাঁর উপরে আছে, কিন্তু বিহারীলালের মত স্খলিতবাক্ শিথিল রূপরীতি তাঁর রচনার নয়। গাঢ়বদ্ধ আবেগ ইন্দ্রিয়ানুগ আবেদন সৃষ্টিকারী চিত্রকল্পে এবং কখনো কখনো সংহত সনেটের আধারে চমৎকার বিধৃত হয়েছে। গীতিকবি হিসেবে তাঁর কল্পনাও বস্তুকে ছাপিয়ে গিয়েছে, কিন্তু বিহারী-লালের ন্যায় বস্তু-অতীত, জগতাতীত সৌন্দর্য ও প্রেম-উৎসকে উদ্ঘাটিত করতে তিনি ধাবিত হন নি। বিহারীলালসুলভ ধ্যানলীনতা দেবেন্দ্রনাথের নেই, তাঁর কল্পনায় নেশার মত্ততা এবং রূপের বিহ্বলতা স্পষ্ট। 'Sensuous' বিশেষণটি দেবেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে প্রয়োগ করা চলে। বস্তুকে তিনি অতিক্রম করতে না পারলেও তিনি "অশোক মঞ্জরী হইতে তাঁহার তরুণতা এবং বধূর ভূষণঝঙ্কার হইতে তাহার রহস্য কথাটি চুরি করিয়া লইতে পারেন।"—(রবীন্দ্রনাথ)

কাব্যগ্রন্থাবলী ॥ দেবেন্দ্রনাথের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ফুলবালা" ১৮৮০ সালে প্রকাশিত হয়। ১৮৮১ সালে প্রকাশিত "উর্মিলা কাব্য" এবং "নির্ঝরিণী"ও প্রথম কাব্যের ন্যায় আকারে ক্ষুদ্র। "অশোকগুচ্ছ" (১৯০০), "শেফালীগুচ্ছ" (১৯১২), "পারিজাতগুচ্ছ" (১৯১২), "গোলাপগুচ্ছ" (১৯১২), কবির সবচেয়ে বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ। এছাড়াও কবি "অপূর্ব নৈবেদ্য", "অপূর্ব বীরাঙ্গনা", "অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা" এবং আরও অনেকগুলি কাব্য লিখেছিলেন।

"ঊর্মিলাকাব্য", "অপূর্ব ব্রজাঙ্গনা" এবং "অপূর্ব বীরাঙ্গনা" প্রভৃতি কাব্যে মধুসূদনের কিছু অনুসরণ আছে। কবি নিজেকে মধুসূদন-হেমচন্দ্রের যুগের কবি বলেছেন, তবে এই সম্পর্কের পরিমাণ এমন কিছু নয়।

দেবেন্দ্রনাথের কবিতাগুলির দিকে তাকালে আরও দু'একটি সাধারণ লক্ষণ চোখে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথ সুপ্রচুর সনেট লিখেছেন। সনেটের আঙ্গিক সাধনায় দেবেন্দ্রনাথ সমুচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। সনেটের সংহত ও ঘনপিনদ্ধ আধারে ধৃত গাঢ় আবেগের রস তিনি পাঠক-মনে সঞ্চারিত করতে সমর্থ হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের কবিতার একটা উল্লেখযোগ্য প্রধান অংশ ফুল সম্পর্কে লেখা। দেবেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যচেতনা এবং ইন্দ্রিয়-বিহ্বল উপলব্ধি ফুলের রূপবর্ণনায় বর্ণসম্পাত করেছে।

শেষপর্বে দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় আধ্যাত্মিকতার সুরটি প্রধান হতে থাকে। এর ফলে তাঁর শেষের দিকের কবিতার উৎকর্ষের বিশেষ হানি ঘটে।

অন্যান্য গীতিকবি

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)॥ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি। কিন্তু তত্ত্বচেতনা তাঁকে সাহিত্যরস থেকে দূরে নিয়ে যায় নি। ১৮৭৫ সালে "স্বপ্নপ্রয়াণ" নামক কাব্য রচনা করে দ্বিজেন্দ্রনাথ বাংলা গীতি-কবিতার জগতে একটি বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। স্বপ্নপ্রয়াণ একটি রূপক কাব্য। একটি কাহিনীর ক্ষীণসূত্র এ-কাব্যের অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত। কিন্তু কাহিনীটি রসের ক্ষেত্রে কোন মুখ্য ভূমিকাই গ্রহণ করে নি। আসলে মায়াময় স্বপ্নরাজ্যের কাল্পনিক বর্ণনায় কবি এমন জগতের সৃষ্টি করেছেন যা তাঁর ব্যক্তি-বাসনার বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত। স্বপ্নপ্রয়াণ যে আসলে একটি গীতিকাব্য, কাহিনীসূত্র এবং রূপকার্থ থাকলেও তা অস্বীকার করা যায় না। রোমান্টিক রহস্যের আলোছায়ায় এ-কাব্যটি যেমন অভিনব রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, তেমনি দার্শনিক ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ-কাব্যের ভাবাবেগ নবকান্তি লাভ করেছে। রবীন্দ্রনাথ এ-কাব্যটির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "স্বপ্নপ্রয়াণ যেন একটা রূপকের অপরূপ রাজপ্রাসাদ। তাহার কত রকমের কক্ষ, গবাক্ষ, চিত্র, মূর্তি ও কারুনৈপুণ্য। তাহার মহলগুলি বিচিত্র, তাহার চারিদিকের বাগানবাড়ীতে কত ক্রীড়াশৈল, কত নিকুঞ্জ, কত লতাবিতান। ইহার মধ্যে কেবল ভাবের প্রাচুর্য্য নহে, রচনার বিপুল বিচিত্রতা আছে।"

গোবিন্দচন্দ্র দাস (১৮৫৪-১৯১৮) ॥ গোবিন্দচন্দ্র দাসের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যের গভীর পরিচয় ছিল না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সুকঠিন দুঃখ-দারিদ্র্য ভোগ করেছেন। এর মধ্য দিয়ে জীবন সম্পর্কে যে ব্যক্তিক চেতনা তিনি লাভ করেছিলেন তার অভিব্যক্তিতেই গোবিন্দচন্দ্রের কবিতা পূর্ণ। তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রকাশিত হয়েছিল ;—"প্রেম ও ফুল" (১৮৮৮), "কুঙ্কুম" (১৮৯২), "কস্তুরী" (১৮৯৫), "ফুলরেণু" (১৮৯৬)। ইংরেজী কাব্যের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ ও গভীর সম্পর্ক না থাকলেও বাংলা রোমান্টিক গীতিকবিতার ধারাটি তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে। এই পরিবেশে সাধারণ ভাবে ইংরেজী রোমান্টিক ভাবকল্পনার যে বীজ উড়ে বেড়াচ্ছিল তার কিছু পরোক্ষ প্রভাব গোবিন্দচন্দ্রের কবিচিত্তে ছায়া ফেলেছিল এমন বলা যেতে পারে।

গোবিন্দ দাসের রচনারীতিতে শিথিলতা ছিল, অসংযম ছিল আরও বেশি। তাঁর মধ্যে বড় কবির কিছু সম্ভাবনা থাকলেও রূপনির্মিতির দুর্বলতায় তা সফল হতে পারে নি। কিন্তু ভাষার অসংযম যেন তাঁর কবিকল্পনার বিশিষ্টতারই বাহন। তাঁর কল্পনায় বলিষ্ঠ ভোগবাদ ও নারীদেহকামনার তীব্র প্রত্যক্ষতা লক্ষনীয়। সমকালীন কবি দেবেন্দ্রনাথের ইন্দ্রিয়ানুগ রূপবিহ্বলতার সঙ্গে এর যেমন পার্থক্য আছে, তেমনি পরবর্তী কবি মোহিতলালের তাত্ত্বিকসুলভ দেহবাদের সঙ্গেও এ-কল্পনার দূরত্ব স্পষ্ট। দেবেন্দ্রনাথের কবিতায় রূপসাধনার সুর এবং মোহিতলালের দেহবাদে প্রজ্ঞার দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে। গোবিন্দ দাসের ইন্দ্রিয়ানুগত্যে লৌকিক কাম-ভাবনার উত্তাপের প্রাধান্য আছে।

কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩) ॥ "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যে-কয়জন মহিলা-কবি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন, কবি কামিনী রায়ের স্থান তাঁহাদের মধ্যে নিঃসংশয়ে শ্রেষ্ঠ। স্বাভাবিক প্রতিভার সহিত উচ্চশিক্ষার সংযোগ ঘটাতেই তাঁহার রচনা মার্জ্জিত ও শিল্পসুষমামণ্ডিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিল।" (—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে তিনি সচেতন দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার দুর্বোধ্যতা এবং মিষ্টতার বিরুদ্ধে তিনি স্পষ্টভাবেই আপনার মতামত ব্যক্ত করেছেন। হেমচন্দ্রের প্রতি সুগভীর শ্রদ্ধাও তিনি প্রকাশ করেছেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের গীতিকবিতার তুলনায় তাঁর কবিতা কিছু বেশি পরিণত। এই পরিণতি সম্ভবত যুগপ্রভাবের ফল। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমণ্ডলের বাহিরে বাংলা গীতিকবিতার যে বিকাশ ঘটেছিল তা-ই কামিনী রায়ের কল্পনাকে

গীতিধর্মী এবং প্রকাশভঙ্গিকে সুষ্ঠু হয়ে উঠবার সুযোগ দিয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে হেমচন্দ্রের কোন সত্যকার প্রভাব কামিনী রায়ের উপরে নেই। কামিনী রায়ের কবিতা প্রত্যক্ষ এবং সুবোধ্য। তাঁর কল্পনায় বিবর্ণতা না থাকলেও বর্ণপ্রাচুর্যও নেই। তাঁর কল্পনা সুদূরের যাত্রী নয়, রহস্যলোকেরও সঙ্গী নয়। তবে সমকালীন অপরাপর মহিলা-কবিদের ন্যায় তিনি পারিবারিক অনুভূতির সংকীর্ণ ক্ষেত্রে আপনাকে বদ্ধ রাখেন নি। কবির ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তীব্র না হলেও তাঁর ভাব ও ভাবনা তুলনামূলকভাবে ব্যাপক ছিল।

কবির কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে "আলো ও ছায়া" (১৮৮৯), "নির্মাল্য" (১৮৯১), "পৌরাণিকা" (১৮৯৭) এবং "দীপ ও ধূপের" নাম করা যেতে পারে।

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪) ॥ গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী প্রথম-দিকের মহিলা কবিদের অন্যতমা। তাঁর প্রধান কাব্য হল "অশ্রুকণা" (১৮৮৭), "আভাষ" (১৮৯০), "শিখা" (১৮৯৬), "অর্ঘ্য" প্রভৃতি। আধুনিক শিক্ষার প্রভাবে তিনি কাব্যচর্চায় উৎসাহিত হন নি। আপন চিত্তের স্বাভাবিক প্রবণতাই কবিতা রচনায় তাঁকে প্ররোচিত করেছে। কামিনী রায়ের মত তাঁর কাব্যদেহ সুমার্জিত নয়, কিন্তু ভাবানুভূতিতে কোথাও কৃত্রিমতার স্পর্শমাত্র নেই। পারিবারিক পরিবেশে স্বামীকে কেন্দ্র করেই তাঁর কবিচিত্তের আবেগ দানা বেঁধেছে। স্বামীর মৃত্যুই তাঁর হৃদয়ের অশ্রু এবং কবিতার উৎস যুগপৎ উন্মুক্ত করেছে। সমকালীন অনেক পুরুষ কবির ক্ষেত্রেও পারিবারিক জীবনরস কবিতা রচনার ভিত্তি হয়েছে; কিন্তু নারীর দৃষ্টিতে সংসারজীবন অন্যতর বর্ণে ধরা দিয়েছে।

মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩) ॥ মানকুমারী বসুর সঙ্গে গিরীন্দ্রমোহিনীর ভাবকল্পনা এবং রচনাভঙ্গির গভীর সাদৃশ্য আছে। "কাব্যকুসুমাঞ্জলি" (১৮৯৩) এবং "কনকাঞ্জলি" (১৮৯৬) তাঁর মুখ্য কাব্যগ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যে তাঁর কবিপ্রতিভার স্বরূপ ধরা পড়বে—"মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে স্বামিসুখবঞ্চিত হইয়া তিনি যে দুঃখের মধ্যে সাহিত্য সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার অনুভূতি জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সহজ সরল ভাষায় সুললিত ছন্দে নিজের মনের কথা নিবেদন করিয়া গিয়াছেন।"

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) ॥ দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যকাররূপে পরিচিতি এখনও টিঁকে আছে। কিন্তু সমকালীন বাংলাদেশে তিনি কবি

হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশিষ্ট হল "আষাঢ়ে" (১৮৯৯), "হাসির গান" (১৯০০), "মন্দ্র" ও "আলেখ্য"। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তাঁর রচনার স্বাতন্ত্র্য রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। হাসির গান ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনায় তিনি বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর ভাষা মার্জিত; ছন্দ ও অন্ত্যমিল প্রসাধন গত নৈপুণ্যও চোখে পড়ে। তিনি ঋজু মেরুদণ্ডের লোক, অত্যধিক কমনীয়তার ছিলেন বিরোধী। এই ব্যক্তিত্ব তাঁর কবিতাবলীতে সুন্দর প্রতিফলিত হয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কবির "মন্দ্র" কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রকৃতির স্বরূপটি বিবৃত হয়েছে, "কাব্যে যে নয় রস আছে অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয় রসকে নয় মহলে পৃথক করিয়া রাখেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য করুণা মাধুর্য বিস্ময় কখন কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই।... ইহার কবিতাগুলির মধ্যে পৌরুষ আছে। ইহার হাস্য বিষাদ বিদ্রূপ বিস্ময় সমস্তই পুরুষের—তাহাতে চেষ্টাহীন সৌন্দর্যের সঙ্গে একটা স্বাভাবিক সবলতা আছে। তাহাতে হাবভাব ও সাজসজ্জার প্রতি কোনো নজর নাই।... দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্যভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে, কেমন অনায়াসে তরল হইতে গম্ভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে—ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশভারাক্রান্ত নহে, তাহা কবি দেখাইয়াছেন।"

॥ তিন ॥

উপন্যাস ও ছোট গল্প

ভূমিকা

পুরানো যুগের গল্পের সঙ্গে আধুনিক উপন্যাসের রূপলক্ষণ, জীবনদৃষ্টি ও আস্বাদগত কোন সম্পর্কই নেই। উপন্যাস শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসেই একটি একান্ত আধুনিক আঙ্গিক। কাহিনীকথন এক্ষেত্রে অবলম্বন মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। পুরাতন ধারার আখ্যায়িকা কাব্যের সঙ্গে এর সামান্য সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায়। আখ্যানকাব্য ও মহাকাব্যে কাহিনীর মধ্য দিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করা হয়। কাহিনী ও চরিত্র

জড়িয়ে একটি জীবনবোধ সেখানে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসে এই তিনটি উপকরণই থাকে। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে এর পার্থক্যটিও কিছুমাত্র অপ্রকট নয়। প্রথমত, উপন্যাস গদ্যে রচিত। গদ্যে রচিত বলেই ভাবের আবেগ-উচ্ছ্বাস এখানে কাব্যের ন্যায় বাধাহীন হয়ে উঠতে পারে না; ভাবনার সঙ্গে তাকে কতকটা সন্ধি করতেই হয়। কাব্যে কাহিনীর সূত্র ধরে কবি ভাবাবেগপূর্ণ বর্ণনার রাজ্যে বারবারই প্রবেশ করেন। কাব্যের ঘটনাসংস্থান তাই শিথিল হতে বাধ্য। উপন্যাসেও বর্ণনার প্রবেশাধিকার আছে। কিন্তু ঘটনার সঙ্গে তাকে সমন্বিত হতে হয়। ঘটনাকে থামিয়ে রেখে বর্ণনা চলে না। ঘটনা এখানে অনেক ঘন-সন্নিবিষ্ট। দ্বিতীয়ত, কাব্য-কাহিনীতে কল্পনার অত্যধিক প্রসার সম্ভব, বর্তমানের অপেক্ষা অতীতরাজ্যেই তার পরিক্রমা, অতিলৌকিকের সঙ্গে তার সহজ সম্পর্ক। উপন্যাসে কল্পনা থাকলেও তা বাস্তববুদ্ধির অতীত নয়, ঐতিহাসিক রোমান্সের সঙ্গেও বাস্তবতার যোগসূত্র ছিন্ন হয় না, সর্বত্রই চরিত্রগুলিতে একালের মানুষের জীবনসমস্যাই চিত্রিত হয়। তৃতীয়ত, কাব্যে কাহিনী ও চরিত্রের পারস্পরিক সম্বন্ধকে অচ্ছেদ্য বলা চলে না, কবির আত্মপ্রসারণশীল বর্ণনা ও উপলব্ধির স্রোতে কাব্য ভাসমান। উপন্যাসে চরিত্র ও ঘটনার সম্পর্ক অন্যোন্য এবং অচ্ছেদ্য। চরিত্রের পথ ধরেই মাত্র ঘটনা অগ্রসর হতে পারে, ঘটনার এবং অপর চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাতেই শুধু চরিত্রের বিবর্তন ঘটে। চতুর্থত, উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য প্রকট। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিকাশের উপযুক্ত পরিবেশ যখন সমাজজীবনে দেখা দিল তখনই উপন্যাসের আবির্ভাব সম্ভব হল। গদ্যভাষা এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বিকশিত করে তুলতে পারে। উপন্যাসের বাহনরূপে গদ্যভাষা তাই অপরিহার্য।

বাংলা গদ্যের বিকাশ ঘটার পরেই উপন্যাসের আবির্ভাব ঘটল। নবজাগৃতির মন্ত্রপুষ্ট জীবনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তখন আলোড়িত হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের উপযুক্ত ভাষাও অনেকটা গড়ে উঠেছে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সাধনায়। পুরানো ধরনের কাহিনীতে বাঙালী আর সন্তুষ্ট হতে পারল না। বাংলা সাহিত্যেও ইংরেজী আদর্শে উপন্যাসের জন্ম ঘটল।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাসের আলোচনায় কয়েকটি সাধারণ **লক্ষণ চোখে পড়বে।**

এক ॥ বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাংলা ভাষায় উপন্যাস রচনার সূত্রপাত ঘটেছে। কিন্তু বঙ্কিমের প্রতিভায় অতীতের নিকট ঋণ গ্রহণের চিহ্নমাত্র

নেই, ভবিষ্যৎকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত করার শক্তি আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অতিতীব্র দ্যুতির নিকটে পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের যেন চোখেই পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের দু'টি ধারাকে পুষ্ট করে উত্তরাধিকারের হাতে দান করে গেলেন। গোটা উনবিংশ শতক ধরে এই দু'টি ধারার অনুবর্তন চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্রনির্মিত উপন্যাসের গঠনকৌশলও এ শতাব্দীর পরবর্তী প্রায় সব লেখককেই অনুসরণ করতে হয়েছে।

দুই ॥ বঙ্কিম-প্রবর্তিত ঐতিহাসিক রোমান্স রচনায় পরবর্তী কালে বহু ঔপন্যাসিকই আত্মনিয়োগ করেছেন। রোমান্সকল্পনার অংশটুকু বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ইতিহাস-কাহিনী রচনার যে চেষ্টা প্রতাপচন্দ্রের "বঙ্গাধিপ পরাজয়ে" সূচিত হয়েছে এবং রমেশচন্দ্রের দু'একটি রচনায় সামান্যত অনুসৃত হয়েছে তা ফলবতী হয় নি। তবে বিংশ শতকের প্রথমদিকে রবীন্দ্রযুগের ঔপন্যাসিকেরা ঐতিহাসিক রোমান্সকাহিনীর প্রতি আকর্ষণ দেখান নি। রবীন্দ্রোত্তর সাম্প্রতিক লেখকেরাও ঐ পথ পরিহার করেই চলেছেন। একান্ত নবীন বহু লেখকের রচনায় ঐতিহাসিক রোমান্স-সৃষ্টির উৎসব সম্প্রতি আবার শুরু হয়েছে।

তিন ॥ বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসে সমাজসমস্যাকে পটভূমি মাত্র করে ব্যক্তিজিজ্ঞাসাকেই তীব্র করে তোলা হয়েছে। তা ছাড়া বাস্তব সমাজ ও পরিবারজীবনের চিত্র এসব উপন্যাসে আদৌ মেলে না। তারকনাথের "স্বর্ণলতা" থেকে পরিবারজীবনের চিত্র-রচনার প্রবণতা সূচিত হয়েছে, রমেশচন্দ্র-স্বর্ণকুমারীতে সমাজসংস্কার-বাসনা ব্যক্তিচরিত্র ছাপিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে। পরবর্তী বাংলা উপন্যাসের প্রধান লেখকেরা তুলনায় আরও বাস্তব-মুখী হলেও বঙ্কিমের ধারাটিই অনুসরণ করেছেন। নারী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে অবশ্য পরিবারজীবনের সহজ চিত্রাঙ্কন প্রবণতা দীর্ঘকাল ধরে চলেছে।

চার ॥ হাস্যরসাত্মক গল্পোপন্যাসের ধারা "আলালের ঘরের দুলাল" থেকে চলে আসছিল। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর রচনায় তা বিকশিত হয়েছে। এদের থেকে একটি স্বতন্ত্র সুরের অনুশীলন করে ত্রৈলোক্যনাথ এই ধারার শ্রেষ্ঠ শিল্পী হয়ে উঠেছেন।

উপন্যাস এবং ছোট গল্প এক জাতীয় রচনা নয়। ছোট গল্পের রচয়িতা জীবনকে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে দেখেন। সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও একাগ্র, কখনো তীব্রও [illegible]। ব্যাপক পরিসরের মধ্যে জীবনকাহিনী ও চরিত্রবৃত্তি বিকাশের জন

তিনি আঁকেন না। এ কটি বিশিষ্ট মুহূর্তবোধের চকিত আলোয় জীবনের সত্য তাঁর কাছে দেখা দেয়। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায় "উপন্যাস মাত্রেই একটা প্রতিপাদ্য আছে, সমস্ত ঘাত-সংঘাতগুলিকে গুছিয়ে এনে সে একটা সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে। তার ভেতরে পূর্বপক্ষ উত্তরপক্ষ দুই-ই আছে। কিন্তু ছোট গল্পের ধর্মই হল তার প্রশ্নমূলকতা। সে যেন একটির পর একটি জিজ্ঞাসাকে নগ্ন তীক্ষ্ণতার সঙ্গে জীবনের দিকে ছুড়ে দিতে থাকে।"

ছোট গল্পের তীক্ষ্ণতা নেই অথচ উপন্যাসের পূর্ণতারও অভাব এমন ভালো লেখা আমাদের সাহিত্যেও অনেক আছে। এদের বড় গল্প বা ক্ষুদ্র উপন্যাস যে কোন নাম দেওয়া যেতে পারে।

বর্তমানে যে পর্বের আলোচনা করছি ছোট গল্প তখন পর্যন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে নি। সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার কথা পরে বলছি। তবে এ-সত্য স্পষ্ট যে উপন্যাসসাহিত্যের বিকাশ না ঘটলে ছোট গল্পের আবির্ভাব সম্ভব হয় না।

বাংলা উপন্যাসের জন্ম

বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁর অনুসরণকারীরা বাংলা ভাষায় সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থের কাহিনী বিবৃত করেছেন। সেগুলি কোন দিক থেকেই উপন্যাসরূপে চিহ্নিত হতে পারে না। "নববাবু বিলাস" জাতীয় যে নক্‌শাগুলি ভবানীচরণ লিখেছিলেন তার কোথাও কোথাও দু'একটি চরিত্রের ঈষৎ আভাস পাওয়া গেলেও উপন্যাসের ন্যূনতম সর্ত এ-গ্রন্থগুলি সিদ্ধ করে না।

মুলেন্সের "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"॥ বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম উপন্যাসরূপে শ্রীমতী মুলেন্স রচিত "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" (১৮৫২) নামক গ্রন্থকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। এই গ্রন্থের পরিচয় দিতে গিয়ে লঙ্‌ তাঁর পুস্তক তালিকায় বলেছেন "In the guise of fiction, written for native Christian women, to shew the practical effects of Christianity in forming marriage connections, behaviour to husbands, moral training of children and women's duty to the poor and sick..."। গ্রন্থটি দেশীয় খ্রীষ্টান নারীদের উদ্দেশ্যে রচিত এবং নিঃসন্দেহে প্রচারমূলক। কিন্তু এর কাহিনী ও চরিত্রচিত্রাঙ্কন সর্বদা উদ্দেশ্য-মূলকতা দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে নি। যদিও ফুলমণি করুণা [illegible]

কাহিনী ঘনপিনদ্ধ ঐক্য স্বষ্টি করতে পারে নি ; কিন্তু ঘটনাবিন্যাস সেকালের তুলনায় নিন্দনীয় নয়। এ-গ্রন্থের ভাষা আশ্চর্য সরল ; চরিত্রচিত্রণেও বহু স্থানে প্রাণের স্পর্শ লেগেছে। গ্রন্থের লেখিকা মুলেন্সকে কেউ কেউ ফরাসী মহিলা বলেছেন, যদিও ভাষা দেখে তা মেনে নেওয়া কঠিন। আমাদের মনে হয় ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "স্থানীয় লোকের মুখে শুনিয়াছি, ইনি একজন বঙ্গ মহিলা, চক্রবেড়িয়া নিবাসী খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভগবানচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা, পাদরি মুলেন্সকে বিবাহ করেন।"

প্যারীচাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল"॥ "আলালের ঘরের দুলাল" ১৮৫৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের ভাষা ব্যবহারে প্যারীচাঁদ যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন পূর্বেই তা বিস্তৃতভাবে বলা হয়েছে। আলালের ঘরের দুলালের মধ্যে অনেকেই বহুল পরিমাণে উপন্যাসলক্ষণ খুঁজে পেয়েছেন। উপন্যাসোচিত কিছু গুণ এ-গ্রন্থে থাকলেও তা অনেকখানি নকশাধর্মী রচনারীতির সঙ্গে মিশ্রিত আকারে প্রকাশ পেয়েছে। তবে এ-রচনায় অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর কলকাতার ব্যঙ্গচিত্রগুলির মধ্য থেকেই একটি পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর আভাস মেলে। জমিদার পুত্র মতিলাল কুসঙ্গে পড়ে অধঃপাতে গিয়েছিল, দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে তার স্বভাবের পরিবর্তন ঘটল। এই কথাটি বর্তমান গ্রন্থে বোঝান হয়েছে। নীতিপ্রচারের চেষ্টাটি স্পষ্টই চোখে পড়ে। তবে অসৎ ব্যক্তিদের চরিত্রাঙ্কনে প্যারীচাঁদ অনেকখানি সাফল্য দেখিয়েছেন। বিশেষ করে ঠকচাচার চরিত্রটি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "ঐতিহাসিক উপন্যাস"॥ "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ১৮৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থে দু'টি কাহিনী আছে। বিজ্ঞাপনে ভূদেব বলেছেন, "ইংরেজিতে 'রোমান্স্ অব হিস্ট্রি' নামক একখানি গ্রন্থ আছে, তাহারই প্রথম উপাখ্যান লইয়া সফল স্বপ্ন নামক উপন্যাসটি প্রস্তুত হইয়াছে। অঙ্গুরীয় বিনিময় নামক দ্বিতীয় উপন্যাসের কিয়দংশ ঐ পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে।" প্রথম কাহিনীটি রূপকথা জাতীয় এবং মৌলিক নয়। দ্বিতীয় কাহিনীটি মৌলিক এবং উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। শিবাজী ও ঔরংজীবের যুদ্ধের পটভূমিকায় স্থাপিত একটি প্রণয়কাহিনা এর অবলম্বনীয় বিষয়। প্রণয়কাহিনীটি কল্পনাসৃষ্ট। শিবাজী ও ঔরংজীবকন্যা রোসিনারার প্রণয়-[illegible] চিত্রণে [illegible] প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মনস্তাত্ত্বিক ক্রমবিকাশ[illegible]

সার্থকভাবেই কাজে লাগিয়েছেন। কর্তব্যবুদ্ধির উজ্জীবনে মুক্তপ্রণয় ব্যর্থতার বেদনা বহন করেছে—এভাবেই ভূদেব উপন্যাসটির সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। পূর্ববর্তী দু'টি উপন্যাসের সঙ্গে এ-গ্রন্থের জাতিগত পার্থক্য আছে। বাংলা ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের সূচনা ভূদেবের "অঙ্গুরীয় বিনিময়ে"।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা উপন্যাসের সত্যকার সিদ্ধি।

ছোট গল্পের জন্ম প্রসঙ্গে

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিতে বাংলা উপন্যাস বিস্ময়কর উৎকর্ষ পেল। কিন্তু প্রকৃত ছোট গল্পের জন্ম হতে আরও কিছুকাল কেটেছে। "যুগলাঙ্গুরীয়", "রাধারাণী"কে বড় গল্প বলা চলে, ছোট গল্পের বিশিষ্ট জীবনচেতনা বা আঙ্গিকবোধ এখানে অনুপস্থিত। ক্ষুদ্র উপন্যাস কথাটির প্রচলন এই সময়ে বাংলা সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। যে গুলি ক্ষুদ্র উপন্যাসের পূর্ণতা পেত না তাদের আকৃতি-প্রকৃতি হত অনেকটা নক্শার মত। ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র অনেক নক্শা লিখেছেন ; সঞ্জীবচন্দ্র বা স্বর্ণকুমারী দেবীর হাতে কিছু কিছু ক্ষুদ্র উপন্যাস রচিত হয়েছে। সঞ্জীবের "দামিনী"কে অনেকে ছোট গল্প বলতে চেয়েছেন, কিন্তু তা কোন দিক থেকেই স্বীকার্য নয়।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে ছোট গল্পের আঙ্গিক ও আদর্শ নিয়ে আলোচনা ওঠে। প্রমথ চৌধুরী ১৮৯১ সালে ফরাসী ছোট গল্পের আঙ্গিক অনুসরণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন ; একটি ফরাসী গল্পের ("ফুলদানী") অনুবাদ করেও তিনি পথ দেখাতে চান। ফরাসী গল্পের অনুবাদ শুরু হয়।

প্রায় এই সময়েই (১৮৯২) "হিতবাদী" পত্রিকায় ছোট গল্পের লেখক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় ঘটেছে। বাংলা ছোট গল্প মহিম্ন প্রতিষ্ঠা লাভ করল।

ছোট গল্পের আঙ্গিকের সূক্ষ্মতা ঊনবিংশ শতাব্দীর কথাসাহিত্যিকেরা সহজে আয়ত্ত করতে পারেন নি। এঁদের মধ্যে ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় পুরানো রূপকথা-উপকথা ও আধুনিক ছোট গল্পের মিশ্রণজাত একটা আঙ্গিক আয়ত্ত করে নিজের রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক গল্পগুলির আধাররূপে ব্যবহার করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–৯৪)

পরিচয় ॥ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সমপর্যায়ের প্রতিভাসম্পন্ন

মিসেস মুলেন্স, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে সামান্যত দেখা গিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রে তা বিস্ময়কর বিকাশ লাভ করল। পূর্ববর্তীদের নিকটে তাঁর ঋণের পরিমাণ প্রায় কিছুই নেই, কিন্তু পরবর্তীদের উপরে তিনি গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছেন।

শিল্পীর মন ও ইতিহাসের বিচার ॥ ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস "দুর্গেশনন্দিনী" যখন প্রকাশিত হল বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁকে একটি পুণ্যলগ্ন বলে অনেকেই অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন, "দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ-জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই। আমরা তৎপূর্বে 'বিজয়বসন্ত' 'কামিনীকুমার' প্রভৃতি কতিপয় সেকেলে কাদম্বরী ধরনের উপন্যাস, গার্হস্থ্য পুস্তক সভার প্রকাশিত 'হংসরূপী রাজপুত্র', 'চকমকির বাক্স' প্রভৃতি কয়েকটি ছোট গল্প, এবং 'আরব্য উপন্যাস' প্রভৃতি কয়েকখানি উপকথাগ্রন্থ, আগ্রহের সহিত পড়িয়া আসিতেছিলাম। 'আলালের ঘরের দুলাল' তাহার মধ্যে একটু নূতন ভাব আনিয়াছিল। কিন্তু দুর্গেশ-নন্দিনীতে আমরা যাহা দেখিলাম তাহা অগ্রে কখনও দেখি নাই। দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয় বোধ হইল যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি শিল্পী-মনের বিশিষ্টতা এবং এদের ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্বন্ধে কয়েকটি সূত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক। ইংরেজী উপন্যাস পাঠের ফলেই বাংলায় উপন্যাস লেখার উৎসাহ তিনি বোধ করেছেন, একথা ঠিক। স্কট, ডিকেন্স প্রভৃতির উপন্যাস তিনি আগ্রহ করে পাঠ করেছিলেন। স্কটের কিছু প্রভাব তাঁর ঐতিহাসিক রোমান্সগুলির উপরে পড়েছে বলে মনে হয়। তবে সে প্রভাব বহিরঙ্গ অতিক্রম করে নি। বঙ্কিমের জীবনচেতনার গভীরতা স্কটে নেই। ডিকেন্সের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীচিত্তের বিশেষ সাদৃশ্য ছিল বলে মনে হয় না। ডিকেন্সের উপন্যাসের গঠনরীতি, চরিত্রচিত্রণপদ্ধতি ও জীবনবোধ বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে আদৌ অনুসৃত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কোন বিশিষ্ট বিদেশী ঔপন্যাসিকের প্রভাব লক্ষিত না হলেও ইংরেজী সাহিত্যের চর্চা ও জীবনরসের পরিচিতি তাঁর ঔপন্যাসিক মনোভঙ্গি এবং

পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসজাতীয় রচনা বা গল্পগ্রন্থগুলি দ্বারা তিনি প্রায় কিছুই প্রভাবিত হন নি।

দুই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানত দুই জাতীয় উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর বেশির ভাগ উপন্যাসই ঐতিহাসিক রোমান্স। সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাস সংখ্যায় অনেক কম হলেও গুণগত উৎকর্ষে রোমান্সগুলি অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্স-প্রবণতার কারণটি গুরুতর। নূতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ য়ুরোপীয় চিত্তমুক্তির সংস্পর্শে এসে হৃদয়ের স্বাতন্ত্র্যকে আকাশস্পর্শী করে তুলেছিলেন। কিন্তু তাঁদের বাস্তবজীবন ছিল বিবর্ণ ও সঙ্কীর্ণ। কর্মবহুলতা এবং ঘটনা ও প্রবৃত্তির সংঘাত-কলরোল থেকে এ-জীবন বঞ্চিত। মানুষের জীবনের বিরাট গতি ও তরঙ্গ এর মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। জীবনে যেখানে অজস্র বন্ধন সেখানে মনের বিচিত্র-মুখী মুক্তি সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাই পুরানো ইতিহাসের দিকে ফিরলেন। সেকালে ইতিহাসের মুখ্য পুরুষেরা নানা রোমাঞ্চকর কাজ করত, অতি সহজেই বীরত্ব দেখাতে পারত। সে যুগের ঐশ্বর্য-সম্পদ, পোষাক-পরিচ্ছদ, ভাব-ভঙ্গির মধ্যেও বর্ণখচিত বিচিত্র সৌন্দর্য ছিল। ইতিহাসকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় উপন্যাসগুলিতে কল্পনার রঙে-রসে মানবজীবনের বিচিত্র-উজ্জ্বল ছবি এঁকেছেন এবং মানব-অন্তরের গভীরতম প্রদেশে তলিয়ে যেতে প্রায় কোথাও-ই দ্বিধা করেন নি। চিরকালীন মানবচরিত্র এবং মানবভাগ্য যেন এদের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের মর্যাদা প্রায়ই রক্ষিত হয় নি বলে অভিযোগ শোনা যায়। সন্দেহ নেই এদের ঐতিহাসিকতা মিশ্র ধরনের। কিন্তু উপন্যাস হিসেবে এগুলি যে উচ্চশ্রেণীর তা নিশ্চিত।

তিন। বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক-পারিবারিক উপন্যাসে সমাজসমস্যার প্রসঙ্গ থাকলেও তা জীবনচিত্র ছাপিয়ে উঠে কোথাও বিতর্কপ্রধান ও প্রচার মূলক হয়ে পড়ে নি। পরিবারজীবনের বাস্তব দৈনন্দিন চিত্রের অভাবও এসব উপন্যাসে অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। আসলে স্তিমিত-আবেগ জীবনের প্রতি বঙ্কিমের আকর্ষণ ছিল না। তাঁর সামাজিক উপন্যাসেও তাই ঘটনাগত চাঞ্চল্যে ও বর্ণনার বর্ণসম্পাতে রোমান্সের ছায়া পড়েছে।

চার। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনরীতির বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। তাঁর উপন্যাসে সর্বত্র পূর্ণাঙ্গ সুবলয়িত কাহিনী-নির্মিতি ঘটেছে। একটি সুনির্দিষ্ট সমস্যার কেন্দ্রে সমগ্র কাহিনীটি আবর্তিত হয়, আদি-মধ্য-অন্ত সুস্পষ্টভাবে

চিহ্নিত করা যায়। উপকাহিনী মূল কাহিনীকে নানাভাবে বিকশিত ও তাৎপর্যবহ করে তোলে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ঘটনাবহুল। ঘটনায় নাটকীয় চমক ও চমৎকারিত্ব, উত্থান-পতনময় সংঘাতসৃষ্টির দিকে তাঁর প্রবণতা আছে; আবার কচিৎ অলৌকিকতার স্পর্শ দিয়ে রহস্যের জাল বিস্তারও তিনি করেছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বঙ্কিমের কবিত্ব। বর্ণনায় ও উপলব্ধির ব্যাখ্যানে এই কবিসুলভ মনোভাব ও প্রকাশরীতি তাঁর উপন্যাসে মিশ্র আস্বাদ এনেছে। বিশ্লেষণরীতিকে কতকটা স্বীকার করেও পূর্ণ মর্যাদা তিনি দেন নি। চরিত্র-বিকাশের চিত্রাঙ্কনে কিছু বিশ্লেষণ এবং বেশির ভাগ স্তরনির্দেশের আশ্রয় নিয়েছেন। বাংলাদেশের পরবর্তী ঔপন্যাসিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের খণ্ড উপন্যাসগুলিতেই মাত্র এই গঠনরীতি থেকে মৌলিক বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের পূর্বে বাংলা উপন্যাসের গঠনরীতিতে সাধারণভাবে নবধারা প্রবর্তিত হয় নি।

পাঁচ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি আকারে খুব বৃহৎ না হলেও এদের মধ্যে মহাকাব্যিক বিস্তার ও উদাত্ততা অনুভব করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র আপন জীবনবোধ ও রচনাভঙ্গির বিশিষ্টতায় সহজভাবেই এই উপন্যাসগুলিতে ত্রিমাত্রিকতার বোধ সঞ্চার করেছেন। ক্ষুদ্র উপন্যাসের ক্ষেত্রে তিনি স্বভাবতই ক্লেশবোধ করেছেন। এগুলি আসলে অপূর্ণাঙ্গ ও অপুষ্ট উপন্যাস, ছোট গল্পের প্রাক্‌রূপ। ছোট গল্পকারের জীবনদৃষ্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনবোধের পার্থক্য এত বেশি যে তাঁর পক্ষে ছোট গল্প লেখার চেষ্টাও সম্ভব ছিল না।

গ্রন্থাবলী॥ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির দিকে লক্ষ্য করলে ভাবচেতনা ও রূপরচনাগত কিছু কিছু বিবর্তনের সূত্র লক্ষ্য করা যায়। "দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৬৫) বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। প্রস্তুতিকালীন অপরিণতির চিহ্ন এর সর্বাঙ্গে। "কপালকুণ্ডলা" (১৮৬৬) এবং "মৃণালিনী" (১৮৬৯) এই দু'টি উপন্যাস নিয়ে প্রথম পর্ব কল্পনা করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্বের মধ্যে ধরা চলে "বিষবৃক্ষ" (১৮৭৩), "ইন্দিরা" (১৮৭৩), "যুগলাঙ্গুরীয়" (১৮৭৪), "চন্দ্রশেখর" (১৮৭৫), "রজনী" (১৮৭৭), "কৃষ্ণকান্তের উইল" (১৮৭৮) এই কটি উপন্যাসকে। "রাজসিংহে" (১৮৮২) একটি নবতর পর্বের সূত্রপাত ঘটলেও তাঁর বিকাশ হয়েছে "আনন্দমঠ" (১৮৮৪) থেকে। এই পর্বের অন্যান্য গ্রন্থ হল "দেবী চৌধুরাণী" (১৮৮৪), "রাধারাণী" (১৮৮৬) ও "সীতারাম" (১৮৮৭)। এ ছাড়া "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" নামে একটি ব্যঙ্গাত্মক ক্ষুদ্র উপন্যাসও তিনি লিখেছিলেন।

দুর্গেশনন্দিনীতে বঙ্কিম জীবনবিচ্যুত যে বিশুদ্ধ রোমান্সরসে মগ্ন হয়েছিলেন সেখানে দীর্ঘকাল বাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি জীবনের গভীরতর প্রদেশে অবগাহন করে শিল্পসৌন্দর্যের উপকরণ সংগ্রহ করতে চান। রোমান্সঘন পরিবেশটির মধ্যেই মানবজীবন ও বিশ্বনিখিলের রহস্যাবৃত সত্য নিয়ে প্রশ্ন তুললেন তিনি কপালকুণ্ডলা আর মৃণালিণীতে। একদিকে মানবীয় প্রেম-কামনার দাবদাহ, অপরদিকে নিরাসক্ত প্রকৃতির রহস্য; বঙ্কিমচন্দ্র কপাল-কুণ্ডলা এবং মনোরমার চরিত্রকে আশ্রয় করে যেন বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু এই ভাব-কল্পনার মূলে যত বড় দার্শনিকতাই থাক না কেন, তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে, মানবজীবন ও মানবিক কামনার প্রতি অস্বীকৃতি। বঙ্কিমচন্দ্র তাতে আদৌ তৃপ্ত হতে পারলেন না।

দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে বেশির ভাগই সামাজিক। বিষবৃক্ষ উপন্যাসে তিনি মানবের জীবনসমস্যাকে দার্শনিক রহস্যলোক থেকে সমাজ-ভূমিতে নামিয়ে আনলেন। এই সময়কার প্রধান চারটি উপন্যাসে (বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল) মুক্তপ্রেম এবং সামাজিক নীতিবোধের সংঘর্ষকে তীব্রভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে বহু ক্ষেত্রে মনে হয় বঙ্কিম মুক্তপ্রেমের শক্তি সম্বন্ধে অবহিত হলেও নৈতিক আদর্শবাদের কাছে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেছেন। কিন্তু গভীরতর পর্যবেক্ষণে দেখা যাবে যে বঙ্কিম প্রেমাকুতির প্রবলতা ও বিচিত্র রহস্য দেখে বিস্ময়াহত হয়েছেন। এটি প্রধানত সামাজিক উপন্যাসের পর্ব হলেও এই কালসীমায়ও দু'খানা রোমান্স রচনা না করে তিনি পারেন নি। পর পর দু'খানার বেশি সামাজিক উপন্যাস তিনি লিখতে পারেন নি, ঐতিহাসিক রোমান্সের রাজ্য তাঁকে আকর্ষণ করেছে। চন্দ্রশেখর অবশ্য রোমান্স হলেও শৈবলিনীর ব্যক্তিপ্রেমের সমস্যাই সেখানে প্রধান। বিষবৃক্ষ, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইলে যে সমস্যা পুরুষের, চন্দ্রশেখরে নারীর জীবন ও ভাগ্যে সেই একই সমস্যা আবর্তিত। এ-গ্রন্থ সম্পূর্ণত বর্তমান পর্বের ভাববৃত্তের অনুসারী। কিন্তু ইন্দিরা এবং যুগলাঙ্গুরীয়ে অগভীর তরল রসের প্রাধান্য। সম্ভবত শিল্পীপ্রাণের ক্ষণিকের বিশ্রাম কামনা (বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর রচনার তীব্র অনুভূতির মাঝখানে শ্রান্তি আসা স্বাভাবিক) এই দু'টি ক্ষুদ্র রচনার জন্ম দিয়েছে।

তৃতীয় পর্বের সূত্রপাত রাজসিংহে। কিন্তু রাজসিংহে আলোচ্য পর্বের একটি মাত্র লক্ষণ স্পষ্ট। এই উপন্যাসে বঙ্কিম হিন্দুর বীরত্ব প্রতিপাদনের মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার বোধ জাগাতে চেয়েছেন। কিন্তু এই পর্বের স্পষ্ট

লক্ষণ পরবর্তী তিনটি উপন্যাসে (রাধারাণী বাদ দিয়ে) লক্ষ্য করা যায়। এক। বঙ্কিমচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন যে বাঙালী হিন্দু সেকালে বহু বীরত্বপূর্ণ কর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এবং দুর্গত জনগণের সেবা করতে চেয়েছে। দুই। ইতিহাসকে (ক্ষীণভাবে হলেও) তিনি অনুসরণ করতে চেয়েছেন। পূর্ববর্তী পর্বের স্বল্প কয়েকটি গ্রন্থের পরে তিনি আবার ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের রাজ্যে প্রবেশ করেছেন। তিন। গ্রন্থত্রয়ে তিনি গীতার নিষ্কাম কর্মের এবং অনুশীলন তত্ত্বের সার্থকতা প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। কিন্তু মানবহৃদয়ে প্রেমের প্রবল শক্তি এখানেও সব তাত্ত্বিক চেতনাকে অতিক্রম করে প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইচ্ছা থাকলেও বঙ্কিম তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নেওয়া যাক।

"দুর্গেশনন্দিনী" উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের সীমান্তে মুঘল-পাঠানদের যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। কিন্তু এ-গ্রন্থে কল্পনাই প্রাধান্য পেয়েছে। মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ, পাঠানরাজকন্যা আয়েষা এবং গড়মন্দারণের দুর্গাধিপতির কন্যা তিলোত্তমার কাল্পনিক ও বর্ণাঢ্য প্রণয়কাহিনী উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। সমকালীন বাংলা গল্প সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসের মান অনেক উচ্চে হলেও এটিতে অপরিণত হাতের ছাপ সহজেই চোখে পড়ে। জগৎসিংহের চরিত্রের প্রাণহীনতা, ঘটনার (বিশেষ করে বিমলার উপকাহিনীর) অতি জটিলতা এবং সর্বোপরি সুগভীর জীবনচেতনার অভাব এই উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি। তবে আয়েষার ব্যর্থ প্রণয়ী পাঠানবীর ওসমানের কঠিন ঔদার্য, বিমলার রহস্য-কৌতুকের অন্তরালস্থিত গোপন বেদনা, তিলোত্তমার নম্র কোমলতা এবং আয়েষার প্রগল্‌ভ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য তাদের চরিত্রকে প্রাণপূর্ণ করে তুলেছে।

(মাত্র এক বৎসর পরে রচিত "কপালকুণ্ডলায়" দুর্গেশনন্দিনীর দুর্বলতার চিহ্নমাত্র নেই। এই উপন্যাসের বাহুল্যহীন একমুখী গঠনরীতি যেমন কবিত্বপূর্ণ তেমনি নাটকীয় সৌন্দর্যের সংযোগে অভিনব হয়ে উঠেছে। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালের পটভূমি দূর থেকে ক্ষীণভাবে মূল কাহিনীর প্রান্তদেশকে রঞ্জিত করেছে। কপালকুণ্ডলা নাম্নী নারীর কাহিনীই এ উপন্যাসের প্রধান সম্পদ। কপালকুণ্ডলা সমুদ্রবেলায় বিজন অরণ্যে কাপালিক কর্তৃক পালিত। নিরাশ্রয় জীবনে প্রকৃতির সহজ সত্তার তার চরিত্রের অচ্ছেদ্য ধর্ম পরিণ-

হয়েছে। মানবজীবনের প্রেমপ্রীতির প্রতি কোন আসক্তিই সে অনুভব করে না। তাকে ভালবেসে নবকুমারের প্রেমতরঙ্গিত হৃদয় তাই আশ্রয় পেল না। ট্রাজেডির সুতীব্র হাহাকারে উপন্যাসটি শেষ হল। কপালকুণ্ডলার চরিত্রে বঙ্কিম এক অতল গভীর রহস্যের সৃষ্টি করেছেন। সরল সেবাপরায়ণতা ও কারুণ্যের অন্তরালে নিষ্করুণ নিরাসক্তি তার চরিত্রে দানা বেঁধেছে। নবকুমারের স্বল্পবাক সংযমের অন্তরালবর্তী রূপোন্মাদনা ও ট্রাজিক আর্তি প্রাণবন্ত চরিত্ররূপ লাভ করেছে। পদ্মাবতী বা মতিবিবিকে অবলম্বন করে বঙ্কিম জীবনের অপর একটি প্রত্যয় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। মুঘলদের রাজসম্পদের মধ্যে বাস করেও তার হৃদয় তৃপ্ত হয় নি। দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবকুমারকে ভালবেসে সে সবই অনায়াসে পরিত্যাগ করতে পারল—প্রেমের এই প্রচণ্ড শক্তির চমৎকার চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে।

কপালকুণ্ডলার উৎকর্ষ "মৃণালিনী"তে নেই। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে পশুপতিপ্রমুখ রাজপুরুষদের ষড়যন্ত্রে মুসলমানগণ বাংলাদেশ অধিকার করল, এই উপন্যাসে সে-কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তবে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর প্রণয়কাহিনী গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু তাদের চরিত্র ভাল ফোটে নি। ক্রূরবুদ্ধি পশুপতি কিন্তু মনোরমার প্রতি সুগভীর ভালবাসায় সামান্য দুর্বৃত্তের ঊর্ধ্বস্তরে উঠেছে। মনোরমার চরিত্রে আসক্তি-নিরাসক্তির আলো-ছায়ার বর্ণবিন্যাস অপরূপ রহস্যের সৃষ্টি করেছে। তার চরিত্রকল্পনাই এই উপন্যাসের প্রধান গৌরব।

"বিষবৃক্ষ" বঙ্কিমের একটি ত্রুটিহীন সামাজিক উপন্যাস। নগেন্দ্রনাথ পরমাসুন্দরী পত্নী সূর্যমুখীকে গভীরভাবে ভালবাসত। কিন্তু তরুণী বিধবা কুন্দনন্দিনীর প্রতি তার হৃদয় আকৃষ্ট হল। সে কিছুতেই নিজ চিত্তকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারল না। তারই ফল নগেন্দ্র-কুন্দের বিবাহ এবং সূর্যমুখীর গৃহত্যাগ। পরিশেষে কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করল। নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর পুনর্মিলন ঘটল। কিন্তু এ-মিলন বাহিরের। ট্রাজেডির মৌন হাহাকার দু'জনের মধ্যে অনন্ত পার্থক্যের রেখা টেনে রাখল। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র সুঅঙ্কিত। কুন্দের চরিত্রটি একটি নম্র কুন্দফুলের মতই কোমল ও করুণ। সূর্যমুখী ব্যক্তিত্বের মহিমায় উজ্জ্বল। কিন্তু নগেন্দ্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্র সবচেয়ে সার্থকভাবে অঙ্কিত। মানবচরিত্রের রহস্য সে ভেদ করতে চেয়েছে। সূর্যমুখীর মত পত্নী যার গৃহে কুন্দর প্রতি তার এত গভীর আকর্ষণ কেন জন্মাল—এর উত্তর সে খুঁজেছে, কিন্তু পায় নি। প্রেম কি চিরন্তন

নয়, নারীসৌন্দর্য কেন আকর্ষণ করে—নগেন্দ্র নিজের জীবন দিয়েও এর উত্তর পায় নি।

"ইন্দিরা" লঘুরসাত্মক ক্ষুদ্র কমেডি। সামাজিক পটভূমিকায় রচিত হলেও রোমান্সের রঙ ঘটনাবিন্যাসে গাঢ় হয়েই পড়েছে। তবে "যুগলাঙ্গুরীয়" রচনা হিসেবে ব্যর্থ। বৃহত্তর উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্ত খসড়া বলে একে গ্রহণ করাই সঙ্গত।

"চন্দ্রশেখর" উপন্যাসে মীরকাশিম ও ইংরেজদের সংঘর্ষের পটভূমিতে পারিবারিক জীবনের সমস্যাই প্রধান হয়ে উঠেছে। শৈবলিনী চন্দ্রশেখরের পত্নী, কিন্তু বাল্যসাথী প্রতাপের প্রতি তার সুগভীর আকর্ষণ। এরই পরিণতিতে সে চন্দ্রশেখরের গৃহ পরিত্যাগ করল এবং ঘটনাচক্রে রাষ্ট্র-বিপর্যয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। পরিণতিতে প্রতাপকে প্রাণ হারাতে হল। চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে শৈবলিনী বঙ্কিমচন্দ্রের এক আশ্চর্য সৃষ্টি। প্রতাপের প্রতি সুগভীর আকর্ষণে, সমাজশক্তির প্রচণ্ড নিষ্পেষণে, দুঃখের তীব্র দাবদাহে তার চরিত্রমহিমা প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র শৈবলিনীকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়েছেন; সেক্ষেত্রে তাঁর নীতিবাগীশ মনোভাব কিছু উগ্র হয়ে উঠেছে। অপরাপর চরিত্রের মধ্যে দলনীর ভূমিকাটি ক্ষুদ্র, কিন্তু একাগ্র প্রেমমাহাত্ম্যে উজ্জ্বল। মীরকাশিমের রাজকীয় মাহাত্ম্য এবং চন্দ্রশেখরের উদার গাম্ভীর্য অল্প পরিসরে সুন্দর ফুটেছে।

"রজনী" উপন্যাসেও কোথাও কোথাও লেখকের নীতিবোধের তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসে লবঙ্গ-অমরনাথের অসামাজিক প্রেমের দহনজ্বালা এবং উদ্গতিপ্রচেষ্টা তথা শচীশ-রজনীর রোমান্টিক প্রণয় সার্থকতার সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। এই উপন্যাসের গঠনরীতিটি কিছু অভিনব। চারটি পাত্রপাত্রীর আত্মকথনরূপে কাহিনীবিন্যাস ও চরিত্রচিত্রণ বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে।

"কৃষ্ণকান্তের উইল" বঙ্কিমের একখানি প্রধান উপন্যাস। গোবিন্দলাল বিধবা রোহিণীর রূপে মুগ্ধ হয়ে ভ্রমরকে পরিত্যাগ করেছিল। ফলে গোবিন্দলালের জীবনে বিপর্যয় দেখা দিল। রোহিণী গোবিন্দলালের হাতে মৃত্যুবরণ করল। ভ্রমরও এদিকে স্বামীর অবহেলায় দুঃখে প্রাণত্যাগ করল। অভিমানিনী ভ্রমরের তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্ব বঙ্কিম সার্থকভাবে ফুটিয়েছেন। রোহিণীর চরিত্রটি তাঁর এক অপূর্ব সৃষ্টি। যে রূপ আগুনের শিখার মত পতঙ্গকে পুড়িয়ে মারে, রোহিণীর মধ্যে তার ছবি বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন। সে আপন

দেহের সৌন্দর্য এবং মনের কামনা-বাসনার আগুনে গোবিন্দলালের সংসার এবং জীবন বিপর্যস্ত করল এবং পরিশেষে নিজেও পুড়ে মরল। রোহিণীর এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যে অতৃপ্ত যৌবনাকাঙ্ক্ষা আছে লেখক সহানুভূতির সঙ্গে তার চিত্র এঁকেছেন। কিন্তু রোহিণীর পরিণতির চিত্র আরও বিশ্লেষণের দ্বারাই মাত্র অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারত।

"রাজসিংহ" উপন্যাসে ইতিহাসের অধিকতর সামীপ্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই রচনাটিকে তাঁর একমাত্র খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করেছেন। রাজসিংহ-ঔরংজীবের সংগ্রামকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি রচিত। প্রেম, সৌন্দর্যতৃষ্ণা ও বিচিত্র প্রবৃত্তির তরঙ্গভঙ্গ উপন্যাসটিকে জটিল করে তুলেছে। এর পটভূমির বিস্তার মহাকাব্যসুলভ বিপুলতার দ্যোতনা এনেছে। চরিত্রচিত্রণের দিক থেকে এই উপন্যাস বঙ্কিমের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। ঔরংজীবের কুটবুদ্ধির অন্তরালে সুপ্ত জীবনতৃষ্ণা, রাজসিংহের বুদ্ধিদৃপ্ত আদর্শবাদ, চঞ্চলকুমারীর নির্ভীক আদর্শপূজা, নির্মলকুমারীর কৌতুকোজ্জ্বল ব্যঙ্গবোধ, দস্যু মানিকলালের ধূর্ত রণচাতুর্য, জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু জেবউন্নিসার চরিত্রই এই উপন্যাসের প্রধান আকর্ষণ। জেবউন্নিসা সুখ-সম্পদ-বিলাসের মধ্যে বাস করে ভেবেছিল জীবনে প্রেমের মূল্য নেই। গভীর দুঃখের আঘাতে প্রেমের রাজ্যে তাকে জেগে উঠতে হয়েছিল। বিলাস-সম্পদকে তখন সে অনায়াসে তুচ্ছ করল।

"আনন্দমঠ" উপন্যাস বাঙালী তরুণদের একদা স্বাদেশিকতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পটভূমিকায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহের আভাস নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। অনুশীলন তত্ত্ব ও নিষ্কাম কর্মের আদর্শে দেশসেবী সন্তানদল সত্যানন্দ, ভবানন্দ, জীবানন্দের নেতৃত্বে এখানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছে। উপন্যাস হিসেবে ভবানন্দের আদর্শচ্যুতিই এর প্রধানতম বিষয়, কিন্তু তাও একান্ত অপুষ্ট।

আনন্দমঠের ন্যায় "দেবী চৌধুরাণী"ও উপন্যাস হিসেবে যথেষ্ট সফল রচনা নয়। ইংরেজ রাজত্ব আরম্ভের যুগে অরাজকতার পরিবেশে স্বদেশী দস্যুদলের কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। প্রফুল্লের চরিত্রে অনুশীলন ধর্ম ও নিষ্কাম কর্মের তত্ত্ব নিয়ে ঔপন্যাসিক যে পরীক্ষা করেছেন তা কতটা সফল হয়েছে ভাবার মত। স্বামীর সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্রই তার সব সংযমের বাঁধ মনের দিকথেকে ভেঙে পড়েছে। প্রফুল্ল চরিত্রের উপলব্ধিতে বঙ্কিমের শিল্পী-মনই জয়লাভ করেছে।

বঙ্কিমের এই পর্বের রচনার মধ্যে "সীতারাম" সর্বশ্রেষ্ঠ। জমিদার সীতারাম মুসলমান শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেছিল। কিন্তু নারী-রূপমোহে মুগ্ধ সীতারাম শেষ পর্যন্ত সব কিছু হারাতে বাধ্য হল। অথচ এই নারী শ্রী তার বিবাহিত পত্নী। যে ছিল সহজলভ্য, নিয়তির বিধানে সে হয়ে পড়ল দুর্লভ। পুরুষসিংহ সীতারামের সুগভীর রূপতৃষ্ণা এবং তজ্জাত পতন দেখে পাঠকচিত্ত হাহাকার করে ওঠে। সীতারামের মত পুরুষ-চরিত্র বাংলা সাহিত্যে বড় সুলভ নয়। নন্দা, রমা, জয়ন্তী প্রভৃতি ক্ষুদ্র চরিত্রগুলিও এই উপন্যাসে ভালই ফুটেছে।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)

পরিচয় ॥ রমেশচন্দ্র দত্তের ন্যায় পণ্ডিত মনীষী ব্যক্তি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ। প্রাচীন ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচনায় তিনি যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা দেশ-বিদেশে তাঁকে বিখ্যাত করেছিল। বৈদিক গ্রন্থাদি এবং রামায়ণ-মহাভারতের অনুবাদেও তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। ভারতের সমসাময়িক কালের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা তাঁর অপর কীর্তি। রমেশচন্দ্রের এই গ্রন্থাবলী ইংরেজীতে রচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বানে তিনি বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

গ্রন্থাবলী ॥ রমেশচন্দ্রের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে গভীর আগ্রহ ছিল। তিনি স্কটের উপন্যাসের একজন ভক্ত পাঠক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়েই তিনি প্রবেশ করলেন। তাঁর চারখানি উপন্যাস ইতিহাসাশ্রিত—"বঙ্গবিজেতা" (১৮৭৪), "মাধবীকঙ্কণ" (১৮৭৭), "জীবন প্রভাত" (অর্থাৎ মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, ১৮৭৮) এবং "জীবন সন্ধ্যা" (অর্থাৎ রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, ১৮৭৯)। তিনি অবশ্য দু'খানি সামাজিক উপন্যাসও লিখেছিলেন,—"সংসার" (১৮৮৬) এবং "সমাজ" (১৮৯৪)।

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে ইতিহাসের পণ্ডিতের তথ্যনিষ্ঠা আছে। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "তিনি বর্ণিত যুগের বিশেষত্বটুকু উপলব্ধি করেন, বীরত্বকাহিনীর উন্মাদনা নিজ রক্তের মধ্যে অনুভব করেন ও বর্ণিত বিষয়ের মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন।" কিন্তু ইতিহাসের ধারার সঙ্গে ব্যক্তি-হৃদয়ের নিগূঢ় যোগসাধনে তিনি সফল হন নি। "স্কটের মত তাঁহারও মনস্তত্ত্বজ্ঞান নিতান্ত প্রাথমিক (elementary) রকমের ; বাহ্য ঘটনার সংঘাত ফটাইয়া তুলিতে তিনি

এত ব্যস্ত, ইতিহাসের বৃহত্তর বিকাশগুলিতেই তিনি এত নিবিষ্টচিত্ত যে অন্তর্জগতের দ্বন্দ্ববিপ্লব বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার অবসর হয় নাই।” (—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।)

“বঙ্গবিজেতা” উপন্যাসে যে ঐতিহাসিক পটভূমি আছে তা একান্ত ক্ষীণ। কাল্পনিক বীরত্ব এবং দেশপ্রেমই এই উপন্যাসের প্রধান বিষয়। আকবরের রাজত্বকালে টোডরমল্ল ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। এই সময়ে অমরসিংহ নামক এক জমিদার বিদ্রোহ করেন। ইন্দ্রনাথ নামে এক যুবক টোডরমল্লের পক্ষে অমরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রভূত বীরত্ব ও সৎসাহসের পরিচয় দেন। এই ঘটনার পটভূমিতে ইন্দ্রনাথ ও সরলার প্রণয়কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এরই মধ্যে চন্দ্রশেখর নামক সন্ন্যাসী, শকুনি নামক শয়তান, বিশ্বেশ্বরীর মত উন্মাদিনী, সতীশচন্দ্রের মত বিশ্বাসঘাতক প্রভৃতি নানা চরিত্রের ভীড় জমেছে। নানা মানুষ ও অজস্র ঘটনায় উপন্যাসটি শ্বাসরুদ্ধকর। চরিত্রগুলি আদৌ সুঅঙ্কিত নয়, ঘটনাবিকাশের অনিবার্যতাও স্বীকার্য নয়। বঙ্গবিজেতা রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস, এটির দুর্বলতা সর্বাংশে প্রকট।

পরবর্তী উপন্যাস “মাধবীকঙ্কণ” সব দিক থেকেই অনেক পরিণত রচনা। এ উপন্যাসেও ঘটনার বাহুল্য আছে, কিন্তু চরিত্রচিত্রণ তুলনামূলকভাবে অনেক সার্থক। সাজাহানের রাজত্বকালের পটভূমি এখানে গৃহীত হয়েছে, কিন্তু পূর্ববর্তী উপন্যাসের মত মূল কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগ সামান্যই। কিন্তু পৃথক পৃথক ভাবে প্রণয়কাহিনী যেমন সুচিত্রিত, মুঘল রাজ্যব্যবস্থার ঐতিহাসিক চিত্রও সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণিত। কেন্দ্রীয় প্রণয়কাহিনীটি ক্ষুদ্র, কিন্তু রচনাভঙ্গির গুণে হৃদয়গ্রাহী। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে এই প্রণয় কাহিনীটির তাৎপর্য প্রকাশ পেয়েছে, “ইহা একদিকে যেমন সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সমাজোপযোগী হইয়াছে, অপর দিকে সেইরূপ তীব্র আবেগময় ও উচ্ছ্বসিত জীবনরসে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।…এই প্রেমচিত্রটিতে সর্বত্রই একটা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণশক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। নরেন্দ্র ও শ্রীশ উভয়ের সঙ্গে হেমের ব্যবহারের যে একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে তাহা লেখক অল্প কথায় কিন্তু অতি স্পষ্টভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নরেন্দ্রের উচ্ছ্বসিত, অদম্য—রোষাভিমানক্ষুব্ধ প্রণয় হেমের সমস্ত বাহ্য সংকোচ ও ছদ্ম ঔদাসীন্যের আবরণ ভেদ করিয়া নিজ দুর্নিবার বেগ তাহার হৃদয়ের গোপন স্তরে সঞ্চারিত করিয়াছে, নিজ সামান্য স্পর্শে তাহার অন্তরের গভীর প্রেমকে সজাগ ও উন্মুখ করিয়া

তুলিয়াছে; শ্রীশের শান্ত, চাঞ্চল্যহীন ভালবাসা তাহার হৃদয়ে কেবল গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়াছে। বাহ্যতঃ হেমের সমস্ত শ্রদ্ধা, ভক্তি, আনুগত্য অসংকোচে শ্রীশকে আশ্রয় করিয়াছে; কিন্তু তাহার বালিকা-হৃদয়ের সমস্ত নীরব, স্ফুটনোন্মুখ প্রেম নরেন্দ্রের জন্য গোপনে সঞ্চিত রহিয়াছে।" নরেন্দ্র-হেমের প্রণয়কথাই এই উপন্যাসের এবং রমেশচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে গভীরতম অংশ।

বঙ্গবিজেতা ও মাধবীকঙ্কণের তুলনায় পরবর্তী দু'টি উপন্যাসে ইতিহাসের কথা অধিকতর গুরুত্ব পেয়েছে। বলা যেতে পারে মানবজীবন-কথা ইতিহাসের ঘটনাবর্তকে ছাপিয়ে উঠতে পারে নি। কল্পনাকে ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিকতার উপরে আদৌ স্থান দেন নি।

মহারাষ্ট্র "জীবন প্রভাত" রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ঔরংজীবের সঙ্গে শিবাজীর সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে মারাঠা জাতি কিরূপে শক্তি সঞ্চয় করল সে কাহিনীই বর্তমান উপন্যাসের উপজীব্য। এ উপন্যাসেও ঘটনার বাহুল্য আছে, কিন্তু কোন ঘটনায়ই ইতিহাসের মর্যাদা লঙ্ঘিত হয় নি। এমন কি চরিত্র-সৃষ্টিতেও তিনি ইতিহাসের আনুগত্য রক্ষা করেছেন। মারাঠী বীরদের স্বাধীনতা কামনার মধ্যে যেন লেখকের মনোভাবই প্রতি-ফলিত হয়েছে। কিন্তু স্বাজাত্যবোধ প্রচার করতে গিয়ে ঐতিহাসিক তথ্যনিষ্ঠা থেকে লেখক বিচ্যুত হন নি; কোন ঘটনা বা চরিত্রের বিকৃতিসাধন তিনি করেন নি। ঔরংজীবও যথেষ্ট স্বাভাবিক বর্ণে চিত্রিত হয়েছে। রঘুনাথ ও সরযূর প্রেম-কাহিনীটি উপন্যাসের অপ্রধান অংশ। মূল ঐতিহাসিক অংশের সঙ্গে তার বন্ধন দৃঢ় না হওয়ায় সামগ্রিকভাবে কোন ক্ষতি হয় নি।

রাজপুত "জীবন সন্ধ্যা"য় ঐতিহাসিক ঘটনার সমাবেশে মানবজীবনের আভ্যন্তরীণ চিত্র একেবারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। এ উপন্যাসেও ঘটনার বাহুল্য এবং অত্যন্ত দ্রুতগতি শ্বাস রুদ্ধ করে। আকবর ও জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁদের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপসিংহের নেতৃত্বে রাজপুতদের সংগ্রাম এবং পরিশেষে পরাজয়ের কাহিনী এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু। তেজসিংহ ও পুষ্পকুমারীকে কেন্দ্র করে যে প্রেম-কাহিনী এর মধ্যে আছে, ঐতিহাসিক ঘটনার চাপে তা প্রাণহীন। লেখকের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের পরিচয় থাকলেও "জীবন সন্ধ্যা" উপন্যাস হিসেবে সার্থক নয়।

রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে বিদেশী উপন্যাসের প্রভাব নেই; বঙ্কিম—

সামাজিক উপন্যাস থেকেও এদের সুর ও ভাবের পার্থক্য সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমের সামাজিক উপন্যাসগুলি মানব-মনের সুগভীর রহস্যলোকে পাঠককে নিয়ে যায়। রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস খুব গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। মানবজীবন ও ভাগ্যের উপরতলের ছবি তাঁর উপন্যাসে মেলে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের অন্তরের কথা জানবার জন্য তাঁর সব কল্পনা, অনুভূতি ও চিন্তাকে নিযুক্ত করেছিলেন, বাহিরের দিকে তাই কিছু ঘাটতি পড়েছে। আমাদের পরিবার ও সমাজজীবনের কোন বাস্তবচিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বড় মেলে না। সে অভাব পূরণ করল রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাস দু'খানি। পল্লীবাংলার সমাজ ও পরিবারজীবন, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, কৈবর্ত প্রভৃতি অতি সাধারণ চাষা-ভূষা শ্রেণীর মানুষ তাদের সামান্য সুখদুঃখ নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর উপন্যাসে। গভীর সহানুভূতির সঙ্গে এই চরিত্রগুলি তিনি সৃষ্টি করেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "সামাজিক উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের বিশেষ গুণ তাঁহার সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ-শক্তি ও পল্লীগ্রামের দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ জীবনের প্রতি করুণ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি। তাঁহার সামাজিক উপন্যাসে কোন গভীর বিশ্লেষণ নাই, কেননা তিনি যে সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কোন বিশ্লেষণযোগ্য জটিলতা নাই।" এই দু'টি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র অসবর্ণ বিবাহ এবং বিধবা বিবাহ এই সামাজিক সমস্যার উত্থাপন করেছেন। সমাজ এবং হৃদয় এই দুই বোধের দ্বন্দ্ব বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে পুষ্ট করেছে, রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসেও এই দ্বন্দ্বের বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। রমেশচন্দ্র অবশ্য সংস্কারের পক্ষে মত দিয়ে বলেছেন, "On principle inter-caste marriage is a duty with us, because it unites the divided and enfeebled nation and we should establish this principle (as well as widow marriage, & c) safely and securely in our little society, so that the greater Hindu society, of which we are only a portion and the advanced guard, may take heart and follow. I can not tell you how deeply I have felt this for years past ; of my last two novels 'Sansar' goes in for widow marriage, and 'Samaj'...goes in for inter-caste marriage." "সমাজে" ঔপন্যাসিকের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সঙ্গে শিল্পবোধ সমন্বিত হয়েছে। কিন্তু "সংসারে" তা হয় নি, এখানে প্রচারধর্মই প্রধান হয়ে উঠেছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২)

পরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী বাংলা সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। বিচিত্র ধরনের সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁর ছিল। উপন্যাস, গল্প, নাটক এবং কবিতা রচনায় তিনি যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন। সাময়িকপত্র সম্পাদনায়ও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় আছে। তাঁর সম্পাদিত "ভারতী" পত্রিকা সমকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। আসলে "ইংরেজী সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত সংযোগের পর বাংলা দেশের সাহিত্যে যে নবজাগরণ হয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর কণ্ঠেই দেশের নারী-সমাজের পক্ষে তাহার প্রথম কলগীতি ধ্বনিত হইয়া উঠে।"

গ্রন্থাবলী ॥ কবিতা ও নাট্যরচনায়ও স্বর্ণকুমারী আগ্রহের পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাস রচনায়ই তিনি সর্বাধিক কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে "দীপ নির্বাণ" (১৮৭৬), "ছিন্নমুকুল" (১৮৭৯), "মালতী" (১৮৮০), "মেবার রাজ" (১৮৮৭), "হুগলীর ইমামবাড়ী" (১৮৮৮), "স্নেহলতা" (১৮৯০, ১৮৯৩), "বিদ্রোহ" (১৮৯০), "ফুলের মালা" (১৮৯৫), "মিলন রাত্রি" প্রভৃতির নাম করা চলে। "নবকাহিনী" (১৮৯২) নামে গল্পের সঙ্কলনও তাঁর আছে। এগুলি ছোট গল্পের রূপসিদ্ধিতে না পৌঁছলেও একেবারে মূল্যহীনও নয়। সামাজিক এবং ঐতিহাসিক দু'ধরনের উপন্যাস রচনায়ই তিনি সমান উৎসাহ বোধ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত কল্পনার প্রসার এবং মানবজীবন ও ভাগ্যের গভীরতম প্রদেশ মন্থন করবার দিকে তিনি যান নি, রমেশচন্দ্রের সহজ জীবনবোধ ও তথ্যনিষ্ঠার প্রতিই তিনি অধিক আকর্ষণ অনুভব করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস "দীপ নির্বাণে" কাঁচা হাতের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। চিতোর রাজপরিবারের কথা এবং মহম্মদ ঘোরীর প্রসঙ্গ একে ঐতিহাসিক উপন্যাসের রঙ দিয়েছে, কিন্তু তা উপন্যাসটির সাধারণ বিবর্ণতা ঘোচাতে পারে নি। বাংলা দেশের পাঠান যুগের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে লেখা "ফুলের মালা" তুলনায় অনেক পাকা হাতের রচনা। কিন্তু রাজপুতনার ইতিহাস নিয়ে লেখা "মেবার রাজ" ও "বিদ্রোহ" তার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট। দ্বিতীয় উপন্যাসটি কিন্তু প্রথমটির তুলনায় অনেক পরিণত। তথ্য সন্নিবেশের ঘনত্ব, বিশ্লেষণের সূক্ষ্মতা, ট্রাজেডির দাবদাহ, প্রবৃত্তির সংঘাত এবং ভীলেদের জীবনচর্চার বর্ণনায় ও ভাষার কবিত্বে উপন্যাসটি নানা দিক থেকেই উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

সমকালীন সমাজজীবনের আদর্শ-সংঘাতের ছায়া স্বর্ণকুমারীর সামাজিক উপন্যাসগুলির উপরে কিছু গভীরভাবে পড়েছে। ফলে এদের সহজ পারিবারিক আবেদন প্রায়ই তর্ককণ্টকিত উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতায় আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে। "স্নেহলতা" উপন্যাসের প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রায় পৃথক রচনা। বিধবাবিবাহ এবং অন্যবিধ সামাজিক সংস্কার প্রচারই উপন্যাসের ধর্মকে অতিক্রম করে বড় হয়ে উঠেছে। ফলে চরিত্রগুলির ব্যক্তিত্ববিকাশ যেমন স্বাভাবিক হয় নি তেমনি মানবিক রসও বহুলাংশে ব্যাহত হয়েছে। এর মধ্যে "কাহাকে" নামক ক্ষুদ্র উপন্যাসটি ব্যতিক্রমস্বরূপে উপস্থিত হয়েছে। "ইহার মধ্যে যথেষ্ট তর্ক-বিতর্ক আছে, যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের আস্ফালন আছে, ইংরেজী সাহিত্য ও সমাজের তুলনামূলক সমালোচনা আছে, কিন্তু সকলের উপর দিয়া একটি স্ত্রী-হস্তের লঘু কোমল স্পর্শ অনুভব করা যায়।"

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৯)

পরিচয়। ত্রৈলোক্যনাথ পণ্ডিত ও কর্মী ব্যক্তি ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলায় নানা জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধে তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিচয় রয়েছে। বিশেষ করে শিল্প (industrial products) সম্বন্ধে তিনি সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, "যাঁহার কর্মোদ্যম ও পাণ্ডিত্য একদিন 'বিশ্বকোষ' রচনায় নিয়োজিত হইয়াছিল, তিনিই বাংলা দেশে বালক-বালিকা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের অবসরবিনোদনের জন্য এমন বিচিত্র কাহিনী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, যাহার জুড়ি আজ পর্যন্ত মিলিল না।"

গ্রন্থাবলী। ত্রৈলোক্যনাথ কয়েকখানি উপন্যাস লিখেছেন, "কঙ্কাবতী" (১৮৯২), "ফোকলা দিগম্বর" (১৯০১), "ময়না কোথায়" এবং "পাপের পরিণাম"। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল,—"ভূত ও মানুষ" (১৮৯৬), "মুক্তামালা" (১৯০১, এটি উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত হলেও আসলে গল্প-সঙ্কলন), "মজার গল্প" ও "ডমরু চরিত"।

ঔপন্যাসিকের সামগ্রিক জীবনদৃষ্টি তাঁর ছিল না। উপন্যাস হিসেবে রচনাগুলি মূল্যহীন। ব্যাপক জীবনপরিচিতি, চরিত্রপরিণতি ও বাস্তবতা এখানে নেই। একটি-দুটি কৌতুকধর্মী চরিত্রসৃজনে তিনি বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছেন, আজগুবি ঘটনা ও পরিবেশের টুকরো বর্ণনা রসের রাজ্যে গিয়ে পৌঁছেছে। জীবনের গুরুগম্ভীর বা রোমান্টিক ভাবানুভূতির প্রসঙ্গে তিনি একেবারেই ব্যর্থ হয়েছেন। "কঙ্কাবতী" অবশ্য সাধারণ উপন্যাসের পথ

পরিহার করায় সর্বাঙ্গীন সফলতা লাভ করেছে। রূপকথার কাহিনীকে অবলম্বন করে আজগুবি ও ভৌতিক উপকরণের সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টিতে তিনি আশ্চর্য নবীনতা দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের তুলনায় গল্পরচনায় ত্রৈলোক্যনাথের সাফল্য অনেক বেশি। বাংলা ১২৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি হিতবাদীতে প্রকাশিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথের প্রথম গল্পগুলি বাংলা ১২৯৮ থেকে ১৩০০ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। ত্রৈলোক্যনাথের গল্পের আঙ্গিকে পুরানো গ্রাম্য গল্প-কথার অনুসরণ আছে। কিন্তু নব্য ছোট গল্পের আঙ্গিকের তীক্ষ্ণতা ও একমুখীতা (হাসির গল্পে যতটা স্বাভাবিক) তাঁর কোন কোন গল্পে বেশ স্পষ্ট। যেখানে বিংশ শতকের পূর্বে ছোট গল্পের যথার্থ আঙ্গিকে সিদ্ধ লেখকের সন্ধান মেলে না, সেখানে ত্রৈলোক্যনাথের গল্প, অংশত হলেও বাংলা সাহিত্যের এই নবধারার আবির্ভাব মাত্র, তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে ঐতিহাসিক গুরুত্ব অর্জন করেছে।

ত্রৈলোক্যনাথ বাংলা সাহিত্যে এক নূতন রসের সন্ধান দিয়েছেন। "বঙ্গবাসী" পত্রিকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু ব্যঙ্গাত্মক নক্‌শা ও উপন্যাস রচনা করে সমকালীন বাংলা দেশে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একদিক থেকে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে তাঁদের সাদৃশ্য আছে। ত্রৈলোক্যনাথ, ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র তিনজনেই কথাসাহিত্যে হাস্যরসের ধারাটিকে প্রবাহিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে পার্থক্য অনেক। ইন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্রকে এক শ্রেণীভুক্ত করা যেতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথ স্বতন্ত্র মেজাজের শিল্পী। ইন্দ্রনাথ এবং যোগেন্দ্রচন্দ্রের কলমে ব্যঙ্গের ধার ছিল, নানা ধরনের অসঙ্গতি বিশেষত আধুনিক শিক্ষার বিচিত্র বিকৃতি তাঁদের রচনায় ব্যঙ্গবিদ্ধ হয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথে ব্যঙ্গের বক্রহাস্য নেই, রঙ্গের উচ্চহাস্যে তাঁর রচনা পরিপূর্ণ। ত্রৈলোক্যনাথের রচনায় সামাজিক সচেতনতা নেই। রূপকের ও আজগুবির রাজ্যে তিনি পাঠককে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে বয়স্ক লোকদের রূপকথার আসর বসেছে। দেশী ভূত-প্রেত থেকে শুরু করে আরব্যরজনীর জিন, ইংরেজী ধরনের স্কল-স্কেলিটন, পিঠেলোভী চীনে ভূত ভীড় করে এসেছে। তারা যতটা ভয় দেখিয়েছে হাসির সৃষ্টি করেছে তার চেয়ে অনেক বেশি। দায়িত্বহীন উচ্চহাস্যের এই মুক্তি আমাদের সাহিত্য জগতে একান্ত দুর্লভ ছিল। তাঁর গল্পে পুরানো গ্রাম্য পরিবেশে গল্পকথন ভঙ্গিটি অব্যাহত আছে, কিন্তু ভাঁড়ামো বা অশ্লীলতার স্পর্শ মাত্র

সেখানে নেই। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র সমকালে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন, ত্রৈলোক্যনাথের খ্যাতি যুগান্তরে পৌঁছেছে।

অন্যান্য ঔপন্যাসিক

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪-৮৯)॥ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি "পালামৌ" উপন্যাস নয়, অপূর্বসুন্দর এক ভ্রমণকাহিনী। "জাল প্রতাপচাঁদ" নামে তিনি যে কাহিনী বিবৃত করেছিলেন, সহানুভূতি এবং বর্ণনা-সৌন্দর্যের সমন্বয় ঘটলেও তা উপন্যাসের স্তরে ওঠে নি। তাঁর চারটি উপন্যাসের মধ্যে "কণ্ঠমালা" ১৮৭৭ সালে এবং "মাধবীলতা" ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। এ দু'টি পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের মর্যাদা দাবি করতে পারে। "রামেশ্বরের অদৃষ্ট" এবং "দামিনী" ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাস, প্রায় ছোট গল্পের মত। কেহ কেহ "দামিনী"তে বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্পের আদিরূপ দেখতে পেয়েছেন। আকারে ছোট হলেও রচনাটিতে ছোট গল্পের বিশিষ্ট জীবনবোধ এবং রূপচেতনার পরিচয় নেই। লক্ষণীয়, সঞ্জীবচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস দু'টিও আকারে একান্ত ক্ষুদ্র। দীর্ঘকাল ধরে আপন প্রয়াসকে একমুখী করে রাখার মন তাঁর ছিল না। এই স্বভাব শিথিলসূত্র, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মন্তব্য পরিকীর্ণ ভ্রমণকাহিনীতে সাফল্য অর্জন করলেও উপন্যাসের বিশিষ্ট আঙ্গিককে আয়ত্ত করতে পারে নি। তাঁর উপন্যাসে অসম্পূর্ণতা এবং সমন্বয়-কৌশলের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

"কণ্ঠমালা" ও "মাধবীলতা" ঐতিহাসিক রোমান্স জাতীয় রচনা। এদের ঐতিহাসিক অংশ অবশ্য কালপরিচয়হীন। কাল্পনিক রোমান্স বলে এদের আখ্যাত করাই সমীচীন। প্রথম উপন্যাসটি পূর্বে রচিত হলেও লেখক একে দ্বিতীয়টির পরিশিষ্ট বলেছেন। কিন্তু এদের মধ্যে কালগত, আচার-আচরণ, রাজনৈতিক-সমাজনৈতিক পরিবেশগত কোনরূপ যোগসূত্রই স্থাপিত হয় নি। মাঝে মাঝে মধ্যযুগসুলভ অতিলৌকিকতাকে লেখক প্রশ্রয় দিয়েছেন। মাঝে মাঝে বাস্তবচিত্র এবং চরিত্রবিশ্লেষণে যে নৈপুণ্যের ইঙ্গিত আছে তার প্রতি ঔপন্যাসিক স্থির দৃষ্টিপাত করেন নি। তাঁর মন প্রায়ই কাহিনীগতির বাহিরে চলে গিয়েছে। অপ্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বহীন বিষয়ের বর্ণনা চকিত চমকে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

বাংলা সাহিত্যে তাঁর মত প্রতিভাবান কিন্তু অন্যমনস্ক ও কেন্দ্রচ্যুত লেখক বড় বেশি নেই।

প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ॥ প্রতাপচন্দ্র ঘোষ ইতিহাসচর্চা ও প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনায় খ্যাতিলাভ করেছিলেন। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অব্যবহিত পরে "বঙ্গাধিপ পরাজয়" (১ম খণ্ড ১৮৬৯, ২য় খণ্ড ১৮৮৪) নামে একখানি সুবৃহৎ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বন করে উপন্যাসটি রচিত হয়েছিল। কিন্তু শুষ্ক ঘটনাকে মানবিক হৃদয়চাঞ্চল্যের সঙ্গে যুক্ত করে উপন্যাসে রূপান্তরিত করবার কৌশলটি তাঁর জানা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকেও শিক্ষাগ্রহণে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর উপন্যাস তাই সাহিত্য হিসেবে সম্পূর্ণই ব্যর্থ হয়েছে।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-৯১) ॥ বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিক শিল্পীমন রোমান্স রচনায় কল্পনার ঐশ্বর্যপূর্ণ চিত্রের অবতারণা করেছে, জীবনের গভীরতম প্রদেশে অবতরণ করেছে। এই কল্পনাধন্য সৌন্দর্যলোক এবং গভীর জীবনবোধ উচ্চশ্রেণীর পাঠকের অপেক্ষা রাখে। সাধারণ পাঠকগণ কল্পনাগভীরতাকে আয়ত্ত করতে পারে না, সরল বাস্তবতার আস্বাদের কামনাই তাদের চরম কামনা। তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় যখন "স্বর্ণলতা" (১৮৭৪) উপন্যাস লিখলেন তখন এই কারণেই তিনি ভূয়সী প্রশংসা পেলেন, প্রভূত জনপ্রিয়তাও গ্রন্থখানি লাভ করল। The calcutta Review পত্রিকায় প্রশংসা করে লেখা হল "As a painter of real ordinary life, both in its comic and in its serious and tragic side Babu Tarak Nath is unrivalled among Bengali authors…"। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বিচার করলে বাংলা ভাষায় সামাজিক উপন্যাস পূর্বেও লেখা হয়েছে। আলাল কিংবা ফুলমণি ও করুণার কাহিনীকে পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস বলে না ধরা গেলেও বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ" ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে। তবে "real ordinary life"-য়ের চিত্র হিসেবে এটির কিছু মূল্য স্বীকার্য। কোন সামাজিক সুগভীর সমস্যা কিংবা ব্যক্তিজীবনের কোন তীব্র জিজ্ঞাসার অনুসন্ধান না করে এ রচনার সহজ আবেদনটিকে মেনে নিতে হবে; সমকালীন উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা ভুলে গেলে এটিকে একটি অগভীর পারিবারিক জীবনের ছবি হিসেবে সামান্য মূল্য দিতে বাধা ঘটবে না। স্বর্ণলতা ছাড়া তারকনাথ আরও কটি উপন্যাস ও বড় গল্প লিখেছিলেন "ললিত-সৌদামিনী" (১৮৮২), "হরিষে বিষাদ" (১৮৮৭), "তিনটি গল্প" (১৮৮৯), "অদৃষ্ট" (১৮৯২) প্রভৃতি। এগুলি একান্ত মামুলী রচনা।

মীর মশার্‌রফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২) ॥ আধুনিক বাংলা গদ্য সাহিত্যে

মশাররফ হোসেন প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান লেখক। গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাস ও কাহিনী-জাতীয় রচনায় তাঁর অবদান সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কথাসাহিত্যে তিনি একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর প্রথম রচনা "রত্নবতী" উপন্যাস ১৮৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনে লেখক বলেছেন "একটি কৌতুকাবহ গল্প অবলম্বন করিয়া ইহার রচনা কার্য্য সম্পন্ন করা হইয়াছে।...এই গল্পটি কল্পনা করিয়াছি। ভাষা-সঙ্গতি ও গল্পের বন্ধন যতদূর পারিয়াছি, সামঞ্জস্য রাখিতে ত্রুটি করি নাই।" "বিষাদসিন্ধু" (১৮৮৫-৯১) মশাররফ হোসেনের সর্বাধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ। হাসান-হোসেনের সঙ্গে এজিদের সংঘর্ষ, হাসানের বিষপানে এবং হোসেনের সপরিবারে জলাভাবে মৃত্যু এই গ্রন্থের বিষয়। ফারসী ও আরবী গ্রন্থ থেকে এর কাহিনীভাগ গৃহীত হয়েছে। তার ভিত্তিতেও যথেষ্ট ঐতিহাসিকতা আছে বলে মনে হয়। কিন্তু মশাররফ হোসেন ইতিহাসের শুষ্ক কাঠামোয় মেদমজ্জা সংযুক্ত করেছেন, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সংঘর্ষের সঙ্গে মানবিক হৃদয়াবেগকে সমন্বিত করেছেন। এটিকে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রূপেই সাহিত্যরসিকেরা গ্রহণ করবেন। সমগ্র রচনাটির মধ্যে মহাকাব্যোচিত বিশালতা আছে। উদাত্ত-উন্মুক্ত জীবনাবেগ, প্রবৃত্তির সুতীব্র সংঘাত এবং চরিত্রগুলির ভাস্কর্যসুলভ কান্তি উপন্যাসটির আস্বাদে বৈচিত্র্য এনেছে। চরিত্র-সৃষ্টিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। লেখকের "উদাসীন পথিকের মনের কথা" (১৮৯০) উপন্যাস বলে বিজ্ঞাপিত হলেও ঠিক উপন্যাস নয়, "ইহা উপন্যাস আকারে নীল অত্যাচারের কাহিনীতে পূর্ণ।" তাঁর অপর বিশিষ্ট গ্রন্থ "গাজীমিয়াঁর বস্তানী" (১৮৯৯) উপন্যাস রূপে গৃহীত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের প্রভাব এই উপন্যাসে গভীর ভাবে পড়েছে। কিন্তু কমলাকান্ত যেখানে খণ্ড রচনার সঙ্কলন, গাজীমিয়াঁর বস্তানী সেখানে একটি কেন্দ্রীয় কাহিনী ও কতকগুলি চরিত্রবিকাশের সূত্রে সম্বদ্ধ হয়ে উপন্যাস হয়ে উঠেছে। গ্রন্থটি ব্যঙ্গরসে পূর্ণ এবং সমাজ-সমালোচনাত্মক। রক্ষণশীলতা এবং প্রগতির ভেকধারী উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর কাছে সমভাবে ধিকৃত হয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)॥ শিবনাথ শাস্ত্রী কর্মপ্রাণ, জ্ঞানযোগী ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু কাব্য ও উপন্যাস রচনায়ও তাঁর কিছু প্রবণতা ছিল। অবশ্য অনন্যচিত্ত হয়ে সৃজনধর্মী সাহিত্যসৃষ্টিতে তিনি আত্মনিয়োগ

করতে পারেন নি। তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে "মেজ বৌ" (১৮৮০), "যুগান্তর" (১৮৯৫), "নয়নতারা" (১৮৯৯) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একটি বিষয়ে শিবনাথ শাস্ত্রীর বিস্ময়কর সচেতনতা ছিল। তিনি "যুগান্তর"কে বিজ্ঞাপিত করেছেন সামাজিক উপন্যাস রূপে, আর দু'টি গ্রন্থকে তিনি বলেছেন পারিবারিক উপন্যাস। সব পারিবারিক উপন্যাসই সমাজসমস্যার গভীরে আলোকপাত করে না এ বোধ তাঁর ছিল। যুগান্তর তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। কিন্তু এর মধ্যে একটা দ্বিধার ভাব আছে। পল্লীজীবনের সহজ সরল চিত্রাঙ্কনে তিনি সফলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মধ্যেকার তাত্ত্বিক পণ্ডিতটি যখন বড় হয়ে উঠেছে তখন সহজ মানবিক রসের হানি ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথ "যুগান্তর" উপন্যাসের সমালোচনা প্রসঙ্গে দুই সুরের এই পার্থক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, "…লেখক বঙ্গসাহিত্যে নশিপুর নামক আস্ত একটি গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম আমোদ-প্রমোদ কৌতুক উপদ্রব সুজন দুর্জন সমস্তই পাঠকদের চির সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে।…এমন সময়ে আমাদের পরম দুর্ভাগ্যবশত উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর, হাঁসের দল—কোথা হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র, হাতিবাগান, নবরত্নসভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক।"

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২) ॥ প্রধানত সরস প্রবন্ধের লেখক চন্দ্রশেখর "উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম" (১৮৭৬) নামক একটিমাত্র উপন্যাস লিখে সমকালে সুবিপুল খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থটি ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসে পূর্ণ। উপন্যাস-লক্ষণ গ্রন্থটিতে বেশি নেই। অসংযত উচ্ছ্বাসে পূর্ণ গ্রন্থটি উঁচুদরের গদ্যরচনা রূপেও গৃহীত হওয়ার উপযুক্ত নয়।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯১১) ॥ কাব্য, নকশা ও গল্পোপন্যাস জাতীয় নানাবিধ রচনায় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হাত দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সর্ববিধ রচনার মধ্যেই জীবন-দৃষ্টির একটি বিশিষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। ইন্দ্রনাথ দক্ষিণ চোখের প্রসন্ন কোমলতা, সৌন্দর্যপ্রিয়তা ও রোমান্টিক আদর্শবাদকে বর্জন করে বাম চোখের ব্যঙ্গদৃষ্টির শাণিত আলোয় সমাজকে বিদ্ধ করেছেন। কাব্যে-নকশায় বা উপন্যাসে এই একটি সুরের সাধনাই তিনি করেছেন। বাংলা ভাষার 'Satire' উপন্যাসের তিনিই প্রবর্তক। বঙ্কিমচন্দ্রের "মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত্রের" পরেই তাঁর "কল্পতরু" (১৮৭০) প্রকাশিত হয়।

তাঁর অপর উপন্যাস "ক্ষুদিরাম"কে তিনি অবশ্য 'গালগল্প' নামেই পরিচিত করেছেন।

তাঁর উপন্যাস দু'টিকে গালগল্প শ্রেণীর রচনা বলাই ভাল। ছোট গল্পের বাহুল্য-বর্জিত একাগ্রতা যেমন এদের মধ্যে নেই, তেমনি উপন্যাসের কাহিনী ও চরিত্রগত সামগ্রিকতার এখানে একান্ত অভাব। তিনি কাহিনীর অগ্রগতির পারম্পর্য এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে সংযোগ রক্ষার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন না, চরিত্রের ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ও বিকাশধর্ম অঙ্কনে তাঁর আগ্রহ ছিল না। তাঁর ব্যঙ্গ-হাস্যও গল্প এবং চরিত্রের সঙ্গে যেন অনেকটা নিঃসম্পর্কিত। অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য ও পল্লবিত বর্ণনার পথ ধরেই তাদের আবির্ভাব ঘটেছে। ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ তীক্ষ্ণ এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার-আচরণ তথা সমাজসংস্কার চেষ্টার বিরুদ্ধে উদ্যত। ত্রৈলোক্যনাথের দল-নিরপেক্ষতা বা রচনা-কৌশলে ব্যঙ্গকে রঙ্গরসে রূপান্তরিত করার প্রবণতা তাঁর মধ্যে নেই। ইন্দ্রনাথের রক্ষণশীলতা সোচ্চার।

যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু (১৮৫৪-১৯০৫)॥ যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু "বঙ্গবাসী" পত্রিকার পরিচালকরূপে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়াও একাধিক দৈনিক এবং সাময়িক পত্রের পরিচালনায় তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তাঁকে এদেশের সমকালীন সাংবাদিকদের মধ্যে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। প্রাচীন সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি (বহু ক্ষেত্রে বঙ্গানুবাদ সহ) অতি সুলভ মূল্যে প্রচার করে তিনি শিক্ষিতজনের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন।

তিনি "বাঙ্গালী চরিত" (১৮৮৫-৮৬), "মডেল ভগিনী" (১৮৮৬-৮৭), "কালাচাঁদ" (১৮৮৯-৯৮), "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী" (১৮৯৫-১৯০২) প্রভৃতি উপন্যাস এবং "কৌতুক কণা" নামক গল্পসংকলন রচনা করেছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সাহিত্যরচনায় ব্রতী হন। কিন্তু ঔপন্যাসিক হিসেবে গুরু অপেক্ষা তিনি অধিক সাফল্য লাভ করেছিলেন। তাঁর উপন্যাসের ব্যঙ্গরস ঘটনাসজ্জায় এবং চরিত্রকল্পনায় সঞ্চারিত; ইন্দ্রনাথের ন্যায় তা গল্পের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত পল্লবিত বর্ণনা ও বিচ্ছিন্ন মন্তব্যকে আশ্রয় করে নি। তাঁর ব্যঙ্গও ইন্দ্রনাথের ন্যায় তীব্র। রক্ষণশীলতার কেন্দ্র থেকে সমাজসংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টাকে, এবং ব্রাহ্মধর্মকে আঘাত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কিন্তু উপন্যাসমধ্যে ব্যঙ্গরস সৃষ্টি করতে গিয়ে হাস্যের আবরণ সরিয়ে যখনই তিনি ধর্মোপদেষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তখন তার প্রচারক-রূপ অতি প্রকট হয়ে উঠেছে। অবশ্য যোগেন্দ্রচন্দ্রের

ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন কিছু অমার্জিত স্থূলতা সত্ত্বেও বহুস্থানেই যে উপভোগ্য একথা মেনে নিতে হবে। "শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী" অতি বৃহৎ উপন্যাস। উনবিংশ শতাব্দীর ভাবদ্বন্দ্বটি ব্যঙ্গশিল্পীর দৃষ্টিতে ধরে রাখবার কিছু চেষ্টা এখানে করা হয়েছে। কয়েকটি চরিত্রের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যও লেখকের পূর্ববর্তী রচনাগুলির তুলনায় অধিকতর বিকশিত; ক্বচিৎ বেদনার অশ্রুকে হাস্যের সাহচর্যে আহ্বান জানান হয়েছে। কিন্তু জীবন-দৃষ্টির গভীরতার অভাব এবং অতিমাত্রায় রক্ষণশীলতার জন্য উপন্যাসটি সাধারণ স্তর অতিক্রম করে নি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)॥ বিপুল মনীষার অধিকারী হরপ্রসাদ বঙ্কিমযুগের একজন প্রধান প্রাবন্ধিক। তিনি "কাঞ্চনমালা" (১৮৮২ সালে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত) এবং "বেণের মেয়ে" নামে দুটি উপন্যাস লিখেছিলেন। শেষোক্ত উপন্যাসটি বিংশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাস রচনায় তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। পুরাতন বাংলার ইতিহাসের পট-ভূমিতে এই উপন্যাস দু'টি রচিত। ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের সুগভীর জ্ঞানকে ঐতিহাসিক পটভূমি রচনায় তিনি কাজে লাগিয়েছেন। তবে তাঁর সরস সাহিত্যরুচি কোথাও জ্ঞানের বিতর্ককে জীবন-চিত্রের উপরে স্থান দেয় নি।

দামোদর মুখোপাধ্যায় (১৮৫৩-১৯০৭)॥ দামোদর মুখোপাধ্যায় অনেক-গুলি উপন্যাস লিখে সমকালীন পাঠকের গল্পরসতৃষ্ণা মিটিয়েছিলেন। তিনি সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলার" উপসংহার স্বরূপ "মৃন্ময়ী" (১৮৭৪) এবং "দুর্গেশনন্দিনীর" অনুসরণে "নবাবনন্দিনী" (১৯০১) রচনা করে। গল্পখোর পাঠক মহৎ ঔপন্যাসিককৃত সমাপ্তির ব্যঞ্জনা প্রায়ই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। দামোদরের গ্রন্থ তাদের কাছে ভাল লাগবারই কথা। কিন্তু সাহিত্যিক উৎকর্ষের কিছুই এখানে মিলবে না। তিনি স্কট ও কলিন্‌সের উপন্যাস বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে নাম করতে হয় "দুই ভগ্নী" (১৮৮১), "কমলকুমারী" (১৮৮৪), "প্রতাপসিংহ" (১৮৮৪), "মা ও মেয়ে", "বিষবিবাহ", "শান্তি", "যোগেশ্বরী", "অন্নপূর্ণা" প্রভৃতি গ্রন্থের। তিনি অক্লান্ত লেখক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণে তিনি ঐতিহাসিক ও সামাজিক উভয় জাতীয় উপন্যাস লিখেছিলেন। কিন্তু ঘটনার প্রাধান্যকে ছাপিয়ে চরিত্র-সৃষ্টি কোথাও মুখ্য হয়ে ওঠে নি।

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার (১৮৬০-১৯০৮)॥ শ্রীশচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। সাহিত্যরসিক এবং সমালোচক হিসেবে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি কয়েকটি উপন্যাসও লিখেছিলেন। সৃজনশীল সাহিত্যের

হিসেবে এগুলিই তাঁর শ্রেষ্ঠ দান। "শক্তিকানন" (১৮৮৭), "কৃতজ্ঞতা" (১৮৯৬), "বিশ্বনাথ" (১৮৯৬), "রাজতপস্বিনী" নামক উপন্যাস ছাড়া তিনি কয়েকটি গল্পও লিখেছিলেন। "ফুলজানি" (১৮৯৪) উপন্যাসটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীশচন্দ্রের শিল্পীস্বভাবের মূল দ্বিধাটিকে স্পষ্ট করে তুলেছেন, "পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ; বাংলার লেখক সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে।...আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থকার নিজের প্রতিভায় নিজে সন্তুষ্ট নহেন,...তিনি হঠাৎ এক সময় আপন প্রতিভার স্বাভাবিক গতিকে বলপূর্বক প্রতিহত করিয়া তাহাকে অসাধারণ চরিত্র ও লোমহর্ষণ ঘটনাবলীর মধ্যে অসহায়ভাবে নিক্ষেপ করিয়াছেন।" একারণেই প্রত্যাশিত সাফল্য তিনি লাভ করতে পারেন নি।

নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৬১-১৯৪০)॥ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সাংবাদিক হিসেবে সমকালে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। বিদ্যাপতির পদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করে তিনি গবেষণা-কার্যে দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। কবিতা এবং প্রবন্ধ-রচনায়ও তাঁর হাত ছিল। তবে উপন্যাস ও গল্প লেখায়ই তাঁর আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল, কিন্তু কথাসাহিত্য সৃষ্টিতে তিনি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয় না। তিনি "সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে ১৮৯২ সালে কতগুলি গল্প সঙ্কলন করেছিলেন। কিন্তু এগুলিকে তিনি ক্ষুদ্র উপন্যাস নামে অভিহিত করেছিলেন। বাংলা ছোট গল্পের তখন সবে জন্ম হয়েছে রবীন্দ্রনাথের হাতে। তার সংহত, একাগ্র ও সূক্ষ্ম আঙ্গিক সম্পর্কে সচেতনতা তখন পর্যন্ত অপরের বড় ছিল না। বহুকাল পরে ১৯৩১ যে অবশ্য তিনি "রথযাত্রা ও অন্যান্য গল্প" নামে একটি ছোট গল্পের সঙ্কলন প্রকাশ করেন। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে "পর্বতবাসিনী" (১৮৮৩), "অমরসিংহ" (১৮৮৯), "লীলা" (১৮৯২), "তমস্বিনী" (১৯০১) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে। তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমের ধারা অনুসরণের চেষ্টা আছে, অবশ্য তাঁর গভীরতা বাদ দিয়ে। সামাজিক উপন্যাসে তিনি একটি নূতন সুরের চর্চা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর "তমস্বিনী" উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন, "স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, বাঙ্গালা উপন্যাসে তিনি উন্মুক্ত Realism-এর অবতারণা করতে চাচ্ছেন। তাতে আমি কিছুই আপত্তি করি নে। কিন্তু সেটা পারা চাই।... সম্পূর্ণ নির্ভীক নগ্নতা ভাল

কিন্তু স্বল্প আবরণ রাখতে গেলেই আব্রু নষ্ট হয়। এই বইয়ে তাই হয়েছে।" নগেন্দ্রনাথ সাফল্য অর্জন না করলেও আরও ত্রিশ বছর পরে "কল্লোলে"র লেখকেরা যা করেছিলেন তাই করবার সাধনা করেছেন। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য ॥

॥ চার ॥

প্রবন্ধ-সাহিত্য

ভূমিকা

গদ্য ভাষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যে বিষয়গৌরবী এবং আত্মগৌরবী দুই ধরনের প্রবন্ধের আবির্ভাব হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বহুমুখী পরিণতি লাভ করেছে। এই যুগের প্রবন্ধসাহিত্যের ইতিহাস কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এক ॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপর্বে বেশ কয়েকজন সমশক্তিসম্পন্ন প্রাবন্ধিক ও গদ্যশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল। কিন্তু আলোচ্য পর্বে প্রাবন্ধিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট ব্যক্তিত্বের নিকটে অপর কেহই পৌঁছতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রকে আদর্শ করেই সেকালের অপর প্রবন্ধ লেখকগণ অগ্রসর হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের "বঙ্গদর্শন" (১৮৭২) পত্রিকা এদিক দিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই পত্রিকা সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "বঙ্গদর্শনের আবির্ভাব একটা সামান্য সাময়িক ঘটনামাত্র নয়, বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী সমস্ত ইতিহাসই এই একটি ঘটনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছে।···প্রবন্ধ সমালোচনা যে কতকগুলি সংবাদ (news) ও তথ্যের সমষ্টিমাত্র নয়, সেগুলিও যে নানা বিচিত্র রস-সংযোগে সাহিত্য-পদবাচ্য হইয়া উঠিতে পারে, পাঠকের শিক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আনন্দেরও খোরাক যোগাইতে পারে, বঙ্গদর্শনেই সেই সত্য সর্বপ্রথম প্রচারিত হইল।" বঙ্গদর্শনকে কেন্দ্র করে সেকালের বহু প্রবন্ধ লেখকই আবির্ভূত হয়েছিলেন। সে যুগে বঙ্গদর্শনের আদর্শে বহু পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের বিকাশে সহায়তা করেছে। এদের মধ্যে "সোমপ্রকাশ", "আর্যদর্শন", "নবজীবন", "সাধারণী", "সমালোচক", "বান্ধব", "প্রচার" প্রভৃতি সাময়িকীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে।

দুই ॥ এই পর্বের প্রাবন্ধিকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বঙ্কিম-চন্দ্রের ভাব ও ভাষামণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নন এমন লেখকের সংখ্যা বেশি নেই। কেশবচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং বিবেকানন্দ বঙ্কিম-প্রভাবের বাহিরে থেকেই গদ্যপ্রবন্ধে বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন।

তিন ॥ ধর্ম বা দর্শন বিষয়ে রামমোহন রায়ের সময় থেকেই বাঙালী প্রাবন্ধিকদের বিশেষ প্রবণতা ছিল। সে প্রবণতা বিশেষ হ্রাস না পেলেও এই যুগে বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে প্রাধান্য পেয়েছে ইতিহাস ও পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ের রচনা এবং সাহিত্য-সমালোচনা। বিজ্ঞানাদি বিষয়ের আলোচনায় বাংলা প্রবন্ধ এই গৌরবের যুগেও বিশেষ সমৃদ্ধ হয়নি।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮–৯৪)

পরিচয় ॥ বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার অন্যতম প্রধান প্রাবন্ধিকও। বাংলা ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান সম্পর্কে মৌলিক প্রবন্ধ লিখবার জন্য তিনি দেশের গুণীজনকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। বাঙালীর চিন্তার রাজ্য যাতে প্রসারিত হয়, জ্ঞান ও কর্মে, যাতে সে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে তিনি "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা প্রকাশ করেন। লঘু-গুরু যে কোন ধরনের প্রবন্ধই যে রচনাগুণে "সাহিত্য" হয়ে উঠতে পারে বঙ্কিমই তা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেন। অনেক বাঙালী লেখক তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাস-গবেষণার গুরুভার গ্রহণ করেন, কেহ কেহ সাহিত্য-সমালোচনায় হাত দেন, অনেকে দর্শনাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখায় ব্রতী হন, কেহ কেহ আবার লঘু কৌতুকরসের নিবন্ধ রচনা করতে থাকেন।

গ্রন্থাবলী ॥ বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু ও গুরু, আত্মগৌরবী ও বিষয়গৌরবী সর্ববিধ প্রবন্ধের উল্লেখ্য গ্রন্থের তালিকা এখানে দেওয়া হল। "লোকরহস্য" (১৮৭৪) কৌতুকরসাত্মক নকশার সঙ্কলন; "বিজ্ঞানরহস্য" (১৮৭৫) বিজ্ঞানবিষয়কে জনপ্রিয় করবার উদ্দেশ্যে রচিত প্রবন্ধসংগ্রহ; "কমলাকান্তের দপ্তর" (১৮৭৫) ক্ষীন সূত্রে বদ্ধ আত্মগৌরবী কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহ। "বিবিধ সমালোচনা" (১৮৭৬), "প্রবন্ধপুস্তক" (১৮৭৯) গ্রন্থ দু'টি একসঙ্গে "বিবিধ প্রবন্ধ" প্রথম ভাগ নামে প্রকাশিত হয়। "বিবিধ প্রবন্ধ" দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। "সাম্য" (১৮৭৯), "কৃষ্ণচরিত্র" (১৮৮৬) এবং "ধর্মতত্ত্ব" বা "অনুশীলন" (১৮৮৮) তাঁর অপরাপর বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থ।

নানা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ লিখেছেন। সব বিষয়েই যে তাঁর সমান জ্ঞান

ছিল এবং সর্ববিধ প্রবন্ধেই যে তিনি সমান সাফল্য লাভ করেছেন এমন মনে করবার কারণ নেই। বিশেষ করে সাহিত্য-সমালোচনা, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের আলোচনা এবং ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যানে তিনি অধিক আকর্ষণ অনুভব করেছেন।

সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র ॥ বঙ্কিমের হাতে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্য উজ্জ্বল মূর্তি পরিগ্রহ করে, পূর্ববর্তী সমালোচনার তুলনায় তার গুণগত সমুন্নতি ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদের সম্পর্কে আলোচনায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচনায় এবং সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যের তুলনামূলক বিচারে আপন রসদৃষ্টির গভীরতার নিশ্চিত প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। আবার গীতিকাব্য সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি নাটক ও উপন্যাসের সঙ্গে গীতি-কবিতার পার্থক্য সম্পর্কে যে সব সূত্র নির্দেশ করেছেন আজ পর্যন্তও তার মূল্য স্বীকার্য।

বঙ্কিমের সমালোচনার রীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রধান সূত্র আলোচনার যোগ্য। এক। সমালোচনপদ্ধতির দিক থেকে তিনি analytic বা বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গির বিরোধী ছিলেন। তাঁর মতে সমগ্রের বোধেই সৌন্দর্য-উপলব্ধি সম্ভব। এখানে একটি উপমা, ওখানে একটি অনুপ্রাসের খোঁজ করা সমালোচকের কাজ নয়। এই Synthetic বা সাজ্ঘটিক পদ্ধতি বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে এক প্রধান উত্তরাধিকার। দুই। সাহিত্যের স্বরূপ-নির্ণয় প্রসঙ্গে বঙ্কিমের মত এই যে, স্বভাবানুকারিতা এবং সৃষ্টিধর্মের সংযোগেই সাহিত্যের প্রাণ। প্রথমটির অভাবে সাহিত্য অলীক বস্তু হয়ে ওঠে; দ্বিতীয়টির অভাবে তা প্রাণহীন ও রসহীন হয়ে পড়ে। তিন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বঙ্কিমের অভিমত বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সমসাময়িক বাংলা সমালোচনায় এই প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করে তুমুল বিতর্ক উঠেছিল। একদল সমালোচক সামাজিক নীতি ও সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষাই সাহিত্যের একমাত্র কর্তব্য বলে মনে করতেন, অন্যদল সৌন্দর্য-সৃষ্টিকে সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করলেন। সৌন্দর্যসৃষ্টিই যে সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য এ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাহীন ছিলেন। কিন্তু নীতিশিক্ষার প্রশ্নটি তিনি একেবারে অস্বীকার করতে পারেন নি। তবে নীতিশিক্ষাদান সাহিত্যের গৌণ উদ্দেশ্য এবং তার প্রধান কর্তব্যের দ্বারাই ধীরে ও ক্রমে ক্রমে সাধিত হবে এই হল তাঁর অভিমত। পাঠকদের উপদেশ দিয়ে নীতিজ্ঞ করে তোলা তার উদ্দেশ্য নয়,

সৌন্দর্য-সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নীতি ও ধর্মবোধের প্রতি আসক্তি জন্মানোই তার প্রকৃত লক্ষ্য। চার। সংস্কৃত রসবাদ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরূপতার কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। রসবাদী সমালোচনার সীমাবদ্ধতা দেখিয়ে তিনি এই পদ্ধতির সাহিত্যবিচার পরিহারের পক্ষে মত দিয়েছেন। ইংরেজি সমালোচনার প্রতি তাঁর অনুরাগ এই থেকেও অনেকটা প্রমাণিত হবে।

বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ ॥ সাহিত্যসমালোচনাকেও বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ বলেই গণ্য করা উচিত। তবে এখানে সৌন্দর্যচর্চাই লক্ষ্য, জ্ঞানচর্চা নয়। জ্ঞানচর্চা-মূলক বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তাগত যে মৌলিকতা দেখিয়েছেন তার স্বরূপ আলোচনার যোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম জীবনে য়ুরোপীয় দার্শনিক কোঁতের সমর্থক ছিলেন এবং নিরীশ্বরবাদী হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়ে তিনি "সাম্য", "বঙ্গদেশের কৃষক" প্রভৃতি প্রবন্ধে সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষ সমর্থন করেন। ভারতে তিনিই সর্ব-প্রথম সমাজতন্ত্রের পক্ষে গ্রন্থ রচনা করেন। কার্ল মার্ক্সের First International-এর মতবাদের সঙ্গে তাঁর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল বলে মনে হয় না। তিনি ওয়েব-সাইমন প্রভৃতির Utopian Socialism মতবাদের দ্বারাই বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন বলে মনে হয়। কিন্তু পরিণত বয়সে তাঁর মতবাদে গুরুতর পরিবর্তন দেখা দেয়। তিনি গীতার মর্মবাণীর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং প্রচার করতে থাকেন যে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—তিনের বিকাশ ও সমন্বয়ের মধ্যেই মনুষ্যত্বের আদর্শ। 'মনে কোন বাসনা না রেখে কর্ম করে যাওয়া এবং সর্ব কর্মফল ভগবানে অর্পণ করা' হয়ে দাঁড়াল বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারিত নূতন জীবনাদর্শ। "ধর্মতত্ত্ব" গ্রন্থে এই কথাই বলা হয়েছে।

"কৃষ্ণচরিত্র একাধারে ধর্মতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব।··· বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রে প্রথমতঃ মহাভারতের ঐতিহাসিকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন—তিনি নিপুণভাবে দেখাইয়াছেন, মহাভারত কল্পনামূলক কাব্য নয়, অনেকাংশে প্রামাণিক ইতিহাস (History)।" দার্শনিকপ্রবর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এই অভিমত তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে যে সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সে বিষয়ে মতভেদ থাকলেও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে তিনি "বীরদর্প সহকারে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রকে ঐতিহাসিক যুক্তি দ্বারা তন্নতন্নরূপে পরীক্ষা করিয়াছেন এবং চিরপ্রচলিত বিশ্বাসগুলিকেও বিচারের অধীনে আনয়নপূর্বক অপমানিত বুদ্ধি-বৃত্তিকে পুনশ্চ তাহার গৌরবের সিংহাসনে রাজাসন দিয়াছেন।" (রবীন্দ্রনাথ)।

ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায়ও বঙ্কিম বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর এ বিষয়ের আলোচনায় প্রধানত যে সব সমস্যার বিচার করা হয়েছে তা হল,—এক। ভারত তথা বাংলা দেশের বীর্যহীনতা প্রভৃতি বিষয়ে যে সব কলঙ্কের অভিযোগ করা হয় তার সত্যতা নির্ধারণ। দুই। বাঙালীর উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনা। এই সব বিষয়ের আলোচনায় তিনি যে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ সেই প্রণালীতে সবে সে দেশের ইতিহাস রচনার চেষ্টা করছিলেন, এদেশের ইতিহাস বিচারে সে প্রণালীতে তখন কেউ চিন্তা পর্যন্ত করেন নি। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে, "এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্ধ শতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি মহাজন উক্তির মতন বলিয়া যান নাই ; এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইতে যত্ন করি, তিনিও তেমনি করিয়া সেইরূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন।"

আত্মগৌরবী প্রবন্ধ॥ "লোকরহস্যের" প্রবন্ধগুলি সমাজব্যঙ্গমূলক। এগুলিতে বিষয়বস্তু প্রধান হয়ে ওঠে নি, রচনা-রসসম্ভোগই হয়েছে মুখ্য। এগুলির ব্যঙ্গরস মাঝে মাছে বেশ তীব্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু অশ্লীলতার স্পর্শও কোথাও নেই। অসঙ্গত কল্পনা, উদ্ভট পরিস্থিতি, রঙ্গাত্মক অতিরঞ্জন এই সব রচনায় হাস্যরসের কারণ হয়ে উঠেছে। এই শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে যে ব্যঙ্গাত্মক নকশার প্রচলন হয়েছিল বঙ্কিমের এ-রচনায় তা উৎকর্ষের চরমে উঠেছে।

বঙ্কিমের "কমলাকান্তের দপ্তর" একটি অতি উচ্চস্তরের প্রবন্ধ গ্রন্থ। এর মধ্যে যাঁরা ডিকুইন্সীর "Confessions of an opium eater"এর সাদৃশ্য খোঁজেন তাঁরা বহিরঙ্গকেই অধিক গুরুত্ব দেন। রচনাটির মৌলিকতায় সন্দেহ প্রকাশ করা চলে না। কমলাকান্ত নামক আফিমখোর, অপ্রিয় সত্যভাষী, অন্তরের গভীরে নির্জন একাকীত্ব বহনকারী ব্যক্তিটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তি-আত্মার প্রতিফলন ঘটেছে এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়। এই দপ্তরে নানা ধরনের প্রবন্ধ আছে। কয়েকটি প্রবন্ধে গীতিরস চমৎকার প্রকাশ পেয়েছে।

কমলাকান্তের মাধ্যমে বঙ্কিমের নির্জন ব্যক্তিসত্তার আর্তি যেন সেখানে ধ্বনিত হয়েছে। গদ্য ভাষাকে কতটা নমনীয় করে গীতিঝঙ্কারের সৃষ্টি করা যায় বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে তা দেখিয়েছেন। এই গ্রন্থের অপর কতকগুলি রচনা রূপকধর্মী এবং ব্যঙ্গাত্মক। এখানে বঙ্কিমের বিদ্রূপাত্মক ভাষার শাণিত তীরে এবং উদ্ভট কল্পনার রূপকবিলাসে সামাজিক বিচিত্র অসঙ্গতি এবং জাতীয় চরিত্রের নানা দুর্বলতা তীব্র আঘাত পেয়েছে।

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)

পরিচয় ॥ "শিবনাথ ছিলেন একাধারে সাহিত্যিক, ধর্মসংস্কারক, লোক-সেবক এবং স্বাধীনতার উপাসক।" ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের আন্দোলনে শিবনাথ এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। "সোমপ্রকাশ", "সমালোচক" প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। শিক্ষাবিস্তারে তাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রচনাবলী তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার যে পরিচয় দেয় শিবনাথের প্রতিভা তার চেয়ে গভীরতর ছিল। ধর্ম ও সামাজিক কর্মকে অধিক গুরুত্ব দেওয়ায় সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি বহুলতর এবং উৎকৃষ্টতর দান রেখে যেতে পারেন নি।

গ্রন্থাবলী ॥ শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে "মাঘোৎসবের উপদেশ," "মাঘোৎসবের বক্তৃতা", (এই উপদেশ ও বক্তৃতাগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রদত্ত), "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" (১৯০৪), "ধর্মজীবন" (১৮৯৫-১৯০১), "প্রবন্ধাবলী" এবং "আত্মচরিত" উল্লেখযোগ্য।

বিষয়গৌরবী-প্রবন্ধ ॥ শিবনাথ শাস্ত্রীর ধর্মমূলক আলোচনায় এমন কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। তাঁর মৌলিকতা ঐতিহাসিক বিষয়ের আলোচনায়। প্রায় সমসাময়িককালের ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করে তার মধ্য থেকে সমাজগতির মূল সূত্র আবিষ্কারের দূরদৃষ্টি গভীর সমাজচেতনার পরিচয় দেয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধে এই দূরদৃষ্টির সন্ধান মেলে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজী শিক্ষার সংস্পর্শে আসার ফলে এদেশে তরুণশ্রেণীর মনে যে সব তরঙ্গের দোলা দেখা দিয়েছিল তার কার্য-কারণ ও ফলাফল শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" এবং ইংরেজীতে রচিত দুইখণ্ড "History of the Brahmo Samaj" গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "শিবনাথ শাস্ত্রীর সকল রচনার মধ্যে তাঁর দেশপ্রেম ও জাতীয়তা বোধ ওতপ্রোত হইয়া আছে।" তত্ত্বজ্ঞ ভগবদ্ভক্ত হিসেবে সেকালে তিনি খ্যাতি অর্জন করলেও কোন ধর্ম-সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে তাঁকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাঁর চিন্তার আকাশ অনেক বিস্তৃত ছিল।

শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধের ভাষা সাবলীল ও শব্দাড়ম্বরশূন্য। প্রসন্ন প্রজ্ঞা তাঁর ভাষায় যেন বাণীমূর্তি লাভ করেছে। ভাষার সরলতা বিষয়গাম্ভীর্যকে কোথাও ব্যাহত করে নি।

আত্মগৌরবী প্রবন্ধ ॥ শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত" জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের গ্রন্থ নয়, সরস আত্মস্মৃতি রোমন্থন। জীবনের ছোট ছোট কাহিনী, উপলব্ধি ও চিন্তা এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে। আত্মগৌরবী প্রবন্ধ হিসেবে চিত্রবহুল প্রাণোত্তাপপূর্ণ এই গ্রন্থটির মূল্য সামান্য নয়। মাঝে মাঝে কৌতুকরসের সহযোগ রচনাটিকে আস্বাদ্য করে তুলেছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)

পরিচয় ॥ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করে তিনি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করে সম্পাদনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন "চর্যাশ্চর্য বিনিশ্চয়ে"র পুঁথি তিনি নেপাল থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এত বড় গবেষক সারা ভারতে মাত্র দু'চারজন জন্মেছিলেন। অধ্যাপক সুশীলকুমার দে বলেছেন, "প্রাচীন ভারতের সাহিত্য, ধর্ম, ইতিবৃত্ত ও সংস্কৃতির কোন দিকই তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া যায় নাই; এবং পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল ব্যাপী পরিশ্রম, আলোচনা ও বহুদর্শনের পরিণত ফল এই পুস্তক ও প্রবন্ধগুলির বহু সহস্র পৃষ্ঠায় বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার আসক্তি ছিল দুইটি বিষয়ে—মহাযান বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের আলোচনা এবং নানা দিক দিয়া কালিদাসের গ্রন্থাবলীর গুণগ্রাহিতা।"

গ্রন্থাবলী ॥ গবেষক-পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও হরপ্রসাদের সরস মন প্রবন্ধ রচনায় সীমাবদ্ধ থাকে নি। তিনি উপন্যাস রচনার যে চেষ্টা করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বেই প্রদত্ত হয়েছে। প্রাবন্ধিক হিসেবেই অবশ্য তাঁর স্থান অমর হয়ে থাকবে। ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক তাঁর বহু প্রবন্ধ সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় ছড়িয়ে আছে (সম্প্রতি গ্রন্থবদ্ধ হচ্ছে)।

এগুলি উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে রচিত। "ভারত মহিলা", "মেঘদূত ব্যাখ্যা", "প্রাচীন বাংলার গৌরব", "বৌদ্ধধর্ম" এই কয়টি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পুস্তক তাঁর মৃত্যুর পূর্বে বা পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া এশিয়াটিক সোসাইটির প্রায় বার হাজার প্রাচীন পুঁথির (এর মধ্যে আট হাজার তাঁর নিজের সংগ্রহ) বিস্তৃত বিবরণ ও ভূমিকাসহ তালিকাও (চৌদ্দখণ্ডে) তিনি প্রস্তুত করেন। পাণ্ডিত্যে এবং সৃষ্টি-প্রাচুর্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর স্থান যে কত উপরে এই বিবরণ থেকেই তার পরিচয় মিলবে।

প্রাবন্ধিক হরপ্রসাদ॥ হরপ্রসাদ প্রাচীন ভারতীয় সমাজ-ইতিহাস সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তাতে স্বদেশানুরাগ ও ঐতিহাসিকের নিরপেক্ষ বস্তুতন্ময় দৃষ্টি সমন্বিত হয়েছে। বাংলাদেশের পুরানো সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস সম্পর্কেও তিনি অনেক মৌলিক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। ভারতের এই প্রত্যন্ত প্রদেশ প্রাচীনকাল থেকেই কিরূপে নানাদিকে আর্য-ভারত থেকে আপন পার্থক্য বজায় রেখেও উচ্চ গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়েছিল, তুর্ক-বিজয়ের পূর্বে এই প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম ও চিন্তা কিরূপ নূতন রূপ ধারণ করে জাতির জীবনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছিল তার বিবরণ মেলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বহু আলোচনায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে রসজ্ঞ সাহিত্য-সমালোচকও ছিলেন তার প্রমাণ রয়েছে সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কিত অনেকগুলি প্রবন্ধে। নীতিতত্ত্ব ঘটিত প্রশ্নে ব্যাকুল না হয়ে সাহিত্যের সহজ সৌন্দর্য নির্ণয়ে তিনি সরস ভাষায় উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা করেছেন।

ভাষারীতি॥ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত হরপ্রসাদ কিন্তু বাংলাভাষাকে সংস্কৃত-বাহুল্যে দুর্বোধ্য করে তুলবার পক্ষপাতী ছিলেন না। যাঁরা "চলিত কথা দেখিলেই নাক সিটকাইয়া উঠেন" এবং যাঁরা "পড়েন ইংরাজী ভাবেন ইংরাজীতে লিখিতে চান বাঙলায়" তাঁরা উভয়েই হরপ্রসাদের কাছ থেকে বিদ্রূপের আঘাত পেয়েছেন। হরপ্রসাদের নিজের ভাষা কথ্যশব্দে পূর্ণ, স্পষ্ট ও সরল। বাক্যগুলি সাধারণত ক্ষুদ্র। গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায়ও তিনি পাঠক মনে সাহিত্যরস সঞ্চার করতে সমর্থ হয়েছেন।

অন্যান্য প্রাবন্ধিক

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৪—৮৯)॥ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় "যাত্রা সমালোচনা" প্রভৃতি দু' একটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর

"পালামৌ" নামক ক্ষুদ্র ভ্রমণ-কাহিনীটি বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। পালামৌর প্রকৃতি ও এ-অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা বিষয়ে তথ্যপূর্ণ কোন বিষয়প্রধান ভ্রমণ-বিবরণী এটি নয়। এর মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের কবি-প্রাণটি মুক্তি পেয়েছে। উপন্যাসের সুনির্দিষ্ট গঠনে তিনি অতন্দ্রচিত্ত হতে পারতেন না। ভ্রমণ-কাহিনীতে একক ব্যক্তিত্বের সূত্রে বিচ্ছিন্ন ঘটনাংশ এবং বর্ণনার মালা রচনা করা হয়। সঞ্জীবের সৌন্দর্য-দৃষ্টি যেমন প্রকৃতির খণ্ডচিত্রে প্রাণসঞ্চার করেছে, পরিচিত নৈকট্যকে দিয়েছে নবীনতা, তেমনি সরস মন্তব্যের চমকে সামান্যকে করে তুলেছে অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "পালামৌ-ভ্রমণবৃত্তান্তের মধ্যে সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের যে একটি অকৃত্রিম সজীব অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে এমন সচরাচর বাংলা লেখকদের মধ্যে দেখা যায় না।···পালামৌ দেশটা সুসংলগ্ন সুস্পষ্ট জাজ্বল্যমান চিত্রের মতো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যে সহৃদয়তা ও রসবোধ থাকিলে জগতের সর্বত্রই অক্ষয় সৌন্দর্যের সুধাভাণ্ডার উদ্ঘাটিত হইয়া যায় সেই দুর্লভ জিনিসটি তিনি রাখিয়া গিয়াছেন···।"

কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪)॥ ধর্মসাধক কেশবচন্দ্র নিজ উপলব্ধি এবং ধর্মোপদেশ দান প্রসঙ্গে যে-সব কথা বলেছেন তার প্রবন্ধমূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। তিনি সচেতন সাহিত্যসেবী ছিলেন না। কিন্তু বাংলা ভাষার যে রূপ তাঁর বক্তৃতা ও উপদেশগুলিতে ধরা পড়েছে তার সর্বজনবোধ্য সারল্য বিস্ময়কর। বিষয়ের কাঠিন্য তাঁর ভাষা ও প্রকাশরীতিকে কোথাও জটিল করে তোলে নি। কেশবচন্দ্রের মধ্যে ছিল একটি মুক্ত সহজ মন। যুক্তি দ্বারা সত্যকে যাচাই করা এবং সর্ব বাধা অতিক্রম করে তাকে গ্রহণ করার মত বলিষ্ঠতা তাঁর ছিল। এই যুক্তিপ্রবুদ্ধ চিত্তের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছিল ধর্মীয় উপলব্ধি। এই চিন্তা ও অনুভূতিকে তিনি তাঁর রচনায় অতি সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর সঙ্কলিত ধর্ম-ব্যাখ্যান, বক্তৃতা ও উপদেশের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হল "জীবনবেদ" (১৮৮৩) এবং "প্রার্থনা"।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬)॥ তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্রনাথ গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনায় পারদর্শী ছিলেন। তাঁর কাব্যের পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। ধর্ম ও দর্শন এবং সমাজসমস্যা বিষয়ে তিনি অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। "তত্ত্ববিদ্যা" (১৮৬৬-৬৯) তাঁর প্রথম প্রবন্ধ গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধ রচনায় হাত দেবার পূর্বে গ্রন্থটি লিখিত। বাংলা গদ্যের উষাকালের রামমোহন রায়ের কথা ছেড়ে দিলে দর্শন বিষয়ে এরূপ আলোচনা

গ্রন্থ দ্বিজেন্দ্রনাথের হাতেই প্রথম প্রকাশিত হল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ১৮৮৫ থেকে যে সব জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার অনেকগুলি "নানাচিন্তা", "প্রবন্ধমালা" প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথের তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মন এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাঁর প্রবন্ধের ভাষা সম্বন্ধে স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন, "··কখনও কোথাও আমার লেখার মধ্যে বিদেশী হাবভাব idiom তুমি খুঁজিয়া পাইবে·না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, মনে যদি এমন কোনও ভাব উদিত হয়, যাহা প্রকাশের উপযুক্ত খাঁটি দেশী ভাষায় প্রকাশ করা যায়,— তাহাকে প্রকাশের জন্য বিদেশী idiom-এর অনুবাদ করিতে যাইব কেন? আমি কখনও ও পথ মাড়াই না।"

কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪৩-১৯১০)॥ কালীপ্রসন্ন ঘোষ সমকালীন সুধী সমাজে প্রাবন্ধিক হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। "বঙ্গদর্শনে"র আদর্শে প্রচারিত তাঁর "বান্ধব" পত্রিকাটি স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসা আকর্ষণ করেছিল। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে "প্রভাত-চিন্তা" (১৮৭৭), "ভ্রান্তিবিনোদ" (১৮৮১), "নিভৃতচিন্তা" (১৮৮৩), "নিশীথচিন্তা" (১৮৯৬) প্রধান। "প্রমোদ-লহরী" নামে একটি লঘুরসের গ্রন্থও তিনি রচনা করেছিলেন। ইংরেজী চিন্তাবিদ্‌দের সঙ্গে কালীপ্রসন্নের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। কিন্তু তাঁর ভাষা ও প্রকাশরীতির কাব্যসুলভ ঝঙ্কার ও তরল গীতিরস একালের পাঠকদের মন জয় করতে পারে নি। তাঁর চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে স্পষ্ট শৃঙ্খলা যদি থাকেও আবেগধর্মী কৃত্রিম ও অসংযত প্রকাশভঙ্গি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

চন্দ্রনাথ বসু (১৮৪৪– ১৯১০)॥ বঙ্কিমপ্রভাবিত প্রাবন্ধিকদের মধ্যে চন্দ্রনাথ বসু অন্যতম। তিনি সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায়ই অধিক প্রবণতা দেখিয়েছেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে "শকুন্তলাতত্ত্ব" (১৮৮১), "ফুল ও ফল" (১৮৮৫), "ত্রিধারা" (১৮৯১), "হিন্দুত্ব" (১৮৯২), "বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি" (১৮৯৯), "পৃথিবীর সুখ-দুঃখ" প্রভৃতি উল্লেখ-যোগ্য। বঙ্কিম-প্রভাবের যুগে সাহিত্য ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও তিনি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের চিন্তাধারারই অনুবর্তন করে চলেছেন। সমাজ-চিন্তায় তিনি সনাতন ব্যবস্থা রক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। সাহিত্য-সমালোচনার ব্যাপারেও তিনি সৌন্দর্যসৃষ্টি অপেক্ষা নীতিবোধের দ্বারাই বেশি পরিচালিত হয়েছেন। সাহিত্যিকের আদর্শ হল মধ্যযুগের নীতিবোধকে সমর্থন করা—চন্দ্রনাথ বসুর এরূপ অভিমত অবশ্যই গ্রহণযোগ্য নয়।

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-৮৬)॥ বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত রাজকৃষ্ণ বাংলা ভাষায় গদ্য-পদ্য উভয়বিধ রচনা লিখেছেন। ভাষাতত্ত্ব, প্রাচীন দর্শন ও পুরাণ কাহিনী বিষয়ে তিনি ইংরেজীতে মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছিলেন। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে প্রতিভানুযায়ী উপযুক্ত অবদান তিনি রেখে যেতে পারেন নি। তাঁর একমাত্র প্রবন্ধের বই "নানা প্রবন্ধ" ১৮৮৫ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রবন্ধে ঐতিহাসিক গবেষকের নিষ্ঠা ও বিচার-বুদ্ধির পরিচয় মেলে। তাঁর ভাষা বিষয়ানুগ, তাই ভাবাবেগপূর্ণ সাহিত্যরস সেখানে প্রত্যাশিত নয়। বিষয়ের মূল্যে এবং বিষয়বিন্যাসের নিপুণতায় তাদের মূল্য এবং তা একান্ত অকিঞ্চিৎকরও নয়।

যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪)॥ "আর্যদর্শন" পত্রিকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গিয়েছেন। তিনি বিশেষ করে জীবনীমূলক প্রবন্ধ রচনায় প্রবণতা দেখিয়েছেন। "জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত" (১৮৭৭), "ম্যাট্‌সিনির জীবন-বৃত্ত" (১৮৮০), "ওয়ালেসের জীবন-বৃত্ত" (১৮৮৬), "গ্যারিবল্‌ডীর জীবন-বৃত্ত" (১৮৯০) এবং "বীরপূজা" গ্রন্থে দেশীয় এবং বিদেশী দেশপ্রেমিক ও মনীষীদের জীবন-কথা বিবৃত করেছেন। তাঁর অপরাপর প্রবন্ধগ্রন্থের মধ্যে "হৃদয়োচ্ছ্বাস" (১৮৮১), "সমালোচনা-মালা" (১৮৮৫), "চিন্তা-তরঙ্গিনী"র (১৮৯০) নাম উল্লেখযোগ্য। বিদেশীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে যে-সব মহাত্মা গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁদের জীবন-কথা আলোচনায় যোগেন্দ্র-নাথের বেশি আগ্রহ ছিল। তাঁর স্বাজাত্যবোধ এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭)॥ রামদাস সেন অল্পকালই বেঁচেছিলেন, কিন্তু সুবিপুল অধ্যয়নে এবং ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা-প্রবণতায় তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বিশিষ্ট প্রাবন্ধিকের স্থান অধিকার করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্য ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি প্রবন্ধ রচনায় হাত দেন। তাঁর অনেকগুলি প্রবন্ধই "বঙ্গদর্শনে"র জন্য রচিত হয়েছিল। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রধান হল তিন খণ্ডে সঙ্কলিত "ঐতিহাসিক রহস্য" (১৮৭৪, ১৮৭৬, ১৮৭৯), "রত্ন রহস্য" (১৮৮৪), "ভারত রহস্য", এবং "বুদ্ধদেবে"র জীবনী ও ধর্মনীতি সংক্রান্ত গ্রন্থটি। ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে বাংলা ভাষায় মৌলিক প্রবন্ধ খুব বেশি লেখা হয় নি। রামদাস সেনের দান এদিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ রচনায় বিশিষ্টতা অর্জনের পূর্বে তিনিই বাংলা ভাষায় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বচর্চার ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। মনীষী রাজেন্দ্র-লাল মিত্রের তিনি ছিলেন যোগ্য উত্তরসাধক। "ক্যালকাটা রিভিয়ু" পত্রিকা ঠিকই লিখেছিল, "As an earnest and indefatigable student of Indian antiquities, he has no equal in this country, with the single exception of Dr. Rajendralal Mitra." কিন্তু রাজেন্দ্রলালের পুরাতাত্ত্বিক গবেষণা ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল। রামদাস সেন বাংলা ভাষায় তাঁর গ্রন্থাদি প্রকাশ করে বাংলা ভাষাকে পুষ্ট করেছেন।

রজনীকান্ত গুপ্ত (১৮৪৯-১৯০০)॥ রজনীকান্ত স্কুল-কলেজের শিক্ষা খুব বেশি পান নি। কিন্তু ঐতিহাসিক প্রবন্ধ-রচনায় তিনি আপন বিশিষ্টতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন। শুধু মাত্র প্রবন্ধ রচনার দ্বারাই নয়, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার পরিচালনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পঠন-পাঠন প্রবর্তনের চেষ্টায় এবং প্রাচীন কবিদের পুঁথি সংগ্রহে তিনি যে নিষ্ঠা ও পরিশ্রমের সঙ্গে কাজ করেছেন বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতির ইতিহাসে তার মূল্যও স্বীকার্য। রজনীকান্তের অধিকাংশ প্রবন্ধ ইতিহাসবিষয়ক। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "ঐতিহাসিক পাঠ" (১৮৮২), "বীর-মহিমা" (১৮৮৬) এবং "প্রতিভা" (১৮৯৬)। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" (১৮৭৯-১৯০০)। ষোল শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থ বাঙালীর ঐতিহাসিক মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী রজনীকান্তের ঐতিহাসিক প্রবন্ধের বিষয়ে বলেছেন, "ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তিনি যে তেজস্বিনী ভাষার অবতারণা করিয়াছিলেন, তেমন ভাষায় কথা কহিতে সকলে সমর্থ হন নাই।... যে আন্তরিকতা ও সহৃদয়তাকে তাঁহার বিশিষ্ট গুণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি সেই আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা হইতে এই ভাষা উৎপন্ন। তাঁহার মনের আবেগ, বর্ণিত বিষয়ের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সেই ভাষায় স্বভাবতঃ প্রকাশ পাইত; তাঁহার মর্ম হইতে সেই ভাষা বহির্গত হইয়া পাঠকের মর্মে গিয়া প্রবেশ করিত।" বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের পক্ষে এরূপ ভাষা বিশেষ উপযোগী।

অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৬-১৯১৭)॥ বঙ্কিমচন্দ্রের সুহৃদ অক্ষয়চন্দ্র সরকার নানাবিধ গদ্য-পদ্য রচনা করে সেকালে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। "সাধারণী", "নবজীবন" প্রভৃতি পত্রিকা তিনি যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর "কমলাকান্তে" অক্ষয়চন্দ্রের একটি রচনাকে স্থান

দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছিলেন। "আলোচনা" (১৮৮২), "সনাতনী", "কবি হেমচন্দ্র" প্রভৃতি সমাজ, দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কীয় গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। "রূপক ও রহস্যে"র কয়েকটি লঘু প্রবন্ধ কৌতুক-রস স্পর্শে বেশ উপভোগ্য। "পিতা-পুত্রী" নামক তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনাটি উল্লেখযোগ্য। "অক্ষয়চন্দ্রের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার অকৃত্রিম দেশাত্মবোধ ও স্বদেশপ্রীতি, বাঙালীর যাহা কিছু সম্পদ বলিয়া তিনি জ্ঞান করিতেন, তাহাকেই তিনি সকল আক্রমণ হইতে পক্ষীমাতার মত রক্ষা করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন; ইহা শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা জেদে দাঁড়াইয়াছিল এবং প্রগতিশীল নূতনদের কাছে অক্ষয়চন্দ্র গোঁড়া বলিয়া নিন্দিত হইয়াছিলেন।" (—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় (১৮৪৯-১৯২২)॥ বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহ ও আনুকূল্যে চন্দ্রশেখর বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর "উদ্‌ভ্রান্ত-প্রেম" সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য "মসলা বাঁধা কাগজ" (১৮৭২-৭৩-এর কাছাকাছি সময়ে রচিত) "সারস্বত কুঞ্জ" (১৮৮৫), "স্ত্রী-চরিত্র" (১৮৯০)। সারস্বত-কুঞ্জ এবং স্ত্রী-চরিত্র জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের গ্রন্থ। "মসলা বাঁধা কাগজ" লঘু ব্যঙ্গাত্মক আত্মগৌরবী প্রবন্ধের সঙ্কলন। তাঁর গুরু-লঘু উভয়বিধ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা-পদ্ধতি এবং ভাষা-ভঙ্গির গুরুতর প্রভাব লক্ষণীয়। অনুকরণাত্মক হলেও তাঁর প্রবন্ধগুলি সাহিত্য-গুণ সমন্বিত।

ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় (১৮৫১-১৯০৩)॥ সমালোচনা-প্রবন্ধ রচনায় ঠাকুরদাস বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি খোলা মন নিয়ে সাহিত্য-সমালোচনায় অগ্রসর হতেন। য়ুরোপীয় সমালোচনা-শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর গভীর পরিচয় ছিল। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁর ত্রিশটির উপর সমালোচনা প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে। "সাহিত্য-মঙ্গল" (১৮৮৮) নামে তাঁর একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থও আছে। সমকালীন অন্যান্য সমালোচকদের মত তিনি নীতিঘটিত প্রশ্নে প্রবেশ না করে সৌন্দর্যকেই মূল্য দিয়েছেন। সরস লঘু প্রবন্ধ রচনায়ও তিনি সফলতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর "সোহাগ চিত্র" ও "সহর চিত্রে"র নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২)॥ বিবেকানন্দের অধিকাংশ লেখাই ইংরেজীতে। তাঁর চিঠিপত্রে এবং সামান্য দু'একটি গ্রন্থে তিনি বাংলা ভাষা ব্যবহার করেছেন। কিন্তু স্বল্প অবকাশে তিনি ভাষারীতির ক্ষেত্রে বিস্ময়কর

নবীনতা দেখিয়েছেন। একদিকে বঙ্কিমচন্দ্র, অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের মত দিকপাল সাহিত্যিকের গদ্যভঙ্গির দ্বারা তিনি বড় প্রভাবান্বিত হন নি। ক্রিয়াপদগুলিতে সাধুভাষা বজায় থাকলেও তাঁর 'ভাষা একান্তভাবেই চলিত রীতির। এই ভাষার মধ্যে বীর্য এবং পৌরুষ যুগপৎ প্রতিফলিত। চিন্তা-ধারার ক্ষেত্রেও বিবেকানন্দের বিশিষ্টতা লক্ষণীয়। তিনি ধর্মরাজ্যের মানুষ হলেও তাঁর সমাজচেতনা এবং ইতিহাসবোধ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। সমাজ-তান্ত্রিক ভাবনা যত স্পষ্ট করে তাঁর লেখায় প্রকাশিত হয়েছে ততটা সেকালে আর কারও প্রবন্ধে ঘটে নি॥

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্র-পর্ব

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র পর্বের গ্রহনাথ; শরৎচন্দ্র তাঁকে "কবি সার্বভৌম" বলে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাঁর পূর্ণতর পরিচয় এর চেয়ে সংক্ষিপ্ত ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির বিপুলতায় ও বিচিত্রতায়, ভাবগভীরতায় ও শিল্পনিপুণতায় নিঃসন্দেহে একটি দীর্ঘস্থায়ী যুগের প্রধান ব্যক্তিরূপে অভিহিত হতে পারেন। উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগেই কবি, নাট্যকার, গল্পলেখক ও প্রবন্ধ রচয়িতা রূপে তিনি অভূতপূর্ব বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন। আবার বিংশ শতকের পঞ্চম দশক পর্যন্ত তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা এবং রচনার উৎকর্ষ অব্যাহত তো ছিলই নব নব ভাবকল্পনা ও রূপচেতনাকে আয়ত্ত করার জন্যও সচেষ্ট থেকেছে।

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র শক্তিমান লেখক হলে সাহিত্যের ইতিহাসের একটি যুগকে তাঁর নামে চিহ্নিত করা যেত না। তিনি দীর্ঘকাল ধরে সমসাময়িক এবং পরবর্তী সাহিত্যিকদের উপরে গভীর ও ব্যাপক প্রভাব বিকীর্ণ করেছেন। প্রথমত, বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি ধারায় তিনি অনন্য বিশিষ্টতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়েছেন। নাট্যসাহিত্যে অনেকগুলি নবধারা (কাব্য-নাট্য, সংকেত-রূপকনাট্য প্রভৃতি) সূচিত হয়েছে তাঁরই রচনায়। উপন্যাস সাহিত্যে সম্পূর্ণ নবীন ধারার জন্ম দিয়েছেন তিনি (খণ্ডোপন্যাসে)। বাংলা ছোট গল্প প্রকৃত রূপসিদ্ধি লাভ করল তাঁরই হাতে। তাছাড়া কাব্য-কবিতার ক্ষেত্রে ভাব ও রূপরীতিতে কত বিচিত্র নবীনতা নিয়ে এলেন স্বল্প অবকাশে তা বুঝিয়ে বলা একরূপ অসম্ভব। দ্বিতীয়ত, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির ভাব-ভাবনার রেশ শতাব্দীর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে আসছিল। মূল্যবোধে নিশ্চিত পরিবর্তন আরম্ভ হল বিংশ শতকের প্রারম্ভ থেকেই। রবীন্দ্রনাথের এক পা উনবিংশ শতকের শেষভাগে, অন্য পদপাতে তিনি প্রথম মহাযুদ্ধ অতিক্রম করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে স্পর্শ করেছেন। নবজাগৃতির ভাবরসের ঐতিহ্য তাঁর মধ্যে বহমান। আধুনিক পৃথিবীর সংশয় ও যন্ত্রণার

প্রান্তদেশে তিনি শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছেন। দু'টি স্বতন্ত্র পর্বকে তিনি যুক্ত করেছেন। ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন, আধুনিকত্তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তাঁরই জন্য বাংলা সাহিত্যে নবজাগৃতিকালীন ভাব ভাবনার কৃত্রিম অনুবৃত্তি দীর্ঘস্থায়ী হয় নি, য়ুরোপীয় চিন্তা-জগতের সাম্প্রতিক রুগ্নতার অনুপ্রবেশ বিলম্বিত হয়েছে। তৃতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ সমকালীন লেখকদের প্রভাবিত করেছেন। পরবর্তী লেখকদের উপরেও তাঁর প্রভাবের পরিমাণ সুগভীর। সাম্প্রতিক লেখকগোষ্ঠি রবীন্দ্র-প্রভাব পরিমণ্ডল থেকে স্বতন্ত্র পথ ধরেছেন, কিন্তু তাঁরাও নানাদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি পর্বের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। তাঁর নামে এই পর্বকে চিহ্নিত করা যুক্তিযুক্ত। এই পর্বে আমরা রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এবং রবীন্দ্র-প্রভাবকালের অপরাপর কবি, ঔপন্যাসিক-গল্পকার, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিকদের সঙ্গে পরিচিত হব।

॥ এক ॥

রবীন্দ্রনাথ

কাব্য-কবিতা

রবীন্দ্রনাথের প্রথম কাব্য "কবিকাহিনী" ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত হয়, মৃত্যুর পূর্বে প্রকাশিত শেষ কাব্য "জন্মদিনে" ১৯৪১ সালে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। বাষট্ট বৎসরেরও বেশি সময়ে তিনি অজস্র কাব্য-কবিতা এবং গান রচনা করেছেন। তাদের সংখ্যার প্রাচুর্য এবং বিষয়-বিচিত্রতাই যে-কোন পাঠককে বিস্ময়বিমূঢ় করবে। তার উপরে শিল্পোৎকর্ষ এবং ভাবগভীরতার সমন্বয় তাঁর কাব্যসৃষ্টিকে যে ধরনের বিশিষ্টতা দিয়েছে আমাদের দেশে তার তুল্য নিদর্শন নেই, অন্যান্য দেশেও স্বল্পই আছে।

রবীন্দ্রনাথ পয়তাল্লিশ খানার বেশি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। এ ছাড়া তাঁর বহুসংখ্যক সঙ্গীতও গ্রন্থবদ্ধ হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের বাণী-অংশের কাব্য-মূল্যও সামান্য নয়। তবে সুরের সহযোগ ব্যতীত সঙ্গীতের বাণী-অংশের বিচার করা উচিত নয় বলে তাদের আলোচনা পরিহার করেছি।

রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা বিবর্তনধর্মী। এই বিবর্তন ভাবানুভূতি এবং শিল্পরূপচেতনা—উভয়ত প্রকাশিত। উনবিংশ শতাব্দীর মানবপ্রীতিতে তাঁর

স্থিতি, বিংশ শতকের দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তীব্রকঠিন জিজ্ঞাসা পর্যন্ত তাঁর কবি-চিত্তের বিস্তৃতি, আবার প্রাচীন ভারতের সৌন্দর্য-কল্পনার ধ্যানলোকে তাঁর আত্মসমাহিত বিহার। রবীন্দ্রনাথের কাব্যানুভূতির এই বিপুল কালগত ও রসগত বিস্তার এবং বিচিত্র তরঙ্গভঙ্গের মধ্য থেকে প্রধান প্রধান কয়েকটি ভাবসূত্র আহরণ করা যেতে পারে।

কবি জগৎ ও জীবনের প্রতি পোষণ করেছেন এক সুগভীর ভালবাসা। উনবিংশ শতাব্দীর নব্য মানবতাবাদে এর জন্ম, কিন্তু বিংশ শতকে লোভ ও যুদ্ধজীর্ণ য়ুরোপ হতাশা ও ব্যাধিগ্রস্ততায় যখন আর্ত তখনও মানুষের প্রতি বিশ্বাস তিনি হারান নি। মৃত্যুর দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে মৃত্যুর কণ্ঠে তিনি বরমাল্য দুলিয়েছেন। একদিকে তিনি জীবনবিরোধী তত্ত্বকে ধিক্কার দিয়েছেন, মানবতাবিরোধী মায়াবাদকে কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেন নি, মানুষের মধ্যে ভগবানকে অনুসন্ধান করেছেন, জীবনবিবিক্ত ভূমাসন্ধানকে চরম ব্যর্থ বলে করেছেন অনুভব। অন্যদিকে লোভক্ষত আধুনিক সভ্যতা যন্ত্রকে কেন্দ্র করে মানবতাকে যেখানে নিষ্পেষিত করেছে, কবিকণ্ঠে সেখানে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে, সর্ববাধাজয়ী মানবতার শক্তিতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্তিকামমতা তাঁর কাব্যকে এমন বর্ণে রঞ্জিত করেছে, এমন রূপমাধুর্য দান করেছে যাতে তাঁর অরূপ ভূমার সাধনা মানবলোক সাপেক্ষ হয়েই যেন আত্মপ্রকাশ করেছে।

কিন্তু মানুষের প্রতি কবির ভালবাসার মধ্যে একটি বেদনার সুর আছে, আছে আদর্শের প্রতি সুতীব্র বাসনা। মানবজীবনের প্রাত্যহিক সামান্যতাকে তিনি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি জানাতে পারেন নি। এখানে "জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি, দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।" প্রয়োজনের মালিন্য লেগেছে এর চারধারে। মানবের মুক্তপ্রাণ প্রসন্নতাকে, তার অন্তরের প্রকৃত মনুষ্যত্বকে এই মোহ-ভোগ-লোভের তুচ্ছতা থেকে মুক্ত করতে হবে। অসীমের সঙ্গে সংযোগেই তার যথার্থ মুক্তি, অপ্রয়োজনের আনন্দলোকের ভূমিকায়ই তার প্রকৃত পরিচয়।

একদিকে মানবলোক, অন্যদিকে অসীম তত্ত্বলোক—এই দুইয়ের মাঝখানে কবিচিত্ত নিত্য আন্দোলিত। এই দ্বন্দ্বকেই কবি নিজে বলেছেন সীমা ও অসীমের মিলন সাধনের পালা। কবি এই দুই প্রান্তকে সমন্বিত করতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রকাব্য সেই সমন্বয় সাধনের সুতীব্র আকুতি এবং শাশ্বত সৌন্দর্য-বিরহের অকারণ বেদনায় পূর্ণ। এই সমন্বয় ক্বচিৎ ঘটেছে কারণ

এ সমন্বয় ঘটবার নয়। কবি কল্পনায় এমন কাম্যলোক সৃষ্টি করতে চেয়েছেন যেখানে অরূপ আকুতি রূপে ধরা দেবে, যেখানে মানবলোকের ক্রন্দন আদর্শায়িত হয়ে লাভ করবে প্রশান্ত নিশ্চিন্ততা। সে উপলব্ধি শব্দ-বর্ণ-সঙ্গীতে কখনও দেখা দিয়েছে কবির অন্তরের অন্তঃপুরে, তারপরে মিলিয়ে গিয়েছে দূরে। কবির কাব্য একটা বেদনার বিষণ্ণতার সুর বহন করে ফিরেছে।

রবীন্দ্রনাথ তত্ত্বোপলব্ধির দিক থেকে সঙ্কটমুক্ত হতে চেয়েছেন। তিনি মানবজীবন ও বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরালে আনন্দময় মহাসত্তার লীলা অনুভব করতে চেয়েছেন। সব খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্যের পিছনে অখণ্ড সৌন্দর্যসত্তার অস্তিত্বে তিনি বিশ্বাস করেছেন। রূপ ও অরূপকে এই লীলার আনন্দবন্ধনে তিনি ঐক্যসূত্রে বদ্ধ করতে চেয়েছেন। সম্ভবত উপনিষদের ব্রহ্মচেতনা থেকেই এই বিশ্বাসের সূত্রপাত, কিন্তু কবিআত্মার ব্যক্তিগত উপকরণ যুক্ত হয়ে এই মহাসত্তা এতই লীলাময় হয়ে উঠেছেন যে প্রায়ই এক রহস্যময়ী নারীরূপে তিনি কবির রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই সূত্র ধরেই, কবির কাব্যে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমাকুতি ঊর্ধ্বায়িত হয়ে বিশ্বব্যাপী তত্ত্বচেতনায় আশ্রয় লাভ করেছে। ব্যক্তি-প্রাণের রক্তিম বিরহবেদনা নিখিল সৌন্দর্যের জন্য রোমান্টিক ক্রন্দনে পরিণত।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে মানবপ্রীতি সুগভীর ও বিচিত্রসুন্দররূপে আত্মপ্রকাশ করলেও মানবের কামনাবাসনামথিত প্রেমকে তিনি ইন্দ্রিয়-ঊর্ধ্ব ভাব ও তত্ত্বলোকে সমুন্নীত করেছেন। তাই বিরহে প্রেমের মুক্তি, মিলনে তার অবসান এই বোধ তাঁর কবিতায় এবং অন্যান্য সাহিত্যকর্মে বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যোপলব্ধিতে প্রকৃতির ভূমিকা বিশিষ্টতম। প্রকৃতি-বিচ্যুত জীবনচেতনা যেমন তাঁর রচনায় কমই প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকৃতির মধ্য দিয়ে অসীমের আহ্বানও কবি বার বার শুনেছেন। ললিত ও কঠোর প্রকৃতির দুই রূপকেই তিনি প্রাণ ভরে দেখেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লালিত্যের মাহাত্ম্যই তাঁর কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতির মধ্যে তিনি সন্ধান পেয়েছেন প্রাণের—প্রাণের আদিতম রূপ দেখেছেন বৃক্ষে, সমুদ্রকে কল্পনা করেছেন আদিজননী, বসুন্ধরার মাতা বলে; সূর্য তাঁর কাছে অনুভূত হয়েছে সর্বপ্রাণের উৎসরূপে। বিশ্ব নিখিলের প্রাণের সঙ্গে আপনার যোগকে তিনি উপলব্ধি করেছেন নিবিড়ভাবে। ষড়ঋতুর লীলা-আবর্তনের আনন্দরস আকণ্ঠ

পান করেছেন। তার মধ্যে দেখেছেন বিশ্বনিয়ন্তার লীলানর্তন—মানুষের প্রাণের মুক্তি এই লীলারস আস্বাদনে।

উপরে বিবৃত সূত্রগুলির সহায়তায় রবীন্দ্র-কাব্য পাঠে মোটামুটি ভাবে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে। কিন্তু কবি ষাট বছরের বেশি সময় ধরে পয়তাল্লিশ খানার উপরে কাব্য লিখেছেন। তার মধ্যে ক্রম বিবর্তনের একটি সুর সহজেই লক্ষ্য করা যায়। গতিশীলতা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

১৮৭৮ সাল থেকে প্রকাশিত এবং ১৮৮২ সালের পূর্বে রচিত কাব্যগুলি কিশোর কবির অপরিণত রচনা। "কবিকাহিনী", "বনফুল", "ভগ্নহৃদয়" "ভানুসিংহের পদাবলী", "শৈশব সঙ্গীত" এবং কয়েকটি গীতিনাট্য-কাব্যনাট্য এই পর্বের রচনা। গ্রন্থাকারে এর কোন কোন রচনা পরে প্রকাশিত হয়েছে। ভাবে এবং সুরে ও ছন্দ-নির্মিতিতে এরা পরবর্তী কালকে পরিচিত করে না। রবীন্দ্রনাথ নিজে এদের আপন পরিণত কাব্য-সঙ্কলন থেকে পরিত্যাগ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। এই সময়কার রচনার মধ্যে ভানুসিংহের পদাবলী বিস্ময় জাগায়। বৈষ্ণব কবিদের ভাবগভীরতা কিশোর কবির রচনায় প্রত্যাশিত ছিল না। তবে শব্দঝঙ্কার ও ছন্দ-লালিত্য মিলিয়ে সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে অনেকখানি সাফল্য যে কবি লাভ করেছেন তা স্বীকার্য।

"সন্ধ্যাসঙ্গীত" (১৮৮২) থেকে কবির কবিতা পরিণতি পেতে থাকে। ১৮৮৬ সালের মধ্যে "প্রভাতসঙ্গীত", "ছবি ও গান", "কড়ি ও কোমল" প্রকাশিত হয়। এই চারটি কাব্য মিলে কবিভাবনা ও রচনারীতির প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর্ব। সন্ধ্যাসঙ্গীত বিষণ্ণতার সুরে পরিপূর্ণ। কবি আপন মনের গহনে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। রূপ-রস-সমৃদ্ধ জীবনের সঙ্গে অপরিচয়ই কবিচিত্তের এই দুঃখ-বিলাসের কারণ। প্রভাতসঙ্গীত কাব্যে কবি প্রথম আপন মনের অন্দর থেকে দৃষ্টিকে বাহিরের জগতের প্রতি প্রসারিত করেছেন। প্রথম দেখার আনন্দ ও বিস্ময় এই কাব্যের কবিতায় কলকণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই নূতন ভাললাগার রঙে জড়িত কাব্য "ছবি ও গান"। ছবি ও গানে বাহিরের জগতের বস্তুর অজস্র ছবি শব্দে সমর্পিত হয়েছে। কোন ভাবগভীরতা এর মধ্যে প্রকাশ পায় নি। বস্তুচিত্রেই এই কাব্যের কবিতাগুলি পূর্ণ। কবির প্রথম ভাললাগার রঙে চিত্রগুলি রঞ্জিত। একটা ভারহীন সহজের রসে কাব্যটি তৃপ্তি দেয়। "কড়ি ও কোমল" অনেক পরিণত কাব্য। কবির ভাবানুভূতি ও রূপসাধনা ক্রমেই পুষ্টতর হচ্ছিল।

এ-কাব্যে সনেটের আঙ্গিকে রচিত কবিতার সংখ্যাধিক্য। কবির মর্ত্যমমতা যে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ মিলল কাব্যটির বিষয়চয়নে। প্রথম যৌবনের মোহে নারীদেহ যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে কবির চিত্তে তাকে কাব্যে ধৃত করতে চেয়েছেন তিনি। কিন্তু তখন থেকেই তাত্ত্বিক নিরাসক্তি ও ঊর্ধ্বায়নের সুর কবিতায় বাজতে আরম্ভ করেছে। এই ভাবে কবি প্রস্তুতি-পরীক্ষার পর্ব শেষ করলেন ১৮৮৬ সালে।

নবপর্বের সূচনা ১৮৯০ সালে প্রকাশিত "মানসী" থেকে। আরও সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বলতে হয় ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত সোনারতরী থেকেই কবি পরিণত। মানসীর কোথাও কোথাও অপরিণতিজনিত দ্বিধা আছে। মানসীর কাব্যে কবির প্রেমবোধে ইন্দ্রিয়ানুগ তীব্রতা কোথাও কোথাও প্রকাশিত, কিন্তু অতি দ্রুত sublimation-এর সিদ্ধিতে পৌঁছে কবি নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এ-কাব্যে কবির প্রেমবোধ অনেকগুলি কবিতাকে আশ্রয় করেছে। এই যুগের অপর কোন কাব্যে এতগুলি প্রেমবিষয়ক কবিতা নেই। সোনারতরী-চিত্রায় সৌন্দর্য ও প্রেমচেতনা যুগনদ্ধ রূপ লাভ করেছে। মানসী কবির যৌবন-কালের কাব্য। ইন্দ্রিয়ানুগ প্রেমচেতনাকে ইন্দ্রিয়াতীত ভাব-সর্বস্বতায় উত্তীর্ণ করতে কবিকে অন্তরে অন্তরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। ব্যক্তিচিহ্ন মুছে দিলেও এ-ইঙ্গিত এই কাব্য থেকে পাঠ করা যায়। মানসীতে কবির প্রকৃতিচেতনার বিশিষ্টতা দানা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। কোন কোন কবিতায় স্পষ্ট প্রকাশ পেয়েছে চিরন্তন সৌন্দর্যের জন্য কবির রোমান্টিক বিরহাকুতি। সোনারতরীতে এই অকারণ অনির্দেশ্য ও অনির্বাচ্য সৌন্দর্যের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রার কামনা যেমন একদিকে প্রবল হয়ে উঠেছে তেমনি এই কাব্যেই অন্যদিকে মর্ত্যমমতা প্রথম তীব্র ও গভীরভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে। প্রিয়জনকে দেবতার আসনে বসিয়েছেন কবি, মায়াবাদী ধরিত্রীবিমুখ তাত্ত্বিকদের ধিক্কার দিয়েছেন। কিন্তু মৃত্যুর স্রোতে ভাসমান জীবনের ক্ষণিক অস্তিত্ব তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছে। জীবনের প্রতি প্রেম ও মৃত্যুর রহস্য-জটিল অনিবার্যতা এখনও কবিচিত্তে সমন্বিত ভাবরূপ সৃষ্টি করে নি। নিসর্গচেতনা অবশ্য একটা তাত্ত্বিক উপলব্ধির পূর্ণতা লাভ করল এই কাব্যে। নিখিল বিশ্বের সহিত একাত্মতা অনুভব করলেন কবি। জড়-প্রকৃতির মধ্যে প্রাণের অস্তিত্বে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল। "চিত্রা" (১৮৯৬) এ-পর্বের বিশিষ্টতম কাব্য। এই কাব্য প্রসঙ্গে অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "কাব্যকলার ক্রমবিকাশের পথে চিত্রা হল সেই উচ্চভূমি

যেখানে সমস্ত পথ একটা স্থিরত্ব ও সংহতি লাভ করেছে, যেখানে উচ্চতা, পূর্ণতা ও বিরাম এবং যেখান থেকে দেখা যায় যে পথ বহুদূরে অনন্তে গিয়ে মিশেছে।···চিত্রা কাব্যের এই পরিপূর্ণতাই চিত্রার বিশেষ লক্ষণ। এখানে দেখা যায়, কবির নিরুদ্দেশ সৌন্দর্যব্যাকুলতা স্থির সৌন্দর্য-অনুধ্যানে রূপান্তরিত হয়েছে, মর্ত-উপলব্ধির আগ্রহ সাধারণ মর্তপ্রীতিকে অতিক্রম ক'রে বিশেষ ও বাস্তব মানব-প্রীতির চরিতার্থতায় উপনীত হয়েছে, কাব্যের প্রকাশরীতিতে—শব্দবিন্যাসে ও বাচনভঙ্গিতে বিস্ময়কর অনবদ্যতা এসেছে এবং সর্বোপরি কবি আপন সৃষ্টিক্রিয়ারত গতিশীল ব্যক্তিসত্তার অজ্ঞাত পরিণামের পথে যাত্রা অনুভব ক'রে অপরিসীম বিস্ময় বোধ করেছেন।" চৈতালির কবিতাগুলি সনেট জাতীয়। এই কাব্যে কবির মর্তপ্রেম এবং বৈরাগ্যবিমুখ জীবনপ্রীতি সুগভীর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কবির ধর্মচেতনা যে এই বোধের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীবদ্ধ বর্তমান কাব্য থেকে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। চৈতালিতে সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সঙ্কলিত সৌন্দর্যচিত্র আপন উপলব্ধির রঙে রঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন কবি। পূর্ব থেকেই দু'একটি কবিতায় প্রাচীন কাব্যের রসচর্চা চলছিল, চৈতালি থেকে তা একটি প্রধান সুরে পরিণত হল।

"কল্পনায়" স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনীতীরে প্রয়াণ করে তার রূপ-রস-সৌন্দর্য আস্বাদ করেছেন কবি। সঙ্গে সঙ্গে সেই অতীতকালের বর্ণাঢ্য সৌন্দর্য আয়ত্তাতীত হওয়ায় বেদনার আর্তি প্রকাশ পেয়েছে কবির কণ্ঠে। কল্পনায় অপর এক সুরের কবিতা আছে। সোনার তরী-চিত্রায় একটি-দুটি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের জগৎ থেকে কর্মের জগতে উত্তরণের বাসনা প্রকাশ করেছিলেন, কল্পনায় তা একটি প্রধান ধারায় পরিণত হয়ে বেশ কয়েকটি কবিতায় সবে আত্মপ্রকাশ করেছে। চৈতালি থেকে আরম্ভ করে "নৈবেদ্য" (১৯০১) কাব্য পর্যন্ত কবি বিশেষ ভাবে প্রাচীন ভারতে মানসভ্রমণ করেছেন। চৈতালি-কল্পনায় সেকালের বর্ণাঢ্য সৌন্দর্যসম্ভোগ, "কথা ও কাহিনী"র গাথা কবিতা ও কাব্যনাট্যে সেকালীন জীবনাদর্শ ও চরিত্র-মাহাত্ম্যের বর্ণনা, "ক্ষণিকা"য় লঘুচটুল সুরে সেকালের সৌন্দর্যের আস্বাদ এবং "নৈবেদ্যে" সেকালীন জীবনের ধর্মীয় বিশেষত ঔপনিষদিক আদর্শ কবিতার বিষয়বস্তুরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

মানসী থেকে ক্ষণিকা (১৯০০) পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের একটি বিশিষ্ট পর্ব। মানবপ্রীতি, নিসর্গ-চেতনা, সৌন্দর্যবোধ ও প্রেমজিজ্ঞাসায় এই পর্বে ইন্দ্রিয়-উপলব্ধির বর্ণ-বিচিত্রতা চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে।

"খেয়া" (১৯১০) প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত কবির কাব্য-সাধনায় একটি বড় ছেদ পড়েছে। "স্মরণ", "শিশু" কাব্য দু'টি ব্যক্তি-জীবনের সাময়িক কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কেন্দ্র করে রচিত।

"খেয়া", "গীতাঞ্জলি", "গীতিমাল্য", "গীতালি" অর্থাৎ ১৯১০ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একটি নবপর্বের বিস্তৃতি। খেয়াতে পার্থিব সৌন্দর্যজগৎ থেকে বিদায় নিয়ে কবি অরূপানুভূতির আহ্বানে যাত্রা করেছেন। কিন্তু অরূপ এখনও দূর থেকে রহস্যাবৃত সংকেতে-ইঙ্গিতে ক্ষণে দেখা দিয়ে ক্ষণে মিলিয়ে যাচ্ছে। পিছন থেকে রূপবর্ণগন্ধময় প্রেম-প্রীতির পৃথিবীর আকর্ষণও একেবারে খসে পড়ে নি। খেয়ায় এই আলোছায়ার খেলা সুন্দর ফুটেছে। গীতাঞ্জলিতে অরূপকে লীলাময়রূপে কবি নিকটে পেয়েছেন, তাঁর সঙ্গে একটা হার্দ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কবির। প্রকৃতির পটভূমি এই উপলব্ধিকে উজ্জ্বল করে প্রকাশ করেছে। এই তিনটি কাব্যের ভাবসাদৃশ্য ঘনিষ্ঠ হলেও গীতাঞ্জলি থেকে "গীতিমাল্যে" কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশিষ্ট রবীন্দ্র-সমালোচক অজিত কুমার চক্রবর্তী বলেছিলেন, "গীতাঞ্জলি যেন দেবতার পায়ে সসম্ভ্রমে গীতি-নিবেদন —সেখানে 'দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে, বন্ধু বলে দুহাত ধরি নে।' গীতিমাল্য বঁধুর গলায় গীতিমাল্যের উপহার। দূরত্বের বাধা দূর হইয়া অত্যন্ত নিকট নিবিড় পরিচয়।" গীতালিতে আবার কবি পৃথিবীর দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। অরূপের আলোকে কবি জীবন ও গতিকে নূতন করে দেখেছেন।

"বলাকা" (১৯১৬) থেকে "বনবাণী" (১৯৩১) পর্যন্ত কবির কাব্যের পরবর্তী পর্ব। এই পর্ব কালমাপে অতিদীর্ঘ এবং মাঝখানে দীর্ঘকাল বন্ধ্যা। কবি অরূপানুভূতির জগৎ থেকে আবার মাটির পৃথিবীর দিকে চোখ ফিরিয়েছেন। বলাকায় কবি জেগে উঠলেন যে পৃথিবীতে তা সৌন্দর্যে পেলব নয়, কর্মে উদ্দীপ্ত। তখন য়ুরোপে প্রথম মহাযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটেছে। দানবীয় হিংস্রতা, লোভ-কুটিল ভয়ঙ্করতা করালদংষ্ট্রা ব্যাদান করে আত্মপ্রকাশ করেছে। কবি তারই পটভূমিকায় নবযৌবনশক্তির উদ্বোধন-গীতি রচনা করেছেন, ভবিষ্যৎ কল্যাণের জন্য তাঁদের সংগ্রামে আহ্বান জানিয়েছেন। বলাকা গতিতত্ত্বের কাব্যরূপে পরিচিত। এ-কাব্যের কল্পনা, বার্গসঁর গতিতত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত। তবে ভারতীয় বেদান্তদর্শন তথা রবীন্দ্রনাথের কবিস্বভাবের সঙ্গে এই তত্ত্বের সাধারণ সাধর্ম্যের ফলে কবির কাব্যে তা সহজ স্থান করে নিয়েছে। বস্তুবিশ্বের অন্তরালে অরূপের গতির লীলা নিত্য চলেছে। তার

ফেনময় বুদ্বুদাকার প্রকাশ এই বস্তুবিশ্ব। কবির এই কল্পনাকে কেউ কেউ জীবন ও অরূপের সমন্বয় বলেছেন। বলাকার পরে "পূরবী" প্রকাশিত হল। মাঝখানে বেশ কয়েক বছরের ব্যবধান। পূরবীতে কবি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যৌবনস্মৃতি রোমন্থন করতে চেয়েছেন। অল্পকালের ব্যবধানে রচিত তিনটি কাব্য ষাট বৎসর উত্তীর্ণ রবীন্দ্রনাথের মনের একটি বিশিষ্ট ভাবাবেশ ধরে রেখেছে। পূরবীতে মৃত্যু-ভাবনার সঙ্গে সোনারতরীকালীন সৌন্দর্যস্বপ্ন জড়িয়ে গিয়েছে, "মহুয়ায়" প্রেমভাবনা বিস্ময়কর বীর্যময় রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে, কবির স্বভাবসুলভ sublimation থাকলেও ব্যক্তি-প্রেমের যে রূপ এ-কাব্যে ধরা পড়েছে পূর্ববর্তী কাব্যে তা কমই চোখে পড়েছে, "বনবাণী" কাব্যে কবির সোনারতরী-চিত্রা পর্বের নিসর্গরসসম্ভোগ নবরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। খেয়া থেকে গীতালি, বলাকা পর্যন্ত প্রকৃতি-রসের সংযোগ ছিল অরূপচেতনার সঙ্গে; বনবাণীতে বৃক্ষ "প্রথম প্রাণপ্রৈতি" রূপে অভিনন্দিত হল। ঋতুর উৎসবে নটরাজের কল্পনা পূর্ণমূর্তি লাভ করল।

"পুনশ্চ" থেকে রবীন্দ্রকাব্যের শেষ পর্বের শুরু। ১৯৩২ সাল থেকে কবির মৃত্যুকাল ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই পর্ব বিস্তৃত। প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী কালে য়ুরোপের চিন্তাক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন দেখা দিল। তার প্রতিফলন সমকালীন কাব্য-কবিতার উপরেও পড়ল। মানবমহিমায় বিশ্বাস ও ভবিষ্যতের আশ্বাস লুপ্ত হতে লাগল। "But with the disintegration of the age-old assumptions about the nature of man and the Universe, and with the collapse of optimism in war and unrest, there rose a fierce intellectualism, a literary revolt against the cult of progress, cosmic emotion, and subjectivity, accompanied by a search for impersonal concreteness and terseness of expression" (—The Trend of modern poetry) প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই প্রবণতাগুলি ক্রমে বাড়ছিল। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতায় এই ঝড়ো হাওয়ার স্পর্শ কিছু লেগেছিল একথা মেনে নিতে হয়। অবশ্য বৃদ্ধ বনস্পতির ঊর্ধ্ব শাখায় মাত্র চাঞ্চল্য জেগেছিল। পাতালের ভোগবতী পর্যন্ত প্রসারিত মূল রসের সঞ্চয়ে বঞ্চিত হয় নি কোন দিন। তাই বিংশ শতক রবীন্দ্রনাথকে আন্দোলিত করল, কিছুটা বিমর্ষও করল, দেখায় ও বলায় কিছু ভঙ্গিরও বদল হল। কিন্তু সংশয়ের শুষ্কতা পাতা ঝরিয়ে দিল না, অবিশ্বাসের আত্মগ্লানি ও যুগযন্ত্রণার আর্তি তার পেলব

মাধুর্যকে বিনষ্ট করতে পারল না। কবির এই সময়কার কাব্যগুলি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাব পরিমণ্ডলের দ্যোতক হয়ে ওঠে নি, মোটামুটি একই জাতীয় ভাবধারা অনুসৃত হয়েছে এই কালের কাব্যে। প্রথমত, আসন্ন মৃত্যুকে অনুভব করেছেন কবি। মৃত্যু ও জীবনে যেন ভেদ ঘুচে গিয়েছে। তারই মধ্য দিয়ে রূপাতীত পরম সত্যের অনির্বাণ জ্যোতি যেন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। দ্বিতীয়ত, মৃত্যুকে স্বীকার করেও কবি জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি সুগভীর ভালবাসা ব্যক্ত করেছেন। রোমান্টিক আকুলতার মধ্যে বাস্তব প্রত্যক্ষতার স্পর্শ লেগেছে এ ভালবাসায়। শ্রমজীবী জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস, স্বার্থপর ও লোভীদের প্রতি ভর্ৎসনা তীব্র হয়ে উঠেছে। চলে যেতে যেতে গভীর মায়ায় পৃথিবীর ছোট বড় সব কিছুকে ভালবেসে হৃদয়বর্ণ ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছেন কবি। তৃতীয়ত, কবি কতকগুলি কাব্যে বিশুদ্ধ গদ্য ছন্দ ব্যবহার করেছেন; এবং পরবর্তী কোন কাব্যেই আর পূর্বের ছন্দ-সঙ্গীতের রাজ্যে ফিরে আসেন নি। শব্দচয়নে, চিত্ররচনায় ও ব্যঞ্জনায় পূর্ববর্তী রোমান্টিক সৌন্দর্য-ব্যাকুলতার স্থলে অভিনব তির্যকতা, শিথিল নিরাসক্তি, ক্বচিৎ বিবর্ণ ক্বচিৎ তীব্র বাক্‌বিন্যাস নবীন রূপরীতির দ্বার উন্মোচন করল।

"পুনশ্চ" (১৯৩২), "বিচিত্রিতা", "শেষ সপ্তক", "বীথিকা", "পত্রপুট", "শ্যামলী" (১৯৩৬) প্রভৃতি কাব্যে নূতন ছন্দভঙ্গি ও বাক্‌বিন্যাসরীতির বিচিত্র পরীক্ষা চলেছে। পরবর্তী তিনটি কাব্য "খাপছাড়া", "ছড়া ও ছবি", "প্রহাসিনী" কৌতুক-কবিতার সঙ্কলন। সম্ভবত পূর্ববর্তী কাব্যগুলির বিচিত্র মানসপরীক্ষায় ক্লান্ত কবি লঘু কৌতুকের রাজ্যে বিশ্রাম খুঁজেছেন। "প্রান্তিক" (১৯৩৮), "সেঁজুতি", "আকাশপ্রদীপ", 'নবজাতক", "সানাই" কাব্যে (১৯৪০) মৃত্যুভাবনা, ঔপনিষদিক বোধ, আপন অতীত জীবনের মূল্যায়ন, মর্ত্যমমতা প্রভৃতি প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষ করে নবজাতকে কবি আধুনিক সভ্যতার যান্ত্রিকতা এবং যুদ্ধমত্ত বর্বরতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন এবং সানাই কাব্যে কবি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে যৌবনের সোনালী দিনের স্বপ্নে মুহূর্ত-বিহ্বলতা অনুভব করেছেন। পরবর্তী দুটি কাব্য "রোগশয্যায়" (১৯৪০) এবং "আরোগ্যে" (১৯৪১) কবি পূর্বে বিবৃত উপলব্ধিগুলির সঙ্গে রোগভোগজনিত মানসজীর্ণতা এবং ঈষৎ বিকৃতিজড়িত কিছু নব আস্বাদের সৃষ্টি করেছেন। জীবিতকালে প্রকাশিত তাঁর শেষকাব্য "জন্মদিনে" পৃথিবীর প্রতি প্রসন্ন বিশ্বাস ভাষা পেয়েছে। তাঁর সব শেষের কবিতাগুলি "শেষলেখা" নামে মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

নাটক

বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত নাট্যধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ সামান্য। বাংলা দেশের সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপরে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবও এমন কিছু নয়। কিন্তু বাংলা নাট্যসাহিত্যকে তিনি জনমনোরঞ্জনের স্তর থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির স্তরে উন্নীত করলেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়যোগ্য কিনা এ নিয়ে বিতর্ক করে লাভ নেই। অভিনয় ও মঞ্চ উপস্থাপনাগত সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার চরম শিখরে পৌঁছলেও কোন নাটকের সাহিত্যিক মূল্যের বিচার শেষ হয় না। আভিনযিক সাফল্যেরও রকমফের আছে। সূক্ষ্ম ও ব্যঞ্জনাধর্মী উপস্থাপনা-কৌশলে রবীন্দ্রনাট্য মঞ্চস্থ হলে বিদগ্ধ জনের মনোহরণ করতে পারে, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল কিংবা ক্ষীরোদপ্রসাদের নরনারায়ণের জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্যের সঙ্গে কি তার তুলনা চলে? রবীন্দ্রনাথ নাটককে উচ্চ সাহিত্যকর্মে উন্নত করেছেন; বাংলা নাটকে তিনি বিচিত্র ধারাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন এবং নবীন য়ুরোপীয় প্রচেষ্টার সঙ্গে বাংলা নাটকের সামীপ্য বিধান করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা মঞ্চানুগ নাটকের তুলনামূলক দুর্বলতার জন্যই যে শুধু সেদিকে আকর্ষণ বোধ করেন নি তা নয়, সেক্‌সপীরিয় নাট্যধারানুমোদিত প্রবৃত্তিসংঘর্ষ, ঘটনাপ্রাধান্য প্রভৃতির সঙ্গে তিনি মানসসালোক্য কোন কালেই অনুভব করেন নি। তাঁর মনের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য মঞ্চানুগ প্রচলিত নাটক রচনায় তাঁকে বাধা দিয়েছে। প্রথমত, তাঁর অতিমাত্রায় রোমান্টিক গীতিপ্রবণতা; এবং দ্বিতীয়ত, তাত্ত্বিকতার অতিরেক।

কাব্যনাট্য ॥ অপরিণত কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি গীতিনাট্য ও কাব্যনাট্য রচনা করেন। "রুদ্রচণ্ড", "বাল্মীকি প্রতিভা", "প্রকৃতির প্রতিশোধ", "মায়ার খেলা" ১৮৮১ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়। বাল্মীকি প্রতিভায় দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতের সম্মিলন চেষ্টা লক্ষণীয়। প্রকৃতির প্রতিশোধ তত্ত্বপ্রধান রচনা। প্রথম বয়স থেকেই তত্ত্ব ও গীতিপ্রবণতা তাঁর নাটককে স্বভাবভ্রষ্ট করেছে। এদের নাট্যগুণ একেবারে অকিঞ্চিৎকর। "চিত্রাঙ্গদা", "বিদায় অভিশাপ", "মালিনী", "কাহিনী" (এর অধিকাংশ রচনা) কাব্য ও নাট্য উভয়গুণেই সবিশেষ সমৃদ্ধ। কবিত্ব এবং নাট্যরীতির সহাবস্থান মানেই কাব্যনাট্য নয়। নাটকের মধ্যে অকারণে কাব্যোচিত উচ্ছ্বাস, বর্ণনার অতিরেক এবং কবিচিত্তের আত্মপ্রতিফলন তার সাহিত্যিক [illegible]

বিম্বিত করে। কাব্যত্ব এবং নাটকত্বের সংমিশ্রণে যে নবতর সাহিত্যিক রূপের জন্ম হয় তাকে কাব্যনাট্য নাম দেওয়া উচিত। কবিতার আবেগোচ্ছ্বাস এবং নাটকের দ্বন্দ্ব এখানে সমন্বিত হয়। সাধারণ নাটকের ন্যায় এখানে ঘটনাগত দ্বন্দ্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয় না। ভাবাবেগের দ্বন্দ্বই এদের প্রাণকেন্দ্র রচনা করে। ঘটনার উত্তালতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক বিকর্ষণ, এই নব আঙ্গিকে তাঁকে সাফল্য দিয়েছে। নাট্যরসের প্রধান আবেদন তার দ্বন্দ্ব। তার নির্যাস গ্রহণ করে ভাবাবেগের সঙ্গে তাকে সমন্বিত করায় তিনি উৎসাহ বোধ করেছেন।৷ কাব্য হিসেবে বিদায় অভিশাপ কিংবা চিত্রাঙ্গদার মূল্য সামান্য নয়। তবে কাব্যনাট্যের আঙ্গিক-সাফল্য মালিনী এবং কাহিনীতে শীর্ষে উঠেছে।

প্রথানুগ ধারার অনুবর্তন॥ কবি ১৮৮৯ সালে "রাজা ও রাণী," এবং ১৮৯০ সালে "বিসর্জন" নামে দুটি নাটক লিখলেন। এদের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ ঘটনাবহুল, মানবরসপুষ্ট এবং অনেকটা মঞ্চানুগ নাট্যরচনার চেষ্টা আছে। মানবরসপুষ্ট হলেও তিনি তাত্ত্বিকতা মুক্ত হতে পারেন নি। রাজা ও রাণীতে প্রেম ও কর্তব্য-বোধের দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে কাহিনীটি আবর্তিত। ঘটনার প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে গিয়ে নাট্যকার মেলোড্রামাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। উপকাহিনীর অতিবিস্তারে শেষাংশে মূল কাহিনী আচ্ছন্ন হয়েছে। মৃত্যুজনিত ট্রাজেডি সৃষ্টির চেষ্টা সমাপ্তিকে রসচ্যুত করেছে। এর উপরে আছে "লিরিকের বড় বাড়াবাড়ি।" রাজা ও রাণীর অনেক ত্রুটিই বিসর্জনে সংশোধিত হয়েছে। গীতোচ্ছ্বাসের আধিক্য অবশ্য কমে নি, কিন্তু পার্শ্বকাহিনী আর নাটককে কেন্দ্রচ্যুত করে নি। রঘুপতি ও গোবিন্দমাণিক্যকে কেন্দ্র করে রাজশক্তি ও পুরোহিত-শক্তির দ্বন্দ্ব বিসর্জনকে বস্তুভিত্তি দিয়েছে। অবশ্য এখানেও প্রেম এবং কুসংস্কারাবদ্ধ ধর্মাচরণের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্বই প্রধান হয়ে উঠেছে। রঘুপতি ও জয়সিংহের চরিত্র সুঅঙ্কিত। জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব, আত্মঅবক্ষয় এবং তারই পরিণতিতে আত্মহনন ট্র্যাজিক তীব্রতা নিয়ে এসেছে। কিন্তু পরিণতিতে য়ুরোপীয় নাট্যকল্পনার ট্র্যাজেডিকে জয়ী হতে দেন নি রবীন্দ্রনাথ। তিনি রঘুপতির শক্তির মত্ততা ঘুচিয়ে বেদনার মধ্য দিয়ে প্রেমের ও কল্যাণের রাজ্যে উপনীত করে নাটক সমাপ্ত করেছেন। প্রতাপাদিত্যের কাহিনী নিয়ে রচিত কাল্পনিক নাটক "প্রায়শ্চিত্ত" (১৯০৯) জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগে চিত্তজয়ের চর্চা করেছে। নাট্যরচনা হিসাবে এটির দুর্বলতা অনস্বীকার্য।

"নটীর পূজা"য় (১৯২৬) নৃত্যগীতের বাহুল্য থাকলেও ঘটনাগত তীব্রতা আছে; আদর্শবাদের গভীর প্রলেপ সত্ত্বেও চরিত্রচিত্রণের নিপুণতা এখানে প্রশংসনীয়। "তপতী" (১৯২৯) রাজা ও রাণীর পরিবর্তিত সংস্করণ হলেও নূতন নাটক হয়ে উঠেছে। তত্ত্বের প্রাধান্য এসেছে, বিষয়বস্তু একাগ্র হয়েছে, কিন্তু নাট্যগুণে পরিণতি এসেছে এমন কথা বলা চলে না। "পরিত্রাণ" (১৯২৯) প্রায়শ্চিত্তের রূপান্তর। ১৯৩৩ সালে রচিত "বাঁশরী" নাট্যগুণ সমৃদ্ধ না হলেও সংলাপের তীক্ষ্ণতা ও বৈদগ্ধ্য এবং সমস্যার আধুনিকতার জন্য উল্লেখযোগ্য।

কৌতুক নাট্য ॥ বাংলা প্রহসনের ধারায় রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাট্যগুলিকে ফেলা চলে না। এদের আস্বাদ ভিন্ন, রচয়িতার মনোভাবেও রয়েছে মূলগত পার্থক্য। সামাজিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতে এ নাটকগুলি রচিত হয় নি। ব্যঙ্গদৃষ্টিতে ধৃত সমকালীন সমাজজীবনের বিচ্ছিন্ন চিত্রসমষ্টি এখানে অঙ্কিত হয় নি। সমাজসংস্কারের মনোবৃত্তি এর মধ্যে নেই। কবির হাস্য স্মিত, ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও আক্রমণোদ্যত মনোভঙ্গি এদের মধ্যে প্রকাশিত নয়। ব্যক্তিগত চরিত্রের বিচিত্র দুর্বলতা এবং ঘটনা অপেক্ষা ভাষার ঈষৎ বক্রতা হাস্যরসের কারণ হয়েছে। সে হাস্যে বুদ্ধির খেলা না থাকলেও মননশীলতার স্পর্শ আছে। তবে ঘটনার অভাব ও শিথিল গ্রন্থন, সংলাপের দৈর্ঘ্য ও অতিরেক এই রচনাগুলির নাট্যগুণের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। "গোড়ায় গলদ" (১৮৯২)-য়ের মার্জিতরূপ "শেষরক্ষা"য় (১৯২৮) উপরোক্ত ত্রুটিগুলি সব থাকলেও পূর্ণাঙ্গ রঙ্গনাট্যগুলির মধ্যে সার্থকতম রচনা। "বৈকুণ্ঠের খাতা" (১৮৯৭) এবং "চিরকুমার সভা"ও (১৯২৬) পূর্ণাঙ্গ রঙ্গনাট্য। রঙ্গাত্মক একাঙ্কিকা সঙ্কলন "হাস্য কৌতুক" (১৯০৭) এবং "ব্যঙ্গ কৌতুকে" (১৯০৭) নাট্যাঙ্গিকের দিক থেকে দেশী বিদেশী বিচিত্র রূপরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে।

রূপক ও সঙ্কেত নাট্য ॥ রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভেই একটি অভিনব নাট্যরীতির প্রবর্তন করলেন বাংলা সাহিত্যে। "শারদোৎসব" (১৯০৮), "রাজা", (১৯১০) [এর অভিনয়যোগ্য পরিবর্তিত রূপ "অরূপরতন" প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে], "অচলায়তন" (১৯১২) [এর অভিনয়যোগ্য পরিবর্তিত রূপ "গুরু"র প্রকাশ কাল ১৯১৮], "ডাকঘর" (১৯১২), "ফাল্গুনী" (১৯১৬), "মুক্তধারা" (১৯২৫), "রক্তকরবী" (১৯২৬),
[illegible] (১৯৩২) "তাসের দেশ" (১৯৩৩) প্রকাশ [illegible]

মঞ্চানুগ নাটক, প্রহসন, গীতিনাট্য কাব্যনাট্য প্রভৃতি থেকে একেবারে স্বতন্ত্র বস্তুরূপে দেখা দিল। এরা নূতন নাম পেল রূপক-সঙ্কেতনাট্য। রূপক ও সঙ্কেতনাট্যের পার্থক্য এবং রবীন্দ্রনাথের কোন নাটকটি রূপক এবং কোনটি সঙ্কেত, কোনটি আবার মিশ্রসঙ্কেত তাই নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। এই নাট্যরীতি মেতারলিঙ্ক, হপ্তম্যান, ষ্ট্রিণ্ডবার্গ প্রমুখ নাট্যকারদের দ্বারা য়ুরোপখণ্ডে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এরা রবীন্দ্রনাথের সমকালীন ব্যক্তি, তবে এঁদের রূপক-সঙ্কেতধর্মী নাটকগুলি রবীন্দ্রনাথের ঐ জাতীয় নাটকের পূর্বেই রচিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ ঐসব নাটক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। অবশ্য রহস্যবিজড়িত সঙ্কেত-রসের প্রতি তাঁর আকর্ষণ অনেকটা স্বভাবগত। তাঁর কবিতায় এই রসের অল্পাধিক আয়োজন পূর্ব থেকেই দেখা যাচ্ছিল। নাটকে এই রস পূর্ণমূর্তিতে আবির্ভূত হল।

রাজা এবং ডাকঘর নাটক দু'টিতে রহস্যজড়িত অস্পষ্টতারস সর্বাধিক ঘনীভূত। এই দুই নাটকে জগতাতীত অধ্যাত্ম উপলব্ধি নাট্যরূপ লাভ করেছে। ঘটনা এখানে সামান্য হতে বাধ্য, বাহ্যরূপ এখানে অপর্যাপ্ত হবেই। সাঙ্কেতিত অর্থের ব্যঞ্জনা পাঠক-দর্শক চিত্তে রূপাতীত আকুতির অনির্বচনীয় রসাবেদনকে আমন্ত্রণ জানাবে। রাজা নাটকে রাণী সুদর্শনার রূপাকাঙ্খা থেকে রূপাতীতের চেতনায় উত্তরণের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। ডাকঘরে গৃহবন্দী রোগার্ত বালক অমলের প্রকৃতির উদার সৌন্দর্যে মুক্তির সুতীব্র কামনার মধ্য দিয়ে ব্যঞ্জিত হয়েছে মানবাত্মার চিরন্তন মুক্তির আকুতি।

শারদোৎসব, ফাল্গুনী প্রভৃতি নাটকে প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্ক-রহস্য নাট্যবিষয়ে বদ্ধ। শরৎ কালের আহ্বান মুক্ত প্রাণের লীলায়, কাজ ভুলানো নিরুদ্দেশ যাত্রার খেয়াল খুশির আনন্দে। কিন্তু এরই গভীরে আছে মহত্তর কর্তব্য ও দায়িত্বের যোগ। মানুষ এই আনন্দ-আমন্ত্রণে যোগ দিয়েই বিশ্বপ্রকৃতির দু'হাত ভরা সৌন্দর্যের ঋণ শোধ করছে এই তত্ত্ববোধ বহু সঙ্গীতসহযোগে শারদোৎসবের ছুটির আনন্দ জমিয়ে তুলেছে। ফাল্গুনীর আঙ্গিকে পাত্রপাত্রীর নাম ছাড়াই সংলাপের মালা সাজানো হয়েছে। যুবক যাত্রীদের ব্যক্তিত্বকে চিহ্নিত না করে সাধারণ ভাবে যৌবনকেই ব্যঞ্জিত করতে চেয়েছেন। যৌবনের মৃত্যু নেই, বিরোধ নেই বার্ধক্যের সঙ্গে এঁদের লীলায়ই সত্যের সন্ধান মেলে—এই তাত্ত্বিক উপলব্ধি একটি কাহিনীহীন এবং ব্যক্তি-চরিত্রের সম্পর্কহীন পথচলার সংলাপের মালায় ধরে রাখা হয়েছে।

(মুক্তধারা, রক্তকরবী, অচলায়তন, তাসের দেশ, কালের যাত্রায় আধুনিক

যুগসমস্যাকে নাট্যভাত করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ মানুষের মুক্তিমন্ত্রের সাধক। এই মুক্তি প্রকৃতির সৌন্দর্যলোকে, লীলাময়ের আনন্দের মধ্যে। কিন্তু মানব-সমাজ এই মুক্তির পথে নানা কৃত্রিম- বাধা সৃষ্টি করে তোলে। মুক্তধারা নাটকে যন্ত্ররাজ বিভূতির সৃষ্ট যন্ত্র প্রকৃতির সদামুক্ত প্রাণ-নির্ঝরকে বেঁধেছে। যন্ত্রকে ভিত্তি করে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ মানবপ্রাণকে একালে লাঞ্ছিত করছে দিকে দিকে—এ নাটকে তারই অবসানকে আমন্ত্রিত করেছেন কবি। এ নাটকের বৈশিষ্ট্য এখানে যে কাহিনী ও চরিত্রগুলির সহজ মানবিক রসের কিছুমাত্র হানি না ঘটিয়ে আধুনিক সভ্যতার সামগ্রিক সঙ্কটকে সাঙ্কেতিত করেছে। রক্তকরবীতে কিন্তু মানবরস সর্বত্র অব্যাহত থাকে নি। রূপক ও সাঙ্কেতিকতার সাহায্য ছাড়া বহুস্থানের সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় না। এই নাটকে যন্ত্রযুগের মানবসভ্যতার প্রভূত শক্তি এবং চিত্তদীর্ণ সঙ্কট হাহাকার করে উঠেছে। প্রাণের ও সৌন্দর্যের কাছে যন্ত্রের নতিস্বীকারই এই নাটকের তথা রবীন্দ্র সমাজভাষ্যের ভবিষ্যৎ ফলশ্রুতি। অচলায়তনে মধ্যযুগীয় সংস্কার ও নিয়মের অত্যাচার প্রাণের মুক্তিতে বাধা দিয়েছে। তাসের দেশ নৃত্যগীত প্রধান হলেও রূপকার্থের স্পষ্টতার জন্য এ নাটক বর্তমান শ্রেণীতেই স্থাপনযোগ্য। বিদেশী রাজপুত্র এখানে অন্ধ নিয়মে জড় ও প্রাণহীন ভূখণ্ডে প্রাণবন্যাকে আমন্ত্রণ করে এনেছে।

নৃত্যনাট্য॥ রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে (১৯৩৬-৩৯) চিত্রাঙ্গদা, শ্যামা, চণ্ডালিকা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য লিখেছিলেন। তবে নৃত্য-নিরপেক্ষভাবে গীতি-নাট্য হিসেবেই এদের পূর্ণাস্বাদ সম্ভব। গানের সূত্রে নাট্যদ্বন্দ্বকে যতটা সম্ভব ধরে রেখেছেন কবি, সম্ভবত নৃত্যসংযোগে তাকে দৃশ্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল।

উপন্যাস

রবীন্দ্রনাথ ছোট বড় দশ-এগার খানা উপন্যাস লিখেছিলেন। বঙ্কিমপ্রবর্তিত ধারায় তিনি উপন্যাস রচনার জন্য অগ্রসর হন। কিন্তু কবিপ্রতিভাগত মূল পার্থক্যের জন্য তিনি এ ধারায় বিশেষ স্বচ্ছন্দ হতে পারেন নি। তিনি রোমান্স রচনায় সেরূপ কিছু বিশিষ্টতা প্রদর্শন করতে পারেন নি। অবশ্য সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাসে তাঁর সাফল্য অনেক উচ্চস্তরের। কিন্তু যে উপন্যাস ধারার জন্য রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক এবং শৈল্পিক মর্যাদা যুগপৎ দাবি করতে পারেন তার পথ কবি আবিষ্কার করেছিলেন উত্তর জীবনে।

ঐতিহাসিক রোমান্স॥ "বউঠাকুরাণীর হাট" (১৮৮৩) এবং "রাজর্ষি" (১৮৮৭) ঐতিহাসিক রোমান্স রূপেই বিবেচিত হতে পারে। অবশ্য প্রতাপাদিত্যের কাহিনীতেও যেমন, ত্রিপুরারাজ গোবিন্দমাণিক্যের কাহিনীতেও ঠিক তেমনি কল্পনা যতটা আছে, ইতিহাস ততটা নেই। কল্পনায়ও রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রোমান্সের বর্ণাঢ্যতা উচ্চতাল কোলাহলের চর্চা বড় করতে চান নি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন "ইতিহাসের বিচিত্র ও বর্ণবহুল শোভাযাত্রা রবীন্দ্রনাথের মনকে সেরূপ প্রবলভাবে আকর্ষণ করিতে পারে নাই। ঐতিহাসিক যুদ্ধবিগ্রহ ও ভাগ্য পরিবর্তনের মধ্যে তিনি নিভৃত সাধনা ও অখণ্ড শান্তির নিবিড় আনন্দরসে মগ্ন হইয়াছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে ঐতিহাসিক রস নামক জটিল গভীর ও বর্ণবস্তু যে ঐকতানের কল্পনা করেছিলেন তাঁর প্রথম উপন্যাস দু'খানিতে তার সুর বাজে নি। চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রেও রাজর্ষির রঘুপতি ব্যতীত অন্যত্র জটিলতা বা গভীরতা সৃষ্টির চিহ্ন বড় নেই। এই দু'টি উপন্যাসে প্রস্তুতি-কালীন প্রচেষ্টার চিহ্নই অধিক।

সামাজিক উপন্যাস॥ "চোখের বালি" (১৯০৩), "নৌকাডুবি" (১৯০৬) এবং "গোরা" (১৯১০) রবীন্দ্রনাথের এই তিনখানি উপন্যাসকে প্রচলিত ধারার সামাজিক উপন্যাস বলা চলে। এদের বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ-কৃষ্ণকান্তের উইলের ঐতিহাসিক উত্তরসূরী বলতে বাধা নেই। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি, মানসপ্রবণতা ও রূপায়ণ বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য এদের মধ্যে স্পষ্টই অনুভূত হবে। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যেও ঘটনার আকস্মিকতায় ও প্রবলতায় বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সকে প্রশ্রয় না দিয়ে পারেন নি। সংঘাতের প্রতি আকর্ষণের অভাব এই পথ থেকে রবীন্দ্রনাথকে ভ্রষ্ট করেছে। তাঁর সামাজিক উপন্যাসে রোমান্সরস একান্তভাবেই চিত্তলোকে পরিব্যাপ্ত। দ্বিতীয়ত, চরিত্রচিত্রণে বিশ্লেষণরীতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের আকর্ষণ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণরীতির প্রবর্তন করে আধুনিকতার পূর্বসূরী হলেন। তৃতীয়ত, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নীতিঘটিত প্রশ্নে রক্ষণশীলতার প্রতি যে ঝোঁক ছিল রবীন্দ্রনাথে তা নেই, উপরন্তু মানবহৃদয়ের আকুতিকে (বৈধতা নিরপেক্ষ ভাবে) মর্যাদা দিয়ে তিনি ভবিষ্যতের বিদ্রোহী মনোভাবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

চোখের বালি উপন্যাসে মহেন্দ্র-বিনোদিনী-আশা-বিহারী এই চারজনে মিলে তাদের চারিদিকে প্রবল ঘূর্ণিবায়ুর সৃষ্টি করেছে। ঘটনাবৃত্তে প্রবলতা বড়

সঞ্চারিত হয় নি। মনোলোকে ঝড় উঠেছে। এদের চারটি চরিত্র সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের মধ্যে রূপলাভ করেছে। উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ মহেন্দ্র-বিনোদিনীর আকর্ষণ-বিকর্ষণলীলা। বিনোদিনীর চরিত্রসৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ যে তীক্ষ্ণ বাস্তববোধ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন বাংলা উপন্যাসকে তা দ্রুত বিংশ শতকীয় আধুনিকতার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিল।

নৌকাডুবি যেন চোখের বালির লেখকের ক্লান্তি অপনোদন। সে তীব্র মনোবিক্ষোভ, জটিল চরিত্রায়ন, সমাজনীতির প্রতি ভ্রূক্ষেপহীনতার স্থানে আকস্মিক ঘটনাভিত্তিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। হেমনলিনীর চরিত্রচিত্রণের সাফল্যে এবং মাঝে মাঝে বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথের হাতের স্পর্শ অনুভব করা গেলেও উপন্যাস হিসেবে এ-গ্রন্থের স্থান খুব উচ্চে নয়।

গোরা রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যিক উপন্যাস। উনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে আরম্ভ করে বিংশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত বাঙালীর জীবনে যে-সব ভাব ও কর্মতরঙ্গ দেখা দিয়েছিল তা এই উপন্যাসের পটভূমি রচনা করেছে। গোঁড়া হিন্দু পুনরুত্থানবাদ, ব্রাহ্মধর্মের আন্দোলন, নব্য স্বাদেশিকতা এই উপন্যাসে প্রাণচাঞ্চল্যের ব্যাপকতা এনেছে। উপন্যাসটির মধ্যে গোরা, বিনয়, পরেশবাবু, হারাণ, সুচরিতা, ললিতা, আনন্দময়ী সকলেরই প্রধান আগ্রহ মতবাদ প্রতিষ্ঠার দিকে ধাবিত হয়েছে। একটা সুতীব্র বিতর্কের ঘূর্নিজাল সমগ্র উপন্যাসটিকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিতর্কের প্রাধান্যের ফলে কোন কোন চরিত্রের পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে বিতর্কের আধিক্যে পুরো উপন্যাসটি আলোচনার আসরে পরিণত হয় নি। মানবচিত্তের আবেগ, কামনা-বাসনার তরঙ্গোচ্ছ্বাস মতবাদের সঙ্গে অধিকাংশ স্থলেই সম্পর্কিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তাই সর্বত্র ব্যক্তিত্ব আবৃত নয়।

উপন্যাসশিল্পে নবধারার সূত্রপাত॥ গোরার পরে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নূতন পথ ধরল। বাংলা উপন্যাসসাহিত্যে এ ধারা ঐতিহ্যরহিত তো বটেই, অত্যন্ত ব্যক্তিগত লক্ষণাক্রান্ত বলে পরবর্তী ঔপন্যাসিকেরা এই ধারায় বিশেষ অগ্রসরও হন নি। মূলত রোমান্টিক কবিহৃদয়ের অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঘটনাপ্রধান বিশ্লেষণবহুল উপন্যাসে যেন আপনাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করতে পারেন নি। তিনি গোরার পরে উপন্যাসের এমন একটি শিল্পরীতি আবিষ্কার করলেন যার মধ্যে কল্পনার অবকাশ সুপ্রচুর, ঘটনার বন্ধন শিথিল; বর্ণনায় ও

ভাবোচ্ছ্বাসের অতিরেকে, তত্ত্বের প্রাধান্যে প্রচলিত উপন্যাস থেকে স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য সূচিত হয়েছে। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই পার্থক্যের সূত্রটিকে স্পষ্ট ব্যাখ্যা করেছেন, "ইহাদের অসম্পূর্ণতা, ইহাদের খণ্ডিত সংকীর্ণতা, ইহাদের শিথিলগ্রথিত আকস্মিকতা ও রিক্ততার মধ্যে অপ্রত্যাশিত প্রাচুর্য, ইহাদের জীবনের গ্রন্থিবহুল জটিলতার মধ্যে দুই একটি রঙ্গিন ও সূক্ষ্ম সূত্রকে পৃথক-করণের চেষ্টা খুব তীব্রভাবেই আমাদের চোখে পড়ে। ইহাদের মধ্যে জীবনের যে অংশটুকু আলোচিত হইয়াছে, তাহা আমরা উপলব্ধি করি ধারাবাহিকতার অবিচ্ছিন্ন আলোকে নহে, সংক্ষিপ্ত সাংকেতিকতার চকিত বিদ্যুদ্দীপ্তিতে।... কবি ঔপন্যাসিকের হাত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছেন, বিরল-সন্নিবেশ তথ্যের ফাঁকে ফাঁকে কাব্যের বাঁশি সাংকেতিকতার সুরে বাজিয়া উঠিয়াছে, স্থূল ঘটনার যবনিকা সরাইয়া রঙ্গমঞ্চে কবিকল্পনা অধিষ্ঠিত হইয়াছে। Meredith-এর উপন্যাসের মত রবীন্দ্রনাথের শেষ যুগের উপন্যাস একপ্রকার তীক্ষ্ণ-কঠিন বুদ্ধির চমকপ্রদ ঔজ্জ্বল্য (intellectual brilliance), দ্রুত অবসরহীন সংক্ষিপ্ততার মধ্যে গভীর অর্থগৌরবের দ্যোতনা (epigram) আমাদিগকে পাতায় পাতায় চমৎকৃত ও অভিভূত করে।"

"ঘরে বাইরে" (১৯১৬), "চতুরঙ্গ" (১৯১৬), "যোগাযোগ" (১৯২৩), "শেষের কবিতা" (১৯২৯), "দুইবোন" (১৯৩৩), "মালঞ্চ" (১৯৩৪), "চার অধ্যায়" (১৯৩৪) উপন্যাসগুলি এই পর্বের অন্তর্গত। ঘরে বাইরে এবং চার অধ্যায় উপন্যাস দু'টিতে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গ প্রাধান্য পেয়েছে। শেষের কবিতায় প্রেমানুভূতির তত্ত্ব উপস্থাপনই হয়ত কবির লক্ষ্য ছিল, কিন্তু অমিত ও লাবণ্যের রোমান্টিক প্রণয়-সম্পর্ক উপন্যাসটিকে আদ্যন্ত সুরভিত করে রেখেছে। অমিত রায়ের চরিত্র এই উপন্যাসের সম্পদ বিশেষ। যোগাযোগ উপন্যাসে সংস্কার-সংস্কৃতি-রুচির দ্বন্দ্ব তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহের চেয়েও যে নারীর ব্যক্তিত্ব বড় কুমুর চরিত্রকে অবলম্বন করে এই প্রত্যয়ে কবি পৌঁছতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উপন্যাসের সমাপ্তি অন্যতর তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের দিকে ইঙ্গিত করেছে। দুই বোন এবং মালঞ্চ দু'টিই খুব ক্ষুদ্রাকৃতি উপন্যাস। উপন্যাস দু'টিতে জীবনচিত্রণ অপেক্ষাও একটি প্রেমতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার প্রতিই যেন কবি বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছেন।

ছোট গল্প

তিন পর্ব ॥ বাংলা ছোট গল্পের রূপসিদ্ধি রবীন্দ্রনাথে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি তিন খণ্ড "গল্পগুচ্ছে" এবং "তিন সঙ্গী"তে প্রকাশিত হয়েছে। গল্পগুচ্ছ প্রকাশের বহুপূর্বেই "হিতবাদী", "সাধনা", "সবুজপত্র" প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর গল্পগুলি দেখা দিয়েছিল। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের প্রথম পর্ব। কঙ্কাল, অতিথি, ত্যাগ, একরাত্রি, কাবুলিওয়ালা, ছুটি, শাস্তি, সমাপ্তি, মেঘ ও রৌদ্র, বিচারক, নিশীথে, মানভঞ্জন ক্ষুধিত পাষাণ, নষ্টনীড, পোস্টমাস্টার প্রভৃতি সেরা গল্পগুলি এই পর্বের লেখা। ১৯১৪ সালে "সবুজপত্র"কে অবলম্বন করে আরম্ভ হল তাঁর ছোট গল্পের দ্বিতীয় পর্বের। হালদারগোষ্ঠী, হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র, পয়লা নম্বর প্রভৃতি গল্প এই পর্বের অন্তর্গত। ১৯৪০ সালে প্রকাশিত "তিনসঙ্গী" তৃতীয় পর্বের চিহ্নবাহী।

প্রথম পর্বের গল্পগুলির বেশির ভাগই পদ্মাতীরে বসে লেখা। বাংলা গ্রাম-জীবনের নৈকট্য, বোটে পদ্মাবাস এই গল্পগুলিকে এমন সরস প্রাণরসে পূর্ণ করেছে যার তুলনা মেলা ভার। মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে একটি নিগূঢ় সম্পর্ক কবি আবিষ্কার করেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের ছোট ছোট হাসি-কান্না সুখদুঃখ এই গল্পের মধ্যে রূপলাভ করেছে। বাংলা দেশ—তার মাটি ও মানুষ কবি-চিত্তের প্রীতির রসে জড়িত হয়ে এই গল্পগুলির জন্ম দিয়েছে। অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় "এদের মধ্যে বস্তু-বৈচিত্র্য এবং চরিত্র-বৈশিষ্ট্য যাই থাক—সামগ্রিকভাবে যেন প্রকৃতির একটি নিবিড় ছায়া—পদ্মার ওপর বিকীর্ণ একটি অবারিত আকাশের আলো—জলের কল্লোল আর জীবনসম্ভোগের আনন্দ মিশে আছে।"

দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলিতে নাগরিক বাচনভঙ্গি এবং ভাবকল্পনার বিশিষ্টতা প্রকাশিত। নাগরিক চাতুর্য এবং বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের নৈপুণ্যে, উইটের দীপ্তিতে, ক্ষুরধার মন্তব্যে এবং গূঢ় তির্যকতায় এ গল্পগুলি হয়ে উঠেছে চমকপ্রদ। এই গল্পগুলির জীবনবোধে উচ্চকণ্ঠ প্রচারধর্মের স্পর্শ লেগেছে। ব্যক্তিত্ব বনাম পরিবার-মর্যাদা ও সামাজিকতা তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। মানুষের নূতন মূল্যবোধের দিকে কবির দৃষ্টি পড়েছে।

তৃতীয় পর্বের গল্পে বাচনভঙ্গির তির্যকতা এবং ভাবচেতনার আধুনিকতা তথা তত্ত্বপ্রাধান্য লক্ষণীয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তিনসঙ্গীর তিনটি গল্পের সুন্দর পরিচয় দিয়েছেন, "প্রথমগল্প রবিবার একটি মনোরম প্রেমকাহিনী.

দ্বিতীয়টি আরণ্যক জৈবতার মতো অন্ধ আকর্ষণ থেকে অচিরার পুনরুদ্বোধন এবং নবীনমাধবের অনিচ্ছালব্ধ মুক্তি (শেষ কথা) এবং তৃতীয়টিতে সোহিনী নামে এক জ্যোতির্ময়ীর প্রলোভনের অগ্নিচক্র রচনা করে নন্দকিশোরের বিজ্ঞানযজ্ঞের ঋত্বিককে বিফল সন্ধান (ল্যাবরেটরি)।”

বিষয় বৈচিত্র্য ॥ রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পে পরিবার-জীবনের চিত্র স্থান পেয়েছে, সমাজসমস্যার কথাও এসেছে। তবে সাধারণ বাঙালীর পরিবার-জীবনের সঙ্গে এতবড় ঘনিষ্ঠ পরিচয় তাঁর ছিল না যাতে তার বাস্তব রসপুষ্ট কোন প্রতিফলন সেখানে প্রত্যাশা করা যেতে পারে। দেনাপাওনা, দান-প্রতিদান প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথ তাই সে পরিমাণ স্বচ্ছন্দ নন, যতটা মানসমুক্তি তিনি প্রকৃতির সঙ্গে সহযোগের মধ্য দিয়ে লাভ করেন। সংসার-বন্ধনে যে মানুষ নিঃশেষিত নয় তারাই তাঁকে বেশি আকর্ষণ করে। রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা, স্বর্ণমৃগ তাই বাস্তব জীবনসমস্যার মধ্যেও সামান্য উপকরণে গভীর আলোড়ন এনেছে। সমাজসমস্যা অবশ্য অগ্নিদাহ তীব্রতা নিয়ে নষ্টনীড় গল্পে দেখা দিয়েছে। অসামাজিক প্রেমের এই গল্পে কবি আধুনিকতম বিদ্রোহী মনোভাবকে রূপায়িত করেছেন অথচ কোথাও পরিবারজীবনের ঘটনায় কিছুমাত্র নাটকীয়তা সঞ্চারিত করেন নি, কোথাও অস্বাভাবিকতাকে প্রশ্রয় দেন নি। সবুজপত্র-যুগের গল্পগুলিতেও অবশ্য ব্যক্তিসত্তাকে সমাজবন্ধন থেকে মুক্ত করার কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ, তবে একটু যেন প্রচারের সুর লেগে এদের শিল্প-সৌন্দর্যের কিঞ্চিৎ হানি ঘটেছে।

যে সব গল্পে কবি পারিবারিক হৃদয়-সম্বন্ধকে গৃহের সীমা থেকে মুক্তি দিয়ে নিখিলের বিস্তৃতিতে স্থাপিত করেছেন সেখানে শিল্প-সাফল্যের শীর্ষে উঠেছেন। কাবুলিওয়ালায় পিতৃহৃদয়ের বেদনা ঘরের বন্ধনকে ছাপিয়ে উঠেছে। বহু ক্ষেত্রে প্রকৃতিকে কবি ব্যবহার করেছেন এই বিস্তৃতি আনবার জন্য। পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি প্রভৃতি গল্পের নাম এই প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।

প্রকৃতি ও মানবজীবনের সম্পর্ক প্রকাশ পেয়েছে যে গল্পগুলিতে সেগুলির উৎকর্ষ প্রশ্নের অতীত। ছুটির ফটিকের মুক্তির বাসনা অতিথির তারাপদে আরও গভীর হয়ে কবির নিসর্গ-চেতনার মূল ভিত্তিকেই যেন বিস্ময়কর চমৎ-কারিত্বে প্রকাশ করেছে। সুভা, একরাত্রি এই সুরের উল্লেখযোগ্য গল্প।

মণিহারা, ক্ষুধিত পাষাণ, নিশীথে, দালিয়া, দুরাশা প্রভৃতি গল্পে রোমান্সরস সৃষ্টিতে সাফল্য দেখিয়েছেন কবি। দালিয়া-দুরাশার ইতিহাসগন্ধী রোমান্স-রস মিলন-মাধুর্যে এবং আশাভঙ্গের হাহাকারে যে ভাবে প্রকাশিত কবির

ঐতিহাসিক রোমান্স জাতীয় উপন্যাস দু'টিতে তার চিহ্নমাত্র নেই। প্রথমোক্ত তিনটি গল্পে অতিপ্রাকৃত রস রোমান্সের উপকরণ যুগিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অতিপ্রাকৃতের সঙ্গে ভৌতিক ভাবের সম্পর্কমাত্র নেই। মানবচিত্তের স্বপ্নকল্পনা বা পাপবোধ কিংবা আত্যন্তিক দুর্বলতা এবং স্পর্শকাতরতা সত্য ও মায়ার বিভ্রম রচনা করে অতিপ্রাকৃত রস ঘনীভূত করে তুলেছে।

রবীন্দ্রনাথের গল্পে ঘটনার তীব্রতা নেই, বরং বহুক্ষেত্রে লিরিকের মেজাজ আছে। চমকটুকু প্রায়ই বাহির থেকে কাহিনীর পথে আসে নি, নাটকীয় আকস্মিকতার অনুসরণ করা হয় নি, বরং ধীরে ধীরে একটি উচ্ছ্বসিত সুর বিশ্ব-বেদনাকে যেন স্পর্শ করেছে।

প্রবন্ধ-সাহিত্য

বাংলা দেশের অন্যতম প্রধান প্রাবন্ধিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ করতে হয়। চিন্তার মৌলিক বিশিষ্টতায় এবং রচনা রীতি ও ভাষাভঙ্গির অত্যুচ্চ শিল্পগুণে তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্য দুর্লভ উৎকর্ষে ভূষিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ বিষয়বস্তুর বিচিত্রতায় সমৃদ্ধ। শিক্ষা, ধর্ম, রাজনীতি-সমাজনীতি-ইতিহাস, সাহিত্য-সমালোচনা প্রভৃতি নানা জাতের বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ যেমন তিনি লিখেছেন তেমনি ডায়েরী, পত্রাবলী, আত্মজীবনী ও নানা ধরনের আত্মগৌরবী প্রবন্ধও লিখেছেন।

সমালোচক রবীন্দ্রনাথ ॥ ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার মধ্যে নির্বাচিত অনেকগুলি প্রবন্ধ বিষয়ানুসারে "প্রাচীন সাহিত্য", "আধুনিক সাহিত্য", "সাহিত্য", "লোকসাহিত্য" নামে গ্রন্থবদ্ধ হল এই বছরে। "সাহিত্যের পথে" প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে, "সাহিত্যের স্বরূপ" নামক পুস্তিকাটি প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে। সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, সাহিত্যের স্বরূপ এই তিনটি গ্রন্থে সমালোচনার মূলনীতি ও কর্তব্য এবং সাহিত্যসৌন্দর্যের বিচিত্র দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থে ভারতের প্রাচীন কাব্যাদির সৌন্দর্য তাঁর আলোচনার বিষয় হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। লোকসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা যুগপৎ রসিক ও গবেষকের।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-পদ্ধতির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হল তাঁর উজ্জ্বল সৃজন-ধর্ম। তিনি Synthetic তো বটেনই, মাঝে মাঝে Creative-ও হয়ে ওঠেন।

সমালোচ্য কাব্যকে গ্রহণ করে তার স্বরূপ-সৌন্দর্যের ব্যাখ্যানে সীমাবদ্ধ না থেকে, আপনার ভাললাগা-মন্দলাগা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনার বর্ণে তাকে অনুরঞ্জিত করে নবতর সৃষ্টিলোকে তিনি উত্তীর্ণ হতে চান। প্রাচীন সাহিত্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত মেঘদূত এবং কাব্যের উপেক্ষিতা প্রবন্ধ দুটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ. মহাকবি কালিদাসের সৌন্দর্য-সম্ভোগের কাব্য মেঘদূত রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় চিরন্তন সৌন্দর্য-বিরহের বাণীমূর্তি হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্র-সমালোচনার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত সংজ্ঞাকেই ধ্রুববচন বলে মনে না করে কাব্যের অন্তর-সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করা।

মহাকালকে তিনি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক বলে মনে করেন। কালের বিচারে যে সাহিত্য উত্তীর্ণ তার বিচার করার চেষ্টা না করে পূজা করাই সমালোচকের কর্তব্য। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের চিরন্তনত্বে বিশ্বাসী। যে সাহিত্য সাময়িক দাবি মেটায়, সাহিত্য হিসেবে তার মূল্য অকিঞ্চিৎকর। সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাহীন। তাঁর মতে "আলস্যের সহস্র সঞ্চয়"ই হল সাহিত্য—অপ্রয়োজনের আনন্দ-সৃষ্টি তার একমাত্র লক্ষ্য। সাহিত্য যে কোনদিন স্কুল মাস্টারী বা নীতি-শিক্ষার দায়িত্ব নেয় নি, রবীন্দ্রনাথ একথা স্পষ্ট করে বলেছেন। জীববৃত্তির উর্ধ্বে যে মানবসত্তা, কবির মতে সাহিত্যের আবেদন সেখানেই। বিশ্বব্যাপী অনাদি অনন্ত ও অশ্রুত এক সঙ্গীত স্রোতে যাবতীয় পার্থিব ঘটনা ও রূপজগৎ ভাসমান। তারা 'ক্ষণিকে প্রকাশ' আবার 'ক্ষণিকে মিলায়'। কবি কানে শুনবেন রূপজগতের অন্তরালের সেই অশ্রুত সঙ্গীত ধারা, তাকেই ফুটিয়ে তুলবেন আপনার ভাষায় ও ছন্দে। ঐশী চেতনার সঙ্গে যুক্ত এই বিশ্বানুভূতিই রবীন্দ্র-সমালোচনার মৌল দর্শন। তাঁর সৌন্দর্য-দর্শনও এই বোধের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত।

কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ফলেই সাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি প্রায়ই গীতিকাব্যোচিত একটি সংজ্ঞায় পৌঁচেছেন। সাহিত্যের তাৎপর্য প্রভৃতি প্রবন্ধে তিনি কবিচিত্তের রঙ্, ভাললাগা-মন্দলাগা, আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাই মুখ্যত বলেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সহৃদয়তা ও সাহিত্যবোধের গভীরতা Absolute Vision বা নিরপেক্ষ-নিরাসক্ত দৃষ্টির সৃষ্টি-সৌন্দর্যকে অস্বীকার করতে পারে নি। তাই সাহিত্যের পথে গ্রন্থের কোন কোন প্রবন্ধে "নিরাসক্ত মনই শ্রেষ্ঠ মন" বলে স্বীকারও করেছেন।

মহৎ সাহিত্যে সাহিত্যিকের জীবন-জিজ্ঞাসার প্রকাশ খুঁজেছেন রবীন্দ্রনাথ। উচ্চতর সাহিত্য শুধুমাত্র ভাব-ভাষার নিপুণ বন্ধনজাত সৌন্দর্য-সৃষ্টিই নয়, আরও

গভীরে প্রবেশ করে জীবনের সত্যকে সে আবিষ্কার করে, ব্যাখ্যা করে, প্রকাশ করে কিন্তু প্রচার করে না।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার পদ্ধতি সর্বত্র অনুসরণযোগ্য নয়। কিন্তু সুতীব্র সাহিত্যিক স্পর্শকাতরতা, সৌন্দর্য-উপলব্ধির অন্তরতম প্রদেশে সহজে অবতরণের আশ্চর্য ক্ষমতা, সহজাত রসবোধ এবং বহু অধ্যয়নজাত অনুশীলনের সম্মিলনে তিনি কাব্য বা কবির আলোচনায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নির্ভুল এবং গভীর।

বাংলা সমালোচনায় তাই রবীন্দ্রনাথই প্রধানতম পুরুষ।

বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ॥ সাহিত্য সমালোচনা ভিন্ন অন্য জাতীয় বিষয়-গৌরবী প্রবন্ধেও তাঁর সাফল্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণযোগ্য। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ শাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে তিনি "শব্দতত্ত্ব" (১৯০৯) "ছন্দ" (১৯৩৬), "বাংলাভাষা পরিচয়" (১৯৩৮) প্রভৃতি গ্রন্থ লিখেছেন। আজীবন ভাষা ও ছন্দ নিয়েই তিনি কারবার করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা ভাষার সরসতায় এখানে গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। "ধর্ম" (১৯০৯), "শান্তিনিকেতন" (১৯০৯-১৬), "মানুষের ধর্ম" (১৯৩৩) প্রভৃতি গ্রন্থে কবির ধর্মজিজ্ঞাসা স্থান পেয়েছে। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় ব্রাহ্মধর্মান্দোলনের একজন প্রধান মুখপাত্র হিসেবে তিনি বঙ্কিম প্রমুখ হিন্দুধর্মের মুখ্য প্রবক্তাদের সঙ্গে ধর্ম-বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে ধর্ম নিয়ে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে তিনি চান নি। সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর ঊর্ধ্বে এক ধর্মচেতনায় তিনি নিজে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন, বিশ্বকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। তিনি একে বলেছেন মানুষের ধর্ম। ঔপনিষদিক দর্শনের সঙ্গে এর যেমন গভীর সম্পর্ক তেমনি কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধির মধ্যে এই সত্য ধৃত। কবি আপন ধর্ম ও দার্শনিক প্রত্যয়কে যুক্তি-তর্ক-তথ্যের পথ দিয়ে গ্রহণ করেন নি, প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও তিনি ব্যক্তিগত উপলব্ধির সুরই লাগিয়েছেন। সম্ভবত পিতা দেবেন্দ্রনাথের ধর্মব্যাখ্যান পদ্ধতির দ্বারা কবির শান্তিনিকেতনের প্রবন্ধ-গুলির রচনারীতি অনেকটা প্রভাবিত।

সক্রিয় রাজনীতিতে কবি দু' একবার সামান্যত অংশ নিয়েছিলেন, কিন্তু ভারতের ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য এবং রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার নানা দিক তাঁর মনীষায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আমাদের ইতিহাস সামগ্রিক জীবনসাধনার নাম দিয়েছিল ধর্ম। ধর্মই এদেশের জীবনচর্চার কেন্দ্রে ছিল অধিষ্ঠিত, য়ুরোপের ন্যায় রাষ্ট্রনীতি নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমদিকে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা অনুযায়ী ইংরেজদের সম্পর্কে দ্বৈত মনোভাব পোষণ করতেন।

তিনি বড় ইংরেজ এবং ছোট ইংরেজ নামে তাদের অভিহিত করেছেন। তাঁর জাতীয়চেতনা বিশ্বমানবমৈত্রীর বিরোধিতা করে নি। পরিণত বয়সে কবি সাম্রাজ্যবাদীদের তীব্র ভর্ৎসনা করেছেন, সোভিয়েট দেশের সমাজতন্ত্রকে অভিনন্দন জানাতেও দ্বিধা করেন নি। শিক্ষার ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজপ্রচলিত ধারার পরিবর্তন চেয়েছিলেন। জীবনের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা এবং প্রকৃতির পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণে শিশুচিত্তের স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনা ছিল কবির শিক্ষাচেতনার মূল মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলি "আত্মশক্তি" (১৯০৫), "ভারতবর্ষ" (১৯০৬), "শিক্ষা" (১৯০৮), "রাজাপ্রজা" (১৯০৮), "স্বদেশ" (১৯০৮), "পরিচয়" (১৯১৬), "কালান্তর" (১৯৩৭), "সভ্যতার সঙ্কট" (১৯৪১) প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ বিষয়গৌরবী প্রবন্ধে যুক্তির ভাষাকে ততটা অনুসরণ করেন নি যতটা করেছেন আবেগের ভাষাকে। যুক্তি-তথ্য প্রভৃতির সমাবেশে সিদ্ধান্তকে অভ্রান্ত করে তোলেন নি তিনি। উক্তির চমৎকারিত্ব, উপমাদির প্রয়োগ ও চিত্ররচনার সৌন্দর্য ভাষাকে সুরভিত করে তুলেছে।

আত্মগৌরবী প্রবন্ধ॥ রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতি, চিঠিপত্র, ডায়েরীজাতীয় অনেক লিখেছিলেন ;—"য়ুরোপপ্রবাসীর পত্র" (১৮৮১), "য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরী" (১৮৯১-৯০), "জীবনস্মৃতি" (১৯১২), "জাপান যাত্রী" (১৯১৯), "জাভাযাত্রীর পত্র", "রাশিয়ার চিঠি" (১৯৩১), "পথের সঞ্চয়" (১৯৩৯), "ছেলেবেলা" (১৯৪০), "আত্মপরিচয়", "ছিন্নপত্র" এবং বহুখণ্ডে সঙ্কলিত "চিঠি-পত্র"।

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে কবির অনাবৃত ও অনলঙ্কৃত ব্যক্তিত্বের প্রকাশ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু ব্যক্তির সেই রস কবির পত্রে বড় পাওয়া যায় না; ব্যক্তিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর কবিমনের প্রতিফলনই সেখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। পত্রাবলীর মধ্যে সাহিত্যিক উৎকর্ষের দিক থেকে ছিন্নপত্র তুলনারহিত। কবির যৌবনে পদ্মাবাসকালে রচিত এই পত্রগুলিতে কাব্যলাঞ্ছিত গদ্যে (কবির নিজের ভাষায় "অনেকটা পৈট্রির মতো শুনতে হবে") কোঁথাও চমৎকার কল্পনা, কোথাও নিবিড়তম উপলব্ধি কোথাও শব্দবিন্যাসের চারুত্ব প্রকাশ পেয়েছে। য়ুরোপযাত্রীর ডায়েরীতে ভাব এবং ভাবনার মিলন ঘটেছে, প্রসঙ্গত য়ুরোপের সঙ্গে ভারতের জীবনচর্যা ও চিন্তার পার্থক্যের নানা কথা

এসে পড়েছে। জাভাযাত্রীর পত্রে সুদূর জাভায় প্রাচীন ভারতের অবশেষ দেখে কবির রোমান্টিক বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে।

জীবনস্মৃতি, আত্মপরিচয় এবং ছেলেবেলায় আত্মকথনের তিনটি ভিন্ন ভঙ্গি আস্বাদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে এসেছে। আত্মপরিচয়ে দার্শনিক উপলব্ধির আধিক্য। জীবনস্মৃতিতে প্রৌঢ় কবি প্রথম জীবনের স্মৃতিরোমন্থন করেছেন। এ-গ্রন্থের ভাষারীতি, চিত্ররচনাপদ্ধতি এক কথায় অনবদ্য। যে-জীবন অতীতের অথচ নিঃশেষে বিলুপ্ত নয় তারই মধুর আস্বাদ কবি পরিবেশন করেছেন। নিরাসক্তের কৌতুক এবং আসক্তের প্রাণের ঈষৎ আবেগের আলোছায়ার স্পর্শে রচনাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

"পঞ্চভূত" (১৮৯৭) "একটি অভিনব কলাকৌশলে প্রকাশিত রচনা।… পঞ্চভূত পঞ্চভূতের খেয়াল খুশীতে ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা; বিষয়ের কোন কিছু সুনির্দিষ্টতা নাই,—সাহিত্য, সৌন্দর্য, মনুষ্য-প্রকৃতি, বিজ্ঞান, প্রভৃতি গুরুলঘু বহু বিষয়ে আলাপ আলোচনা রহিয়াছে।" (—শশিভূষণ দাশগুপ্ত)। কিন্তু বিষয়বস্তু অপেক্ষা সৌন্দর্য সৃষ্টিই এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে। রোমান্টিক সৌন্দর্যব্যাকুলতা, বুদ্ধির দৃপ্ত বৈদগ্ধ্য, মননশীলতার সংমিশ্রণে এবং কিঞ্চিৎ বিতর্কের সহযোগে অভিনব আস্বাদ বহন করছে এই রচনাটি। সুপ্রচুর কৌতুক হাস্য এই রচনাগুলিকে বিশিষ্ট করেছে, অথচ ভাবগাম্ভীর্যের কিছুমাত্র হানি ঘটে নি। "বিচিত্র প্রবন্ধ" (১৯০৭) একটি অত্যুৎকৃষ্ট আত্মগৌরবী প্রবন্ধ-সঙ্কলন। ব্যক্তিগত সুর এবং লঘু মেজাজ এ-গ্রন্থে বড় প্রকাশ পায় নি। কিন্তু গদ্যভাষা স্বধর্মভ্রষ্ট না হয়ে কবিতার সৌন্দর্যের কত নৈকট্য পেতে পারে, কবি তা দেখিয়েছেন। ভাষাচিত্রের সৌন্দর্য ও বর্ণ-গৌরব এবং ভাবগভীরতায় এ-গ্রন্থের তুলনা কমই পাওয়া যায়। শাশ্বত সৌন্দর্য-বিরহের আর্তি, প্রয়োজনের জগৎকে ছেড়ে অপ্রয়োজনের আনন্দলোভে অভিসার-বাসনা এখানে ভাষারূপে বদ্ধ হয়েছে। "লিপিকা"র (১৯২৭) কয়েকটি রচনায় নিঃসন্দেহে গদ্যকবিতার সূচনা ঘটেছে, কয়েকটিতে ছোট গল্পের আমেজ আছে। অপর কয়েকটিকে আত্মগৌরবী প্রবন্ধ বা রসরচনা হিসেবে অভিহিত করা যায়। সেখানেও ভাষা গদ্যের সীমান্ত অতিক্রম করে কবিতার রাজ্যে প্রবেশের জন্য পা বাড়িয়েছে।

॥ তুই ॥

রবীন্দ্র-পর্বের গল্প-উপন্যাস

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাস বিশেষ করে চোখের বালি পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। রবীন্দ্র-পর্বের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র এই উপন্যাসের জীবনদৃষ্টি ও বাচনভঙ্গির দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের উপন্যাসের নব্য আঙ্গিকে কবির ব্যক্তিত্বের ছাপ এত তীব্র যে এর অনুসরণের মধ্য দিয়ে কোন নবধারা সৃষ্টি হয় নি। প্রমথ চৌধুরীর গল্পের ভাষারীতির সঙ্গে এদের সাদৃশ্য থাকলেও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি এ বিষয়ে প্রভাবিত এমন সিদ্ধান্ত করা চলে না।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ছোট গল্পকে শিল্পরূপের সমুচ্চ স্বর্গে আসন দিলেন। প্রমথ চৌধুরীর ছোট গল্পের রীতি অবশ্য রবীন্দ্র-নিরপেক্ষ ভাবেই গড়ে উঠেছিল। তবে সাধারণভাবে এ পর্বের এবং পরবর্তী কালের ছোট গল্পের লেখকেরাও রবীন্দ্র-সৃষ্ট ভূমিতেই বিচরণ করেছেন।

স্বয়ং কবি ব্যতীত এ-পর্বের বিশিষ্টতম কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র বহুদিক দিয়েই স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। রবীন্দ্র-পর্বেই তিনি নিজস্ব একটি ভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে বহু কথাসাহিত্যিককেই আকর্ষণ করেছেন। নারী ঔপন্যাসিকদের কেউ কেউ; নরেশচন্দ্র, চারুচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ কোন না কোন দিক দিয়ে শরৎচন্দ্রের গল্পোপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২)

উপন্যাস॥ রবীন্দ্রানুজ লেখকদের মধ্যে প্রভাতকুমার প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি শরৎচন্দ্র অপেক্ষা বয়সে তরুণ হলেও শরৎচন্দ্রের পূর্বে উপন্যাস ও গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন। "রমাসুন্দরী" (১৯০৮), "নবীন সন্ন্যাসী" (১৯১২), "রত্নদীপ" (১৯১৫), "সিঁদুর কৌটা" (১৯১৯), "মনের মানুষ" (১৯২২), "জীবনের মূল্য" প্রভৃতি চৌদ্দখানা উপন্যাস তিনি লিখেছিলেন। এদের অধিকাংশই ফেনিয়ে তোলা বড় গল্প। প্রভাতকুমারের ঔপন্যাসিকসুলভ সাহিত্যিক দৃষ্টি ছিল না। ঔপন্যাসিক জীবনের ঘটনাবহুল বিস্তৃত রূপের ছবি আঁকেন এবং মানবচরিত্রের ক্রমবিকাশ ও মানবভাগ্যের বিচিত্রতা দেখে বিস্ময় বোধ করেন। প্রভাতকুমারের দৃষ্টি জীবনের বিপুল সমগ্রতার দিকে তাকায় না। তাঁর [illegible]

মামুলি, প্রায় প্রাণহীন। পার্শ্বকাহিনীগুলি অকারণ প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কোন কোন অংশ কৌতুকরসের স্পর্শে কিছু উপভোগ্য হয়েছে।

রত্নদীপ তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। রচনা-উৎকর্ষে এটির মূল্য সামান্য নয়। রাখাল নামক ব্যক্তির লোভ এবং লোভ জয়ের তীব্র দ্বন্দ্ব এই উপন্যাসে নিপুণতার সঙ্গেই চিত্রিত হয়েছে। এই কাহিনীটি বেশ সংহত ও একাগ্র।

ছোট গল্প ॥ প্রভাতকুমারের আসল পরিচয় তাঁর ছোট গল্পে। তিনি শতাধিক ছোট গল্প লিখেছিলেন। সেগুলি "নবকথা" (১৮৯৯), "ষোড়শী" (১৯০৬), "দেশী ও বিলাতী" (১৯০৯), "গল্পাঞ্জলি", "পত্রপুষ্প", "গল্পবীথি" প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের প্রশংসা করে পত্র লিখেছিলেন, "তোমার গল্পগুলি ভারি ভাল। হাসির হাওয়ায় কল্পনার ঝোঁকে পালের উপর পাল তুলিয়া একেবারে হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও কিছুমাত্র ভার আছে বা বাধা আছে তাহা অনুভব করিবার জো নাই।"

প্রভাতকুমারের ছোট গল্পের মার্জিত আঙ্গিকনৈপুণ্য অবশ্যস্বীকার্য। তাঁর গল্পে মূল বিষয়-ব্যতিরিক্ত কোন ঘটনা বা বর্ণনার স্থান নেই। সব কিছুই অনিবার্য গতিতে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়। প্রভাতকুমারের গল্পের শেষে একটি করে আকস্মিক চমক থাকে। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য তরল সরল কৌতুকরস। এ কৌতুকে ব্যঙ্গের তীব্র জ্বালা নেই, আঘাত নেই। এমন নির্মল শুভ্র হাস্য বাংলা সাহিত্যের আসরে খুব বেশি নেই। প্রভাতকুমারের এই হাস্য জীবনদৃষ্টির বিশিষ্ট ভঙ্গির ফল। জীবনের সুগভীর অনুভূতি প্রভাতকুমারকে আকর্ষণ করত না; কল্পনার বিচিত্র সুদূরাভিসার এবং মনস্তত্ত্বের জটিল সমস্যার প্রতি তাঁর প্রবণতা ছিল না।

তিনি অবশ্য "দেবী", "আদরিণী" প্রভৃতি দু'একটি গভীর রসের গল্প লিখেছেন, এবং দেবী গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দিক দিয়ে বিস্ময়কর সাফল্যও লাভ করেছে। কিন্তু "বলবান জামাতা", "কুঙ্কুমকুমারীর গুপ্তকথা", "হতাশ প্রেমিকের ডায়েরী", "অদ্বৈতবাদ", "পোস্টমাস্টার", "মাস্টার মহাশয়", "রসময়ীর রসিকতা"র মত কৌতুক-গল্পের প্রতিই তাঁর বিশেষ প্রবণতা এবং এখানেই তাঁর সত্যকার সাফল্য।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)

পরিচয় ॥ শরৎচন্দ্র বাংলা দেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা তিনি যেমন প্রভাবিত হয়েছিলেন

তেমনি এর মধ্যেও নিজের মানসপ্রবণতা অনুযায়ী স্বাতন্ত্র্যের সৃষ্টি করেছিলেন। শরৎচন্দ্র বঙ্কিমের গল্পগঠনের রীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করলেও তাঁর রোমান্স-প্রবণতা, ঘটনার বাহুল্য ও প্রবলতা এবং অতিলৌকিক উপকরণের প্রতি আকর্ষণকে পরিহার করেছিলেন। বঙ্কিমের সমাজদৃষ্টি শরৎচন্দ্রের নিকটে নীতিবাগীশতা বলে মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের চোখের বালির প্রভাব যে তাঁর উপরে সুগভীর একথা তিনি নিজে স্বীকার করেছিলেন।

শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক প্রবণতার প্রধান দিকগুলির পরিচয় নেওয়া যাক। এক ॥ শরৎচন্দ্র অত্যন্ত আবেগপ্রবণ শিল্পী। আবেগকে সংহত ও সংযত করলে তা শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়ায়। সর্বদা শরৎচন্দ্র সে সিদ্ধিতে পৌঁছতে চান নি। দুই ॥ তিনি আসলে পারিবারিক জীবনের রূপকার। তাঁর বড় গল্পগুলিতে ('রামের সুমতি", "বিন্দুর ছেলে", "নিস্কৃতি", "মেজদিদি" প্রভৃতি) পরিবারজীবনের কাহিনী ও সমস্যা প্রাধান্য পাওয়ায় এখানে এক অভিনব পরিবাররসের আবেদন সৃষ্টিতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। শরৎচন্দ্রের যে-সব উপন্যাসে সমস্যার মধ্যে সমাজজিজ্ঞাসার প্রাধান্য সেখানেও পরিবারজীবনের চিত্র কাহিনীকেন্দ্রে অধিষ্ঠিত, সমগ্র রচনাটি জুড়ে পরিবাররসের বিস্তার। তিন ॥ সামাজিক সংস্কার, নীতিবোধ এই বিশিষ্ট প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের কেন্দ্রীয় সমস্যা। বাংলাদেশের গ্রাম্য সমাজের নানা কদাচার, সমাজ-প্রধানদের অন্যায় স্বার্থপরতা, জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণ এবং মানুষের হীনমন্যতাকে শরৎচন্দ্র দ্বিধাহীন চিত্তে ধিকার দিয়েছেন। কিন্তু নরনারীর বিবাহকে তিনি মনে মনে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারেন নি। এই বিবাহে যদি ব্যক্তিগত কামনা-বাসনার চরিতার্থতা নাও মেলে তবুও মনের মধ্যে তাকে গুরুতর মূল্য দিতে তিনি সঙ্কুচিত হন নি। রাজলক্ষ্মীর মত নারীর জীবনে বাঈজীবৃত্তির মধ্যেও বঙ্কুর মাতৃত্বের সংস্কার কাজ করেছে। মৃণালের বিবাহে তার বাসনা-কামনার সমাপ্তি ঘটেছে; অথচ এই অসম মিলনকেও শরৎচন্দ্র এতবড় সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন যাতে জীবনসংগ্রামে ভগ্নতরী যাত্রীরা ঐ পোতেই আশ্রয় খুঁজেছে। অন্নদাদিদি যে দুঃখের ও লাঞ্ছনার মধ্যেও আগুনের শিখার মত জ্বলেছে তার কারণ ঐ ছন্নছাড়া সাপুড়ের সঙ্গে তার প্রকৃত সম্পর্ক স্বামী-স্ত্রীর। বৈধব্যের সংস্কার থেকে মুক্ত হতে পারে নি রমা কিংবা সাবিত্রী, মুক্তির কথা ভাবতেও পারে নি বড়দিদি কিংবা পার্বতী। অবশ্য দুটি দিক থেকে শরৎচন্দ্র এই অতি পুরাতন আদর্শের মধ্যে আলোড়ন [illegible]

সুতীব্র চিত্র এঁকেছেন ; বিধবা নারীর প্রেমের কাহিনীতে তাঁর শিল্পীচিত্তের বিশেষ প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। আদর্শ যাই হোক, দ্বীপের মত শান্ত নিরাপদ বন্দরটি অদূরে যত স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ুক না কেন, যে মানুষের হৃদয় সমুদ্রতরঙ্গে আন্দোলিত তাদের কথা বলতেই তিনি চেয়েছেন, তাঁর শিল্পীপ্রাণ অতৃপ্ত বাসনার আর্তধ্বনিই কান পেতে শুনেছে। মৃণাল কিংবা অন্নদাদিদি অথবা সুরবালা তাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান পাত্রী হয়ে ওঠে নি। রাজলক্ষ্মী, অচলা, সাবিত্রী, কিরণময়ীরই সেখানে মুখ্য ভূমিকা। এদের কেউ বন্দরে ভেড়ান নৌকা, ঢেউয়ের আঘাতে দীর্ণপ্রায়, কিন্তু দড়ির ক্ষীণ বন্ধনটুকু ছেঁড়ে নি ; কেউ আবার মাঝ দরিয়ায় আতঙ্কে-উল্লাসে আর্ত হয়ে উঠেছে, তীরের বন্ধন হারিয়েছে ; আবার যারা নিশ্চিন্ত আদর্শলোকের অধিবাসী তাদের প্রশান্তি ও সংযমের অন্তরালে অপচিত জীবনের কী নিদারুণ চিত্র ! শিল্পী শরৎচন্দ্র তাই বিভ্রান্ত, তরঙ্গক্ষুব্ধ মানসিকতায় নিত্যআন্দোলিত ; প্রাচীনকাল থেকে গড়ে ওঠা পাকা বন্দরের মোহে আবদ্ধ, কিন্তু তার নিরাপত্তায় আর মূল্যে সংশয়ী। এই সংশয় আর যন্ত্রণারই লেখকের বিংশ শতকীয় আধুনিকতার চিহ্ন।

তিনপর্ব ॥ শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিকে স্পষ্টরেখ পর্বে ভাগ করা কঠিন। তবুও মোটামুটি ভাবে তাদের তিন পর্বে ভাগ করে পাঠ করা সম্ভব।

প্রথম পর্বের বিস্তার ১৯১৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত। এই সময় পর্যন্ত তাঁর এই গল্প ও উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়েছিল—"বড়দিদি" (১৯১৩), "বিরাজ বৌ" (১৯১৪), "বিন্দুর ছেলে" (১৯১৪), "পরিণীতা" (১৯১৪), "পণ্ডিতমশাই" (১৯১৪), "মেজদিদি" (১৯১৫), "পল্লীসমাজ" (১৯১৬), "চন্দ্রনাথ" (১৯১৬), "বৈকুণ্ঠের উইল" (১৯১৬) এবং "অরক্ষণীয়া" (১৯১৬)। শিক্ষানবীশির নানা চিহ্ন এই গল্প-উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ। উপন্যাস-গুলিও আকারে-প্রকারে ক্ষুদ্র। একমাত্র পল্লীসমাজেই উপন্যাসের লক্ষণ আছে। এই উপন্যাসেই লেখকের অস্পষ্ট নীতিবিরুদ্ধতা প্রথম দেখা দিল, অন্যত্র শরৎচন্দ্র পরিবাররসের কাহিনীকথনেই প্রধানত তৃপ্ত। নারী-চরিত্র এই সময় থেকেই তাঁর গল্প-উপন্যাসের কেন্দ্রে আসন পেতে বসেছে।

১৯১৭ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত লেখা গল্প-উপন্যাসগুলিকে দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্ভুক্ত করা চলে। অবশ্য ১৯২৬ সালে প্রকাশিত "পথের দাবী"কে ঠিক কোন পর্বের মধ্যেই ধরা সঙ্গত নয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসধারায় এটি

(১৯১৭), "চরিত্রহীন" (১৯১৭), "দত্তা" (১৯১৮), "শ্রীকান্ত ২য় পর্ব" (১৯১৮), "গৃহদাহ" (১৯২০), "বামুনের মেয়ে", "দেনাপাওনা" (১৯২৩), "নববিধান" (১৯২৪)। এই পর্বের উপন্যাসগুলি আকারে বৃহৎ; ঘটনার জটিলতায় এবং চরিত্রের বিকাশে উপন্যাস নামের যোগ্য হয়ে উঠেছে। পরিবারজীবনের মধ্যে বৃহত্তর সমাজজিজ্ঞাসা তরঙ্গোদ্বেলতার সাড়া তুলেছে। এই পর্বে শরৎচন্দ্র মানবজীবনের গভীর ও জটিল সমস্যার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। মানুষের মুক্ত হৃদয় বিদ্রোহী হয়ে সমাজনীতির সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয়েছে। তার মধ্য দিয়ে অসহায় মানুষের চিত্ত-অবক্ষয়ের ট্রাজেডি তিনি দেখেছেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। রচনাগত ত্রুটিবিচ্যুতি ও ভাবালুতার আতিশয্য সত্ত্বেও লেখকের দৃষ্টিকোণের এই বিশিষ্টতা এই পর্বের উপন্যাসে প্রকাশ পেয়েছে।

"শেষ প্রশ্ন" (১৯৩১), "বিপ্রদাস" (১৯৩৫) এবং অসম্পূর্ণ "শেষের পরিচয়" উপন্যাসে কিছু কিছু নূতন লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল। এদের তৃতীয় পর্বের রচনা বলা চলে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর য়ুরোপীয় সাহিত্যের নবীন জিজ্ঞাসা এদেশের কথাসাহিত্যে বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের শেষার্ধে প্রকাশিত হতে থাকে: শরৎচন্দ্রের মন এর পূর্বেই পরিণতি পেলেও এই নূতন হাওয়া যে তাঁকেও কিছু চঞ্চল করেছিল তার চিহ্ন এখানে আছে। ভাবাকুলতার অতিরেক সত্ত্বেও কিছু মননশীলতা, সংলাপের ভাষায় বুদ্ধির কিছু দীপ্তি এ পর্বে প্রকাশিত। এই উপন্যাস তিনটিতে শরৎচন্দ্র যেন নরনারীর বিবাহের চেয়ে স্বতন্ত্র কিন্তু বিবাহের চেয়ে বড় কোন সম্বন্ধ খুঁজে খুঁজে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। এর সমাধান তিনি পান নি। কিন্তু শিল্পীব্যক্তিত্বের নিষ্ঠার দিক থেকে এই বিবর্তন একান্ত মূল্যহীন নয়।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

প্রমথ চৌধুরী একটিও উপন্যাস লেখেন নি। বৃহদাকৃতি রচনার প্রতি তাঁর কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। তাঁর মেজাজটিই ছিল ছোট গল্প লেখার অনুকূল। বাংলা ভাষায় ফরাসী ছোট গল্পের আঙ্গিকরীতিকে তিনিই প্রথম পরিচিত করিয়েছিলেন। তাঁর গল্পগুলি রূপসিদ্ধ। আঙ্গিকগঠনে দুর্লভ নিপুণতার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। তাঁর গল্পের ভাষার মধ্যে রয়েছে তীক্ষ্ণ মননশীলতা, বাকচাতুর্যের চমৎকারিত্ব এবং বুদ্ধির অসিচালনা। কিন্তু তাঁর জগৎ ও

জীবনদৃষ্টি বুদ্ধিকে একমাত্র অবলম্বন করে তোলায় মানুষকে সম্পূর্ণ দেখবার চেষ্টা করে নি। আবেগ যে মানবচিত্তের একটা প্রধান অংশ ; দুঃখের তীব্র দাহ, রোমান্সের মায়ামরীচিকা, রোমান্টিক সৌন্দর্যধ্যান যে শুধু মাত্র ব্যঙ্গের তীরে বা কৌতুক-কটাক্ষে উড়িয়ে দেবার বস্তু নয় প্রমথ চৌধুরীর গল্প পড়ে তা বুঝবার উপায় নেই। গল্প অপেক্ষা বক্তৃতার, চরিত্রচিত্রণকে এবং প্রতিহত করে বিতর্ক ও মন্তব্যের প্রাধান্য দেখে মনে হয় যেন সত্যকার গম্ভীর বা গভীর ভাবে জীবনকে বুঝবার চেষ্টা না করে তার উপরতলশায়ী বর্ণবিচ্ছুরণ-গুলিতে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন এবং পাঠককে মুগ্ধ করতে চেয়েছেন।

নীললোহিত সম্পর্কে লেখা গল্পগুলি, "চারইয়ারী কথা", "রামশ্যাম", "ভূতের গল্প", "বীণাবাঈ", "ফরমায়েসী গল্প", "অ্যাডভেঞ্চার জলে ও স্থলে" প্রভৃতি প্রমথ চৌধুরীর প্রধান গল্প বলে গ্রহণ করা চলে।

প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব বাংলা গল্প সাহিত্যে খুব প্রত্যক্ষ ভাবে পড়ে নি। তবে তাঁর ভাষাভঙ্গি এবং ভাবনার ধারা পরবর্তী একটি গোষ্ঠীর উপরে বিশেষ ক্রিয়াশীল হয়েছে।

অন্যান্য লেখক

অনুরূপা দেবী (১৮৮২-১৯৫৮) ॥ অনুরূপা দেবী "পোষ্যপুত্র" (১৯১১), "জ্যোতিহারা" (১৯১৫), "মন্ত্রশক্তি" (১৯১৫), "মহানিশা" (১৯১৯), "মা" (১৯২০) প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস লিখেছিলেন। বিংশ শতকের প্রথম দিকে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখবার চেষ্টা করেছিলেন, এ ঘটনা বিস্ময়কর। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত ছিল না এতে তার প্রমাণ আছে। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা উপন্যাসে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্সের আবার পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ একান্ত ভাবেই সামাজিক উপন্যাসের যুগ।

অনুরূপাদেবী হিন্দুধর্মের প্রচলিত সংস্কারকে গৌরব দিতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। পাশ্চাত্ত্য ভাব-ভাবনার স্পষ্ট বিরুদ্ধাচারণ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে তিনি মাঝারি ধরনের লেখিকা। কোন বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যে তিনি পাঠকচিত্তকে আকর্ষণ করেন নি।

নিরুপমা দেবী ॥ "দিদি" (১৯১৫), "বিধিলিপি" (১৯১৭), "শ্যামলী" (১৯১৮) প্রভৃতি উপন্যাস লিখে নিরুপমা দেবী খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রতি তিনি কোনরূপ প্রবণতা দেখান নি। [illegible]

কোন তীব্র সামাজিক সমস্যা তাঁর উপন্যাসে গুরুত্ব পায় নি। তিনিও অনুরূপা দেবীর ন্যায় হিন্দু-সংস্কারকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। সুলভ আবেগাতিশয্য তাঁর উপন্যাসকে জনপ্রিয়তা দান করলেও শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে এদের স্থান খুব উচ্চে নয়।

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত॥ "শুভ্রা" (১৯২০), "সর্বহারা" (১৯২৯), "মিলন-পূর্ণিমা", "অভয়ের বিয়ে", "অগ্নিসংস্কার", "বিপর্যয়" প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস লিখে নরেশচন্দ্র খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। "নরেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলি হইতে তাঁহার তীক্ষ্ণ মানসিকতা ও চিন্তাশীল বিশ্লেষণনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান অভাব হইতেছে রসানুভূতি ও ভাবসঞ্চারের তীব্রতার। তাঁহার অন্তর্দ্বন্দ্বের চিত্রগুলির মধ্যে যে পরিমাণ জটিলতা আছে অনুরূপ ভাবগভীরতা নাই।" (—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়॥ "চোর কাঁটা", "যমুনা পুলিনের ভিখারিণী", "দোটানা" প্রভৃতি অনেকগুলি উপন্যাস লিখলেও চারুচন্দ্রকে সম্পূর্ণত মৌলিক উপন্যাসের লেখক বলা চলে না। বিদেশী উপন্যাসকে অবলম্বন করে এগুলি রচিত। কিন্তু লেখকের এখানেই নিপুণতা যে বাঙালী জীবনের পরিচিত পরিবেষ্টনীর সঙ্গে তিনি তাদের একাকার করে ফেলতে সমর্থ হয়েছেন।

উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়॥ "শশীনাথ", "রাজপথ", "অন্তরাগ", "দিক্‌শূল" উপন্যাসের লেখক উপেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আবেগের আধিক্যে, গল্পগঠনের বিশিষ্টতায় তিনি শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করলেও জীবন-দৃষ্টির গভীরতায় বা সমাজনীতির সংঘর্ষে ব্যক্তিত্বের তীব্র অবক্ষয়ের চেতনায় তিনি কোন কালেই পৌঁছতে পারেন নি।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ "ভাদুড়ী মশাই", "কোষ্ঠির ফলাফল" প্রভৃতি উপন্যাসের লেখকরূপে বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন কেদারনাথ। ঔপন্যাসিক সংহতি ও সমগ্রতার অভাব থাকলেও হাস্যরসের সঙ্গে করুণরসের মিশ্রণে তিনি তাঁর রচনায় একজাতীয় নূতন আস্বাদ এনেছেন।

॥ তিন ॥

রবীন্দ্র-পর্বের কবিতা

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাব ও রূপবৃত্তে সমকালীন কবিগণ দীর্ঘকাল আবর্তিত হয়েছেন। একালের বহু কবিই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াতে পারেন নি এবং সম্ভবত তা চানও নি। সম্ভবত রবীন্দ্র-মনন ও অনুভবের সীমাহীন বিস্তৃতি ও অতল গভীরতা যে তাঁদের আয়ত্তের অতীত, তার বাহ্য সরল ও তরল রূপই যে হবে তাঁদের অনুকরণে বাস্তব, এই বোধও বিলম্বিত ছিল। কিন্তু সবচেয়ে বিপদ রবীন্দ্রনাথের বিবর্তনধর্ম নিয়ে। জীবনপ্রত্যয়ের কেন্দ্রগত ভাবোপলব্ধিতে অবিচল থেকেও যুগের পরিবর্তনকে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন তিনি। উনবিংশ শতাব্দীর বিশ্বাসের যোগ্যতম প্রতিনিধি হয়েও বিংশ শতকের যন্ত্রণারও এক অংশকে তিনি কাব্যভাষা দিয়েছিলেন যে আশ্চর্য নিপুণতায়, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই সম্ভব। রবীন্দ্রঅনুকারীরা এই পরিবর্তনের বিদ্যুৎচমকে দিশাহারা, পরিবর্তমান কবিকে অনুসরণের চেষ্টা না করেই তাঁরা নিশ্চিন্ত।

এই পর্বের কয়েকজন কবি রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রমের চেষ্টা করেছেন। এঁরা তুলনামূলক ভাবে অধিকতর শক্তির অধিকারী, রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিতার সূচনাও এঁদেরই রচনায়।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

প্রমথ চৌধুরী স্বল্পসংখ্যক কবিতাই লিখেছেন। "সনেট পঞ্চাশৎ"য়ে (১৯১৩) তিনি সনেট আঙ্গিকে এক অভিনব পরীক্ষা চালিয়েছেন। ফরাসীরীতির সনেট তিনিই বাংলা ভাষায় নিয়ে এলেন। তাঁর ব্যঙ্গ-বক্র-বিদগ্ধ জীবনদৃষ্টির স্বাভাবিক আধার হিসেবে এই সনেটরীতি আশ্চর্য মানিয়েছে। তাঁর "পদচারণা"-এর (১৯১৯) বেশির ভাগ লেখাই কবিতা-কৌতুক, দু'চারটি মাত্র সিদ্ধ সনেট। মুষ্টিমেয় কবিতার রচয়িতা হলেও নব সম্ভাবনার পথিকৃৎ তিনি। বাংলা কবিতায় প্রমথ চৌধুরী এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। মননের দীপ্তি বিচ্ছুরণে তিনি অনুভূতির দ্রুতির রাজ্যে বিপর্যয় আনেন, লঘু চপল ব্যঙ্গকৌতুকে রোমান্টিক ভাবালুতার অতিবিস্তারের তিনি পক্ষচ্ছেদ করেন। হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে জ্ঞানকর্মকে সংযুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা তাঁর কবিতা পাঠে উপলব্ধ হয়। রূপরচনায় কী

অদ্ভুত নিষ্ঠা তাঁর রচনায়, চিত্রকল্পে শিথিলতার সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি, আর শব্দচয়নে সংস্কৃত-লৌকিকের বিচিত্র আলিঙ্গন আধুনিক কবিতার রূপায়ণ-বৈশিষ্ট্যের পূর্বাভাস বয়ে আনে।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২)

মোহিতলালের কবিতার আঙ্গিকে ব্যক্তিত্বের বজ্রকঠিন লৌহকবচ। এ আবরণ কিংবা আভরণ উনিশ শতকের ক্লাসিক সংহতির অনুসারী। কিন্তু ভাবকল্পনায়, বিশেষ করে প্রেমসম্পর্কের নব তাৎপর্য আবিষ্কারে, তিনি রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার দ্বারোদ্‌ঘাটনে এক অভিনব ভূমিকায় অবতীর্ণ। তাঁর প্রাণদৃপ্ত দেহবাদী চেতনা রবীন্দ্রকল্পনার অশরীরী প্রেমানুভূতিকে অস্বীকার করল। তান্ত্রিক সাধকোচিত ইন্দ্রিয়লোকের সম্পূর্ণ ও নিঃসংশয়িত অঙ্গীকারে সন্ন্যাস ও ত্যাগের আদর্শ পরিত্যক্ত ও ধিক্কৃত হল।

মোহিতলাল "স্বপনপসারী" (১৯২২), "বিস্মরণী" (১৯২৭), "স্মরগরল" (১৯৩৬), "হেমন্ত গোধূলী" (১৯৪১), "ছন্দ চতুর্দশী" (১৯৫১) প্রভৃতি কাব্য রচনা করেছেন। তাঁর কাব্যে উপলব্ধির গভীরতা, ভাবের মৌলিকতা এবং স্খলনহীন রূপনির্মিতি সমকালীন কবিদের মধ্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছে। রবীন্দ্র-অনুজ কবিগোষ্ঠীর মধ্যে তিনি যে প্রধান ব্যক্তিত্ব তাতে সন্দেহ নেই। তবে বাক্‌ভঙ্গি ও কবিতার দেহগঠনে তাঁর আদর্শ ক্লাসিক। এজন্য তাঁকে পুরাতন-পন্থী বলে কেউ কেউ মনে করে থাকেন। কিন্তু কবিতার এই দেহরূপে তাঁর কল্পনার কঠিন পৌরুষ এবং গম্ভীর মনন যথাযোগ্য প্রতিফলন লাভ করেছে।

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪)

"মরীচিকা" (১৯২৩), "মরুশিখা" (১৯২৭), "মরুমায়া" (১৯৩০), "সায়ম্‌" (১৯৪০), "ত্রিযামা" (১৯৪৮), এবং "নিশান্তিকা" কাব্যে যতীন্দ্রনাথ আপন বিশিষ্টতা মুদ্রিত করেছেন। যতীন্দ্রনাথের সর্ব নশ্বরতার ধারণা এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবনতৃষ্ণা একান্তই প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট সত্য—জ্ঞানবুদ্ধির আয়ত্তগম্য বিষয়। এখান থেকেই জন্ম নিয়েছে তাঁর দুঃখবাদ। তাঁর দুঃখবাদের মূলে কোন দুর্জ্ঞেয়তার চেতনা নেই। দুর্জ্ঞেয়তা, অসীমাভিমুখী রহস্যদ্যোতনা, ইন্দ্রিয়াতীত সূক্ষ্মতা, প্রকৃতিপ্রীতি যতীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করতে পারে নি। পারে নি বলেই তিনি জড়বাদী, দুঃখবাদী এবং রোমান্টিকতাবিরোধী।

যতীন্দ্রনাথের প্রথম তিনটি কাব্যে এই সুর পরিবর্তনহীনভাবে বেজেছে। কিন্তু "সায়ম" থেকে কবির ভাবভাবনায় পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, "ত্রিযামা"

এবং "নিশান্তিকায়" তা স্পষ্ট প্রতিষ্ঠিত। দুঃখবাদী জীবনদৃষ্টি যতীন্দ্রনাথকে সৌন্দর্য, প্রেম ও প্রকৃতির রাজ্য থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। কিন্তু দুঃখবাদের মরুভূমিতে দীর্ঘকাল বিচরণ করতে করতে তাঁর দেহ উত্তপ্ত ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যৌবনের উদ্দাম প্রাখর্যে তিনি হৃদয়লোকের দুর্মর প্রেম-পিপাসা ও যৌবনতৃষ্ণাকে অনুভব করতে পারেন নি। বিশেষ করে তাঁর উচ্চকণ্ঠ নেতিঘোষণার পশ্চাতে নিজের কামনা চাপা পড়ে গিয়েছিল। বার্ধক্যের হেমন্ত গোধূলিতে তিনি আপন দুঃখবাদী জীবনদর্শনের দীর্ঘকালীন সৃষ্টিকর্মের দিকে তাকিয়ে আপনি চমকে উঠলেন। এককালে যাকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, আজ তারই ব্যর্থ সন্ধানের আর্তি ফুটে উঠল কবির কণ্ঠে।

নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-)

নজরুল ইসলাম কাব্য লিখেছিলেন অনেকগুলি। ১৯২২ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে তাঁর অধিকাংশ কাব্য প্রকাশিত। এদের মধ্যে "অগ্নিবীণা", "ভাঙার গান", "বিষের বাঁশী", "সর্বহারা", "দোলনচাঁপা", "ছায়ানট", "সিন্দু-হিন্দোলের" নাম করা চলে। ১৯৩০-এর পর থেকে নজরুল প্রধানত দেখা দিলেন গীতিরচয়িতা এবং সুরকার হিসেবে। বাংলা গানের রাজ্যে তাঁর অবদান সর্বস্বীকৃত ব্যাপার। তাঁর গজল গানগুলির লঘু মিঠে বাণী ফার্সী শব্দের সুষম প্রয়োগে কবিতার রাজ্যেও স্থান দাবি করতে পারে।

নজরুলের কাব্যে পাশাপাশি দুটি ধারা চলেছে। প্রথম ধারাটি সাম্যবাদী চেতনাকে উত্তেজিত ভাষায় কাব্যভাত করেছে। এই চেতনা অবশ্য কোন বিশেষ মতবাদের বুদ্ধিসম্মত স্বীকৃতির পথ ধরে আসে নি, কবির আবেগ-গভীরতা মন্থন করেই জন্ম নিয়েছে। কিন্তু এই রাজনীতি-চর্চা—উচ্চকণ্ঠ দরিদ্র-প্রীতি, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা—চিন্তাধারা হিসেবে মহৎ হলেও উৎকৃষ্ট কবিতার জন্ম দেয় নি। নজরুলের জনপ্রিয়তা এই কারণেই। কিন্তু কবিতা হিসেবে এরা মূল্যবান নয়।

কিন্তু উচ্চকণ্ঠ মঞ্চবক্তৃতা এবং তীব্র রাষ্ট্রনৈতিক উত্তেজনার মধ্যে মাঝে মাঝে নজরুলের কণ্টকবিদ্ধ কবিপ্রাণ অভিযাত্রীদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আপন মনের নিভৃত নির্জনে এসে আশ্রয় নিয়েছে। সেখানে তখন আদিগন্ত অবসাদ আর বিষণ্নতা। নজরুলের কবিতার এক প্রান্তে তেজোদ্দীপ্ত গর্জনমুখরতা, অন্য প্রান্তে ক্লান্ত করুণ চিত্ররচনায় লঘু খেয়ালী কল্পনাশ্রয়ী মনমৌমাছির মেতে ওঠা।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)

সত্যেন্দ্রনাথ অনেকগুলি কাব্য লিখেছিলেন। তাঁর মধ্যে প্রধান "বেণু ও বীণা" (১৯০৬), "কুহু ও কেকা" (১৯১২), "অভ্র-আবীর" (১৯১৬), "মণিমঞ্জুষা", "তুলির লিখন", "বেলাশেষের গান", "ফুলের ফসল" এবং ব্যঙ্গ-কবিতা সঙ্কলন "হসন্তিকা"। তাঁর "তীর্থসলিল" এবং "তীর্থরেণু", একনিষ্ঠ অনুবাদক-কবি হিসেবেও তাঁকে খ্যাতি দিয়েছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ বিচিত্র বিষয়ের কবিতা লিখেছেন। রাজনীতি-সমাজনীতি বিষয়ক কবিতায় তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার পরিচয় আছে। কিন্তু এই সব উপকরণ কবিব্যক্তিত্বের অচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়ে ভাষারূপে প্রতিফলিত হলেই উৎকৃষ্ট কবিতা হয়ে উঠতে পারে। সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। লঘু তরল কল্পনাবিলাসে, ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, শব্দ-চয়ন ও কবিতার দেহনির্মিতি ঘটিত নানা কারুকর্মে তিনি উৎসাহ দেখিয়েছেন। কিন্তু কাব্যোৎকর্ষের সঙ্গে এই উৎসাহের কোন গভীর সম্পর্ক নেই।

সাধারণভাবে সত্যেন্দ্রনাথে সূক্ষ্ম কল্পনার দৈন্য লক্ষিত হবে। এই দৃশ্যমান প্রত্যক্ষ জগৎ এবং সুস্পষ্ট চিন্তাই তাঁর চিত্তকে আকর্ষণ করেছে। চারপাশের পৃথিবীতে, আরও ঘনিষ্ঠভাবে আপন দেশে এবং কালে, যে ঘটনা প্রাধান্য পেয়েছে, যে সাময়িক আলোড়নে জনচিত্ত সংক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে তাকে শব্দে সমর্পিত এবং ছন্দোবদ্ধ ভাষায় রূপদানের আগ্রহ কবি দেখিয়েছেন। কিংবা কোন বস্তু বা নিসর্গসংসারের কোন দৃশ্য যদি প্রেক্ষণীয় বলে মনে হয়েছে তাঁর কাছে তবে তার যে রূপ বাণীবিন্যাসে ধরা পড়বার তাকেই কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। কবির ভাবদৃষ্টিগত দেখার কোন স্মরণীয় বিশেষত্ব, প্রাণচাঞ্চল্যের কোন তরঙ্গ, হৃদ্‌গত কোন উৎকণ্ঠা যেমন প্রায়ই সে-বস্তুকে চিত্তময় করতে পারে নি, তেমনি কবি দূরযানী কল্পনার পাখায় চাপিয়ে তাকে অনন্ত প্রসারিত দিগন্তের অভিসারে পাঠাতে পারেন নি।

কবি-চতুষ্টয়

রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের সংখ্যা অনেক। তাঁদের মধ্যে নাম করতে হয় প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, কিরণধন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির। বলেন্দ্র নাথের "মাধবিকা" এবং "শ্রাবণী"তে এমন কয়েকটি সনেট সঙ্কলিত হয়েছে যার মধ্যে ভাব ও প্রকাশভঙ্গিগত কিছু স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। দেবেন্দ্রনাথের সনেটের কিছু প্রভাব তাঁর রচনায় আছে বলে মনে হয়।

এই কবিদের মধ্যে কালিদাস রায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কুমুদরঞ্জন মল্লিক বিশেষভাবে আলোচিত হবার মত শক্তির অধিকারী। এঁদের ভাবভঙ্গি এবং বাক্‌রীতির মধ্যে স্পষ্ট সাদৃশ্য আছে। রবীন্দ্র-কল্পনা ও রূপ-চেতনার চারপাশে এঁরা আবর্তিত হয়েছেন। বৈষ্ণব ভাবুকতাও এঁদের কবিতার একটি প্রধান সুর। সহরবিমুখ পল্লীপ্রীতি এবং ধর্মপ্রাণ আস্তিকতা, সৌন্দর্যের প্রচলিত ধারণায় বিশ্বাস, যুগ-চেতনার সংশয়, হতাশা ও বিদ্রোহকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা এঁদের এক গোষ্ঠিভুক্ত করেছে।

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫) ॥ করুণানিধানের প্রধান কাব্য "ঝরাফুল" (১৯১১), "শান্তিজল" (১৯১৩), এবং "ধানদুর্বা"। করুণানিধানের কবিতায় রূপমত্ততার স্পর্শ আছে। এই রূপানুসন্ধান কবিকে গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে পুরীতে, ত্রিকূটে, কাঞ্চনজঙ্ঘা-ওয়ালটেয়ার-পঞ্চকোটে, পদ্মাতটে কিংবা চিত্রাকূটে নিয়ে যায়। এর পিছনে কবির ধর্মপ্রবুদ্ধ চিত্তের সহজ প্রবণতা থাকলেও প্রকৃতির বিচিত্র রূপসৌন্দর্যের প্রতিও কিছু আকর্ষণ ছিল বলে মনে হয়। তাঁর বহু কবিতায় যৌবন-স্বপ্নের একটু আমেজও লক্ষ্য করা যায়।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী (১৮৭৮-১৯৪৮) ॥ যতীন্দ্রমোহনের "অপরাজিতা" (১৯১৯), "নাগকেশর", "নীহারিকা" (১৯২৭), "মহাভারতী" (১৯৩৬) সমকালে খ্যাতিলাভ করেছিল। ঐতিহাসিক চেতনা, বর্ণাঢ্য অতীতের সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ, মহাভারতের চরিত্রগুলিকে আধুনিক মানবদৃষ্টিতে উপস্থাপন, রচনায় মাঝে মাঝে নাটকীয় ভঙ্গি তাঁর কাব্যের প্রধান লক্ষণ রূপে দেখা দিয়েছে। এ-ছাড়া সহজ প্রাণের প্রীতির রসে সিঞ্চিত করে গ্রাম্য প্রকৃতি ও মানুষের চিত্র আঁকায়ও তিনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২—) ॥ "শতদল" (১৯০৬), "উজানী" (১৯১১), "একতারা" (১৯১৪), "বীণা" (১৯১৬), "বনমল্লিকা" (১৯১৮), "নূপুর" (১৯২২), "স্বর্ণসন্ধ্যা" কুমুদরঞ্জনের প্রধান কাব্যগ্রন্থ। বাংলার গ্রাম-প্রকৃতিই কুমুদরঞ্জনের কবিতার মূল আশ্রয়। ক্ষুদ্র বস্তু, স্তিমিত ভাবাবেগ, শান্তরস, জীবনের নিস্তরঙ্গ ভক্তি-প্রবণতা, প্রকৃতির সহজ সরল পরিচিত রূপ কুমুদরঞ্জনের কবিপ্রাণকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। কবির জীবনদৃষ্টির কেন্দ্রে বৃদ্ধের সংযত শান্তরস আছে, পরিণত গভীরতা নেই। সামান্যকে দেখে খুশি হবার মত মনের সরলতা এবং সরসতা আছে, কিন্তু জীবনজিজ্ঞাসার জটিলতা নেই। কুমুদরঞ্জন যন্ত্রণাযুগের মানুষের চিন্তাতপ্ত ললাটে শান্তিজল বর্ষণ

করেন, কিন্তু ঘাসের শিষের শিশিরকণার মত তাঁর সংক্ষিপ্ত স্থিতি মুহূর্তে শুকিয়ে যায়। ঐ মুহূর্তশীতলতার মোহাবেশই তাঁর দান।

কালিদাস রায় (১৮৮৯—) ॥ তাঁর অনেকগুলি কাব্যের মধ্যে "পর্ণপুট" (১৯১৪), "ব্রজরেণু" (১৯১৫), "বল্লরী" (১৯১৫), "বৈকালী" (১৯৪০)-ই প্রধান। তাঁর কবিতায় আঙ্গিকসাধনার সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। বিষয়বস্তু ও ভাবকল্পনার দিক থেকে তিনি কিছুটা কেন্দ্রচ্যুত। তবে মোটামুটি ভাবে বলা যায় প্রাচীন কালের প্রতি শ্রদ্ধা, গ্রামজীবনের প্রতি আকর্ষণ, নূতনের সংঘাতে পুরাতনের অবলুপ্তিতে বেদনার্ত স্বীকৃতি এবং সর্বোপরি বৈষ্ণব রস-বৈচিত্র্যের আস্বাদান তাঁর কাব্যে ভাষারূপ পেয়েছে।

॥ চার ॥

রবীন্দ্রপর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্য

ভূমিকা

রবীন্দ্র-পর্বের প্রবন্ধ-সাহিত্যের সীমারেখা মোটামুটি ভাবে প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রমথ চৌধুরীর গদ্যরীতির প্রভাব পরবর্তী অনেক প্রাবন্ধিকের উপরেই পড়েছে। তবে রবীন্দ্রপর্বের অনুবর্তন পরবর্তী পর্বের অনেক মুখ্য লেখকের মধ্যেই দেখা দিয়েছে। কাজেই প্রবন্ধ-সাহিত্যে খুব সুনির্দিষ্ট ভাবে সীমারেখা টানা কিছু কঠিন। রবীন্দ্রপর্বেও বহু প্রাবন্ধিক ঊনবিংশ শতাব্দীর ধারা ধরে চলেছেন। প্রবন্ধ-সাহিত্যের সবটাই সৃজনমূলক নয়। সৃজনশীল সাহিত্যের ন্যায় চিন্তাগর্ভ সাহিত্যে একই রীতিতে যুগ-বিভাগ করা কিছু কঠিন।

রবীন্দ্রপর্বের মুখ্য প্রাবন্ধিকগণ ভাষাভঙ্গিতে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধেও ভাষা ও বাচনভঙ্গির সৌকর্য বিশেষভাবে অনুভূত হয়। আত্মগৌরবী প্রবন্ধে বেশ কয়েকজন উচ্চ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন। নকশাজাতীয় রচনার স্থানে রোমান্টিক ভাবাকুলতা আত্মগৌরবী প্রবন্ধের প্রধান সুর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমালোচনা-রীতিতে বিচিত্রতা সূচিত হয়েছে। বঙ্কিম ব্যতীত সে যুগের অধিকাংশ সমালোচকই সৌন্দর্য-দৃষ্টিতে বিশেষ গভীরতার পরিচয় দিতে পারেন নি। তীব্র সৌন্দর্য-চেতনা রবীন্দ্র-প্রভাবের সাধারণ ফলশ্রুতি হিসেবে এ পর্বের সমালোচনায়

বিজ্ঞানাদি বিষয়ক মৌলিক প্রবন্ধের অভাব এ পর্বেও ঘুচল না। অর্থনীতি-রাষ্ট্রনীতি বিষয়েও আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্যের দুর্বলতা অব্যাহত রইল। ইতিহাসচর্চা, দর্শনালোচনা এবং সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আলোচনার দ্বারাই আমাদের বিষয়গৌরবী প্রবন্ধের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠল; তার মধ্যে অবশ্য সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়েই অধিক আগ্রহ প্রকাশ পেতে লাগল।

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭০-১৯০০)

বলেন্দ্রনাথের "চিত্র ও কাব্য" নামে একটি প্রবন্ধ-গ্রন্থ আছে। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধই অবশ্য সাময়িক পত্রে ছড়িয়ে ছিল। সম্প্রতি সেগুলি গ্রন্থবদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যসমালোচনা এবং আত্মগৌরবী প্রবন্ধে তিনি উল্লেখযোগ্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণার দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হলেও তাঁর মৌলিক দানও অস্বীকার্য নয়। বিশেষ করে কোন কোন প্রবন্ধে তিনি কালিদাসের সর্বস্বীকৃত কাব্যক্ষমতার সমালোচনা করেছেন। সমগ্রের চিত্র-অঙ্কনে কবির ব্যর্থতা এবং যে-কোন বিষয়ের চিত্রাঙ্কনে ইন্দ্রিয়ালুতা এবং লীলা-বিলাস চাপল্যের দিকে প্রবণতার কথা উল্লেখ করে তিনি যে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা তখনকার পক্ষে ছিল অত্যন্ত চমকপ্রদ। বৈষ্ণব কবিতার বিচারেও তিনি আশ্চর্য মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন, তার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য সরিয়ে রেখে শুধুমাত্র সাহিত্য-সৌন্দর্যকেই আলোচনার বিষয়ীভূত করেছেন। এর জন্য "ভারতী"-সম্পাদিকার সঙ্গে তাঁকে প্রত্যক্ষ বিতর্কে প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল।

বলেন্দ্রনাথের রোমান্টিক সৌন্দর্যকামী চিত্ত প্রাচীন ভারতের প্রতি এক গভীর আকর্ষণ অনুভব করত। কণারক, প্রাচীন উড়িষ্যা, খণ্ডগিরি, বারানসী প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে কাব্যসুরভিত ভাষায় তিনি প্রশংসনীয় সৌন্দর্যসৃষ্টি করেছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯)

রামেন্দ্রসুন্দর "প্রকৃতি" (১৮৯৬) গ্রন্থে বিজ্ঞানের বিষয়কে সাধারণের উপযোগী করে বিবৃত করেছেন; "চরিত কথায়" (১৯১৩) কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালীর ব্যক্তিত্বের মূল রহস্যটি আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। "শব্দকথা"য় শব্দতত্ত্ব ও ব্যাকরণ এবং "নানাকথায়" সমাজ ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে

আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব দার্শনিক প্রবন্ধ রচনায় "জিজ্ঞাসা" (১৯০৪) এবং "কর্মকথা" (১৯১৩) তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

রামেন্দ্রসুন্দর ডারউইন, ক্লিফোর্ড, হেল্মহোল্টস প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার সীমাবদ্ধতা অনুভব করতে পেরে অন্তহীন দার্শনিক জিজ্ঞাসায় গিয়ে পৌছলেন। তাঁর দার্শনিক প্রবন্ধগুলি চিন্তার গভীরতায়, যুক্তি, পদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তের মৌলিকতায় এবং সর্বোপরি ভাষার গম্ভীর সরলতায় বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়। রামেন্দ্রসুন্দরের ভাষায় যেমন গাম্ভীর্যের সঙ্গে সাবলীলতার সমন্বয় ঘটেছে তেমনি কৌতুক হাস্যের স্মিতস্পর্শ তাকে বিস্ময়কর সৌন্দর্য দান করেছে।

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা নামক রচনায় লেখকের সুগভীর স্বাদেশিকতার সঙ্গে কবিত্বশক্তির সংযোগ ঘটেছে। জ্ঞানসাধকের ভাষায় কাব্যসৌন্দর্যের এরূপ প্রকাশ খুব সুলভ নয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১)

"বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী" এবং "বাংলার ব্রত" অবনীন্দ্রনাথের শিল্প সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক আলোচনার গ্রন্থ। কিন্তু জ্ঞানের বোধও এখানে তথ্য-তত্ত্বে কণ্টকাকীর্ণ হয়ে প্রকাশ পায় নি। অবনীন্দ্রনাথ জ্ঞানের কথা বলতে গিয়েও যে গদ্য ব্যবহার করেছেন তা চলিত ভাষারীতি, চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি এবং কাব্য-ধর্মের এক বিচিত্র মিশ্রণ হয়ে দেখা দিয়েছে। তাঁর "জোড়াসাঁকোর ধারে", "ঘরোয়া", "আপন কথা" আত্মকথনমূলক রচনা হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি গল্পকথনেও তিনি তাঁর বর্ণালীবিকিরিত ভাষার প্রয়োগ করেছেন। বাংলা গদ্যরীতি তাঁর হাতে এক নবমূর্তি ধারণ করেছে।

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬)

"সবুজপত্র" পত্রিকাকে কেন্দ্র করে প্রমথ চৌধুরী বাংলা গদ্যে নবরীতির প্রবর্তন করলেন। চলিত ভাষায় যে গুরুলঘু সর্ববিধ ভাবভাবনার প্রকাশ সম্ভব প্রমথ চৌধুরী তা প্রমাণ করবার জন্য অগ্রসর হলেন। তাঁর ভাষায় রয়েছে নাগরিক বৈদগ্ধ্য, মননের তীক্ষ্ণ চমক, রোমান্টিক ভাবালুতার বিরুদ্ধতা, বুদ্ধির অতিচর্চা এবং কচিৎ ব্যঙ্গ, কচিৎরঙ্গের হাসি। উইট-এপিগ্রামের মুহুর্মুহু ব্যবহারে তাঁর ভাষা সদা উচ্চকিত।

প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলি "তেল-নুন-লকড়ী" (১৯০৬), "বীরবলের

হাল খাতা" (১৯১৭), "নানাকথা" (১৯১৯), "নানাচর্চা" (১৯৩২) নামে সঙ্কলিত হয়েছিল। দর্শন, রাষ্ট্রনীতি, ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। সর্বত্রই তাঁর রচনায় তীক্ষ্ণ মৌলিকতার চিহ্ন রয়েছে। বিষয়ের অন্তরে বিতর্কের ভঙ্গিতে প্রবেশ করে তার প্রাণকেন্দ্রটিকে আবিষ্কার করতে প্রমথ চৌধুরীর জুড়ি নেই। অধ্যয়নের প্রাচুর্য এবং জ্ঞানের গভীরতা তাঁর কোন প্রবন্ধকেই ভারাক্রান্ত করে নি, ধারালো করে তুলেছে মাত্র।

সাহিত্যসমালোচক হিসেবেও তাঁর খ্যাতি সর্বজনস্বীকৃত। তাঁকে এককথায় "রূপবাদী" আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ভাবের প্রকাশ নয়, ভাবের রূপনির্মিতিই সাহিত্যিকের কর্তব্য। অনেকখানি ভাব মরে একটুখানি রূপে ধরা দেবে। সাহিত্যিকের প্রখর বস্তুজ্ঞানের উপরেই এই রূপনির্মাণ নির্ভরশীল। তার সঙ্গে যুক্ত করতে হবে অতন্দ্র নিষ্ঠা ও সাধনা। এই-ই হল প্রমথ চৌধুরীর অভিমত।

প্রমথ চৌধুরী বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে নবধারা সৃষ্টির গৌরব দাবি করতে পারেন।

মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮২-১৯৫২)

মোহিতলাল বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর বাক্‌রীতিতে উনবিংশ শতাব্দীসুলভ অতি গাম্ভীর্য এবং শব্দাড়ম্বর লক্ষণীয়। কিন্তু ঐ ভাষাবন্ধে তাঁর ব্যক্তিত্বই যেন দেহরূপ লাভ করেছে। সমালোচক হিসেবে তিনি বঙ্কিমী রীতিতে কিছু বিশ্বাসী হলেও রবীন্দ্রযুগের তীব্র সৌন্দর্যরুচি তাঁর মধ্যে নিত্যজাগর ছিল। ইংরেজ সমালোচক মিড্‌লটন মারের দ্বারা তাঁর সমালোচনা বিশেষভাবে প্রভাবিত। ম্যাথু আর্ণল্ড-এর কিছু প্রভাবও তাঁর উপরে পড়েছে। তিনি "High Seriousness" এর ভক্ত ছিলেন। সাহিত্যেও এই আদর্শের অনুসরণ করতেন। বিশুদ্ধ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা তাঁর সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু ছিল। সাহিত্যিকের ব্যক্তিত্বকে তিনি মূল্য দিতেন। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি সুগভীর রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সমালোচনা-গ্রন্থগুলির মধ্যে "কবি শ্রীমধুসূদন", "আধুনিক বাংলা সাহিত্য", "সাহিত্যবিতান", "সাহিত্যবিচার", "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস" প্রভৃতি প্রধান। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পরিবর্তন ধারাকে তিনি সুনজরে দেখেন নি। অতিমাত্রায় বাঙালীয়ানা এবং তাত্ত্বিকদৃষ্টি তাঁর সাহিত্য সমালোচনাকে সম্পূর্ণভাবে গোঁড়ামী মুক্ত করতে পারে নি।

অন্যান্য প্রাবন্ধিক

দীনেশচন্দ্র সেন ॥ বাংলা সাহিত্যের পুরাতন কাল নিয়ে তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। তাঁর সাহিত্যিক রসদৃষ্টিও পুষ্ট ছিল। তাঁর ভাষা আবেগ-প্রধান, ভাবনা বৈষ্ণবতামুখী। "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ "সাহিত্য" সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সাহিত্যসমালোচনায় রক্ষণশীল দলের হলেও রসিক ব্যক্তি ছিলেন। সাহসিক মনোভাব তাঁর প্রবন্ধগুলিকে গতানুগতিকতা থেকে মুক্ত রেখেছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য-সমালোচনায় পুরাতন পন্থার প্রতি প্রবণতা দেখিয়েছেন। বাঙালীয়ানা তাঁর চরিত্রের একটি প্রধান লক্ষণ ছিল। নানা ভাবে বাঙালীর বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠত্ব তিনি প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন।

শশাঙ্কমোহন সেন ॥ তিনি সমালোচক হিসেবে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছিলেন। "মধুসূদনের অন্তর্জীবন", "বাণীমন্দির" তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়। বাহির থেকে সাহিত্যকে বিচার না করে অন্তরের গভীরে দৃষ্টিপাত করার রীতির উপরে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। মোহিতলালের সমালোচনা কোথাও কোথাও শশাঙ্কমোহন দ্বারা প্রভাবিত।

॥ পাঁচ ॥

রবীন্দ্র-পর্বের নাটক

সমকালীন এবং অনুজ নাট্যকারদের উপরে রবীন্দ্রনাথ গুরুতর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। তাঁর গান্ধারীর আবেদন, কর্ণকুন্তী সংবাদের চরিত্র-পরিকল্পনার প্রভাব ক্ষীরোদপ্রসাদ-অপরেশচন্দ্রের নাটকে কোথাও কোথাও সামান্য দেখা গেলেও তার পরিমাণ যেমন অধিক নয় তেমনি দীর্ঘস্থায়ীও নয়।

রবীন্দ্র-নাটক রঙ্গমঞ্চের জন্য নয় এই মন্ত্র নাট্যকারেরা ধ্রুব বলে ধরেছিলেন। গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের মঞ্চানুগ ধারাই সেখানে চলছিল।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলি এমন ব্যক্তিক যে সাধারণ মঞ্চে উপস্থাপিত হলে জনমনোরঞ্জনে সমর্থ হত না। তাই তার অনুসরণও বড় হয় নি। কাব্যনাট্য বা সংকেত-নাট্যের অনুসরণের নিদর্শন নেই

বললেই চলে। রবীন্দ্র-গীতিনাট্যের সঙ্গে প্রচলিত অপেরার কোন সম্পর্কই ছিল না। মঞ্চে যেসব প্রহসন অভিনীত হত তার সঙ্গে রবীন্দ্র রঙ্গনাট্যের জাতিগত কোন মিল ছিল না।

রবীন্দ্রনাথের রচনায় বাংলা নাটক কোন বিদেশী ধারার ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র না থেকে একটি স্বতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক সৃষ্টি হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উত্তরাধিকারের অভাবে বাংলা নাট্যসাহিত্যে এ ধারার পুষ্টি হয় নি।

পঞ্চম অধ্যায়

॥ সাম্প্রতিক কাল ঃ সংশয়, যন্ত্রণা ও বিদ্রোহ ॥

ভূমিকা

প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালে য়ুরোপীয় জীবনধারায় এবং চিন্তাজগতে গভীর পরিবর্তন সূচিত হল। উনবিংশ শতকের ভাবভাবনার অবশেষ নিঃশেষে পরিত্যক্ত হতে লাগল। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকবাদ স্থানকালের বোধকে উল্টে দিল। চিরন্তন কালের বোধ নস্যাৎ হয়ে গেল। গ্রহজগতের নূতন নূতন আবিষ্ক্রিয়া নিখিল বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে মানব-অস্তিত্বের তুচ্ছতাকে প্রতিষ্ঠিত করল। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মানবজীবন তথা জীবনমাত্রই বিশ্বপ্রবাহের "বাইপ্রোডাক্ট" বা অপ্রয়োজনীয় আকস্মিক সৃষ্টি বলে পরিচিত হল এবং ভবিষ্যতের "কোল্ড ডেথের" জন্য প্রতীক্ষা করা ছাড়া আর গত্যন্তর রইল না। পূর্ব শতাব্দীতে যে বিজ্ঞান-চেতনা মানব-কল্যাণের আশা-উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বাণীতে মুখর ছিল আজ তা সংশয়ে কম্পিত, হতাশায় ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ল। ফ্রয়েডের চিন্তা সচেতন ভাবনাকে কৃত্রিম এবং মগ্ন চৈতন্যকে সত্য বলে প্রচার করল। মানবের মনোরাজ্যের বিরাট এক অন্ধকার প্রদেশ আলোকোজ্জ্বল হল, কিন্তু আদিম প্রবৃত্তিতে তাকে পরিপূর্ণ দেখে সে শিউরে উঠল। অবশ্য যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতিতে, চিকিৎসা শাস্ত্রের আশ্চর্য অগ্রগতিতে, ভোগ্য পৃথিবীর সীমা অনেক বেশি আয়ত্তাধীন হয়ে পড়ায় বিস্ময় ও আনন্দের যে নূতনতর কোন জ্যোতি দেখা দিল না এমন নয়। কিন্তু ব্যবহারিকতার ঊর্ধ্বে উচ্চতর দার্শনিক চেতনায় এরা খুব গভীর অনুপ্রবেশ পেল না।

আশা-আনন্দ-সম্ভাবনার দিক থেকে এ যুগে সবচেয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলল ১৯১৭ সালের রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। উনিশের শতকে পরিকল্পিত মার্কসীয় সাম্যচিন্তার এই বাস্তব প্রয়োগে শোষণহীন, দারিদ্র্যহীন জীবনের আশা-উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আর কল্পনামাত্র রইল না। কিন্তু য়ুরোপের বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশ রক্তপাতে বিমর্ষ হল; সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি স্বাধীনতার সার্বিক অবলুপ্তির দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠল।

[illegible] সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন [illegible] উঠল।

য়ুরোপে ধনতন্ত্রের শ্মশান যন্ত্রণাই নিয়ে এল, এদেশে কিন্তু স্বাধীনতার স্বপ্ন তাকে শুধুমাত্র নেতিবাদী হয়ে থাকতে দিল না।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্য এই পটভূমিতে ভাব ও রূপে নূতন বাঁক নিল। ১৯৩০-এর কাছাকাছি সময় থেকে বাংলা সাহিত্য নবপর্বে প্রবেশ করতে থাকে। এই কালের ইতিহাসের ইঙ্গিতমাত্র আমরা লাভ করেছি, এর পূর্ণ তাৎপর্য উপলব্ধির সময় এখনও আসে নি। গল্পোপন্যাস এবং কবিতার ক্ষেত্রে কয়েকজন সত্যকার বড় শিল্পীর আবির্ভাব এই পর্বে ঘটেছে। কিন্তু বর্তমান গ্রন্থে তাঁদের সামান্যতম পরিচয় মাত্র দেওয়া হল। ভবিষ্যতের সাহিত্যের ইতিহাসে এঁদের বিস্তৃত আলোচনা স্থান পাবে।

॥ এক ॥

উপন্যাস ও ছোটগল্প

ভূমিকা

উপন্যাস-সাহিত্যে এই পর্বে কয়েকজন প্রকৃত বড় শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে। নানা সুরের চর্চায় বাংলা উপন্যাস বিচিত্রমুখী হয়ে উঠেছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনকাহিনী উপন্যাসকে কর্ম ও প্রবৃত্তিতে তরঙ্গিত করে তুলেছে। রাজনীতি-সমাজনীতির প্রত্যক্ষ প্রতিফলন একালের উপন্যাসে পড়েছে। পরিবারতন্ত্রের চর্চা পরিহার করে সাম্প্রতিক উপন্যাসে বৃহতের মধ্যে মুক্তি সাধনারও সূত্রপাত ঘটেছে। বিশ্লেষণের আধিক্যে উপন্যাসের দেহরূপের নবীনতায় (ঘটনাগত চমকের স্বল্পতায়, সুবলয়িত বৃত্তাকৃতি গল্পরীতির অভাবে) বাংলা উপন্যাসে নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে।

এই পর্বেই বাংলা ছোট গল্প বহু লেখকের সাধনায় বিচিত্রমুখী এবং রূপসিদ্ধ হয়ে উঠেছে।

পরশুরাম ॥ বাংলা ব্যঙ্গগল্পের প্রধানতম শিল্পী পরশুরাম। তাঁর গল্পগুলি "গড্ডলিকা", "কজ্জলী", "হনুমানের স্বপ্ন", "নীলতারা", "ধুস্তুরী মায়া", "কৃষ্ণকলি", "আনন্দীবাঈ" প্রভৃতি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়েছে। প্রথম দিকের গল্পগ্রন্থগুলির নিটোল সরসতা সর্বশ্রেণীর পাঠককে তৃপ্ত করেছে। ব্যঙ্গের সঙ্গে রঙ্গের সার্থক মিশ্রণে, সাময়িকের সঙ্গে শাশ্বত জীবন-প্রশ্নকে যুক্ত করায়,

স্থাপনে এদের স্থান উচ্চমানে সুনির্দিষ্ট। পরবর্তী কালে শিল্পীর জীবনজিজ্ঞাসা অনেক সংহত হয়েছে, আরও শাণিত হয়েছে; কল্পনার অজস্র প্রগলভতায় কিছু ভাঁটা পড়লেও বিলুপ্তি আসে নি; পল্লবিত কথাবিস্তার সংক্ষিপ্ত ও একাগ্র হয়ে উঠেছে। পূর্বের উচ্ছ্বসিত সরসতার প্রশস্ত খাত কিছু সঙ্কীর্ণ হলেও আরও অন্তর্গূঢ় হয়ে উঠেছে, অনেক কাঠিন্য পেয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়॥ সাম্প্রতিক উপন্যাস-সাহিত্যে তারাশঙ্কর পূর্ণশক্তিধর প্রতিভা। তারাশঙ্করের উপন্যাসে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তি আছে, জীবনজিজ্ঞাসার গভীরতা আছে। বিংশ শতকের শিল্পী হয়েও তারাশঙ্কর ঐতিহ্যানুসরণ থেকে বঞ্চিত হন নি। আধুনিক হবার কোন বিশিষ্ট সাধনা বা কামনা তাঁর নেই। উচ্চকণ্ঠ স্বাতন্ত্র্যঘোষণা বা রুগ্ন মানসিকতা, সৌখিন মজদুরি কিংবা কারুসর্বস্বতা থেকে তিনি সর্ব প্রযত্নে নিজেকে মুক্ত রেখেছিলেন ঠিকই। তবুও বর্তমান যুগের তরঙ্গসঙ্কুলতা তিনি উপলব্ধি না করে পারেন নি। সমাজের ও জীবনের সর্বস্তরের ক্ষয়িষ্ণুতা তাঁর কাছে গভীর বেদনার বার্তা বহন করে এনেছে, সমকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের পর্বে পর্বে তিনি সেই বেদনার সমাধান প্রত্যাশা করেছেন। আর একান্ত আধুনিক মননবলেই গণদেবতার অভিনন্দন রচনার ক্লান্তিহীন সাধনা করেছেন। কিন্তু বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা অপেক্ষা হৃদয়ের ভাবাকুলতায় আস্থা তাঁর বেশি বই কম নয়। বিশ্লেষণের মনোভূমিতে স্বেচ্ছাবিচরণ অপেক্ষাও গোটা প্রাণবন্ত মানুষের সাহচর্যই তাঁর অধিক কাম্য। অবক্ষয়িত বর্তমান তাঁকে জীবনবিরোধী না করে জীবনসন্ধানী করে তুলেছে। রাঢ়ের রুক্ষভূমির স্পর্শ, শ্রমজীবী চরিত্রের ভাস্কর্যনিপুণ গঠন এবং সুতীব্র আত্মানুসন্ধান তাঁর উপন্যাসকে দুর্লভ শিল্পোৎকর্ষ দিয়েছে। তাঁর উপন্যাস গ্রন্থের মধ্যে "ধাত্রীদেবতা", "গণদেবতা", "পঞ্চগ্রাম", "হাঁসুলী বাঁকের উপকথা", "নাগিনী কন্যার কাহিনী", "আরোগ্য নিকেতন", "উত্তরায়ন", "জবানবন্দী", "সপ্তপদী", উল্লেখযোগ্য। তাঁর প্রধান গল্প সঙ্কলন হল, "জলসাঘর", "বেদেনী", "কামধেনু"।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়॥ "পথের পাঁচালী", "অপরাজিত", "দৃষ্টিপ্রদীপ", "আরণ্যক", "আদর্শ হিন্দু হোটেল", "ইছামতী" প্রভৃতি উপন্যাস, এবং "মেঘমল্লার" "মৌরীফুল", "যাত্রাবদল" প্রভৃতি ছোট গল্প সঙ্কলন বিভূতিভূষণকে বাংলা কথা সাহিত্যেররাজ্যে অমরতা দান করেছে।

বিভূতিভূষণের ছোট গল্পগুলিতে পল্লীজীবনের ছোটপ্রাণ, ছোট কথার প্রাণবন্ত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর জীবনদৃষ্টির পরিচয় নিতে গেলে দেখা

যায় প্রকৃতিপ্রীতি স্বপ্নস্নিগ্ধ মোহাবেশে তাঁর জীবনের জটিলতাকে আচ্ছন্ন করতে চেয়েছিল। গ্রামবাংলার বৃক্ষপল্লবের শ্যামলতা আর নদীধারার পেলবতা তার নিত্য অভাবকেও এক ধরনের আবরণ দিয়ে নাগর বস্তীর কদর্যতা থেকে রক্ষা করে। বিভূতিভূষণের পল্লীপ্রকৃতি, শালমহুয়ার দিগন্তস্পর্শী অরণ্যানী এবং নীল আকাশের স্বপ্ন মেদুর হাতছানি একটা শোভা-সৌন্দর্য-শুচিতায় কামনার মোক্ষধাম অলকাপুরীতে পাঠককে নিয়ে গিয়েছে। যেন এই স্বপ্নলোকই এক মাত্র বাস্তব, যেন এরূপ হওয়াই উচিত ছিল, কি যেন হারিয়ে গেছে জীবন থেকে—এমনি একটি ভাবঘন রসব্যাকুলতা সৃষ্টি করে তিনি অত্যুচ্চ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু জীবনরসের চর্চা কোথায়? দূর থেকে ভেসে আসা তরঙ্গের ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুধু শোনা যায়, কিন্তু সেই ঢেউয়ের মাথায় চড়ে উল্লাসে বা আর্তনাদে আন্দোলিত হওয়া নেই। বিভূতিভূষণ পাঠককে জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করান নি, প্রকৃতিরস থেকে দৃষ্টিপ্রদীপের আলোয় অলৌকিক দেবযানে তাকে অভিসার করিয়েছেন। জীবন থেকে রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শের নির্যাস তিনি গ্রহণ করেছেন, জীবনকে গ্রহণ করেন নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ উপন্যাসে প্রেমেন্দ্র মিত্র যথেষ্ট সাফল্য দেখাতে পারেন নি, কিন্তু ছোট গল্পে তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পী। "মিত ভাষণে, বক্তব্যের সূক্ষ্মতায়, চরিত্রসৃষ্টিতে এবং বৈচিত্র্যে" বাংলা ছোট গল্পে তিনি অসাধারণ। তাঁর ছোট গল্প যেমন রূপনিষ্ঠ তেমনি নিগূঢ় সঙ্কেতে জীবনের বিষণ্ণতার উপস্থাপনে আশ্চর্য সার্থক।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পলেখক। তাঁর উপন্যাসের মধ্যে "দিবারাত্রির কাব্য", "পুতুল নাচের ইতিকথা", "পদ্মানদীর মাঝি", "শহরতলী", "চতুষ্কোণ", "অহিংসা", "সোনার চেয়ে দামী", "জীয়ন্ত" প্রভৃতি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। ছোট গল্প সঙ্কলনগুলির মধ্যে নাম করতে হয়, "অতসীমামী", "প্রাগৈতিহাসিক", "মিহি ও মোটা কাহিনী", "সরীসৃপ", "ভেজাল" এবং "ছোটবকুলপুরের যাত্রী"র। শেষদিকের রচনায় দলীয় মতের তীব্র উপস্থাপন এবং অকাল মৃত্যুর যবনিকা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণ-বিকাশে বাধা দিয়েছে, কিন্তু সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে, আধুনিক সভ্যতাহত জীবনের প্রতি নীরব, নিষ্ক্রিয় ও বিমূঢ় দৃষ্টিপাতে, কখনও বা শাণিত আঘাতে তার বর্ণাঢ্য মুখোসের অন্তরাল থেকে কশ্রী মুখাবয়বের উদ্ঘাটনে শক্তির বিচিত্র

লীলার পরিচয় তিনি দিয়েছেন। অবচেতনার গহনে তাঁর সঞ্চরণ, আপাতউদ্ভট সমস্যার মধ্যে তাঁর অবগাহন; কিন্তু এরই মধ্যে চিরকালীন স্বীকৃত সত্য-শিব-সুন্দরের অন্তরের ভেজাল আবিষ্কারে তিনি নীলকণ্ঠ। নাটকীয়তাকে পরিহার করে বক্রবাচনের ঔজ্জ্বল্যে, স্বল্প কথায় এবং বহুল ইঙ্গিতে বুদ্ধির সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করায় তিনি একক বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েছেন। যৌন-ক্ষুধার বিকৃতিও যে শিল্পরূপের অতুল স্বর্গে স্থানলাভের যোগ্য বিপুল শক্তি নিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাই-ই প্রতিষ্ঠিত করলেন। উত্তর জীবনের রচনায় তিনি সাম্যবাদী মতাদর্শে বিশ্বাসের কথা প্রকাশ করেছেন। তবে বহুক্ষেত্রে তা প্রচারধর্ম থেকে সমুন্নত হয় নি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়॥ "উপনিবেশ", "পদসঞ্চার", "বৈতালিক", প্রভৃতি উপন্যাস এবং "বীতংস", "ভাটিয়ালী", প্রভৃতি ছোট গল্প সঙ্কলন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিভার পরিচয় বহন করছে। উপন্যাসের ক্ষেত্রে মহাকাব্যিক পটভূমির দিকে তাঁর প্রবণতা লক্ষণীয়। ঐতিহাসিক রোমান্সের সঙ্গে বস্তুবাদী জীবনদৃষ্টির তীক্ষ্ণতা যুক্ত হয়ে তাঁর রচনাকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। ভাষার এরূপ উজ্জ্বল তীক্ষ্ণতা এবং রসনিটোল রূপ বাংলা সাহিত্যে প্রায় দুর্লভ। ছোট গল্প তাঁর হাতে আঙ্গিক সিদ্ধির উচ্চলোকে উঠেছে।

বনফুল, প্রমথনাথ বিশী এবং সুবোধ ঘোষ॥ বনফুল (বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) এবং সুবোধ ঘোষ গল্প ও উপন্যাস লিখলেও ছোটগল্পেই অধিক সাফল্য লাভ করেছেন। বনফুলের গল্পে আঙ্গিকের বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে জীবন সম্পর্কে তির্যক সিনিক উপলব্ধির। সুবোধ ঘোষের গল্প ভাষার কারুকার্য এবং জীবনজিজ্ঞাসার গভীরে অবতরণ করায় বিশিষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছে। প্রমথনাথ বিশী "জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার", "কেরী সাহেবের মুন্সী"র ন্যায় মহাকাব্যিক উপন্যাস রচনায় দুর্লভ সাফল্যের পরিচয় দিলেও তাঁর প্রতিষ্ঠা প্রধানত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গাত্মক ছোট গল্প রচনায়।

প্রবীণ লেখকদিগের মধ্যে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্রবোধ কুমার সান্যাল, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, জগদীশ গুপ্ত, গোপাল হালদার, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করতে হয়। নবীনদের মধ্যেও অনেকেই সম্ভাবনা নিয়ে এসেছেন। তাঁদের কথা কিছু পরবর্তীকালে লিখিত সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্যই মর্যাদার আসন পাবে।

॥ তুই ॥

কবিতা

ভূমিকা

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতা সৌন্দর্য, প্রেম ও আনন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রভাষ্যকে অস্বীকার করতে চাইল, কল্যাণবুদ্ধিকে ব্যঙ্গ করল, ধর্মবোধকে নির্বাসন দিল। পল্লীপ্রকৃতির প্রতি অতি আকর্ষণকে বলল ফ্যাসান। আর নাগরিক জীবনের ক্লান্তি-অবসাদ, যন্ত্রণা ও বেদনাকেই সত্য বলে বরণ করে নিল। প্রেমকে স্থাপিত করা হল দেহ-কামনার বাস্তব ভূমিকায়। নূতন দেবতা হলেন ফ্রয়েড এবং মার্ক্স। অনুভূতির আধিক্যের স্থানে মননের দীপ্তি প্রাধান্য পেল। সাম্যবাদী চিন্তা, বিষয়বৈচিত্র্যে বিশ্বপরিক্রমা, প্রথাবদ্ধ উপমা-উৎপ্রেক্ষার পথ পরিহার, ভাষার জটিলতাজনিত দুর্বোধ্যতা, গদ্যছন্দের অধিক ব্যবহার, তর্ককণ্টকিত পরিবেশের প্রতি আকর্ষণ, অভিনব চিত্রকল্প ও বাক্‌ভঙ্গির প্রয়োগ আধুনিক কবিতার দেহরচনাকে নূতন রূপে প্রতিষ্ঠিত করল।

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ "প্রথমা", "সম্রাট", "ফেরারী ফৌজ", "সাগর থেকে ফেরা" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের লেখক প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় জীবনজিজ্ঞাসার তীব্রতা ও গভীর আকুতি সে পরিমাণ নেই যতটা আছে উচ্চকণ্ঠ আত্মঘোষণা। শ্রমিকদের আত্মীয়তার যে কামনা তাঁর কবিতায় ভাষা পেয়েছে তা সৌখিনতাকে ছাপিয়ে ওঠে নি। বাক্‌ভঙ্গিতেও আধুনিক কালের লক্ষণ তাঁর কবিতায় অস্পষ্টভাবেই মাত্র উঁকি মেরেছে।

বুদ্ধদেব বসু ॥ "বন্দীর বন্দনা", "কঙ্কাবতী", "দময়ন্তী", "দ্রৌপদীর শাড়ী", "শীতের প্রার্থনা : বসন্তের উত্তর" প্রভৃতি কাব্য রচনা করে বুদ্ধদেব বসু সাম্প্রতিক কবিকুলের প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছেন। তাঁর কবিতার দেহ অতিমার্জিত। তবে দুর্বোধ্যতা এবং বাচনবক্রতা থেকে তাঁর কবিতা অনেকখানি মুক্ত। তিনি দেহকামনার রক্তরাগ সঞ্চারিত করেছেন তাঁর প্রেমকবিতায়। উপলব্ধির প্রগাঢ় তীব্রতা এদের মধ্যে প্রকাশিত। তবে বুদ্ধদেব বসু যে অন্তরের গভীরে রোমান্টিক কবির বেশি বয়সের কবিতায় তার প্রমাণ মিলছে।

জীবনানন্দ দাশ ॥ এই পর্বের সবচেয়ে শক্তিমান কবি জীবনানন্দ দাশ। "ঝরাপালক", "মহাপৃথিবী", "বনলতা সেন", "সাতটি তারার তিমির", তাঁর প্রধান কাব্যগ্রন্থ। কবির বাক্‌বিন্যাস পদ্ধতি এবং চিত্ররচনারীতি সাংকেতিকতায় পূর্ণ। য়ুরোপীয় অত্যাধুনিক শিল্পান্দোলনগুলির সঙ্গে এই রূপভঙ্গির সম্পর্ক আছে। জীবনানন্দের বিশিষ্ট কবি মেজাজটি একটু অস্পষ্ট কুহেলী ঘেরা বিষন্নতার রাজ্যে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে। মগ্ন চৈতন্যের ব্যাখ্যাতীত রহস্য তাঁকে হাতছানি দেয়, ইতিহাসের স্পষ্ট পদক্ষেপকে কবি লঘু কৌতুকভরে যেন অতিক্রম করে যান। তবে তার মধ্য দিয়েও হেমন্তের বাংলাদেশের গ্রামের ছবি ভেসে আসে, একটা বিশিষ্ট সিক্ত সুরে পাঠকচিত্তকে তা আকুল করে তোলে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ॥ "অর্কেস্ট্রা", "ক্রন্দসী", "সংবর্ত", "দশমী" সুধীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ। কবির বাক্‌রীতিতে ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য অত্যন্ত প্রকট। তাঁর কাব্যাঙ্গিকে ভাস্কর্যের গঠনকাঠিন্য লক্ষণীয়। অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার ও দুরান্বয় তাঁর ভাষাকে জটিল করে তুলেছে। কিন্তু এ জটিলতা বাহির থেকে আরোপিত একটা ফ্যাসান মাত্র নয়, কবির জীবনদৃষ্টিতে রয়েছে এই জটিলতার মূল। একদিকে ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতি অন্যদিকে বিশ্ববোধ, ইতিহাস ও সমাজচেতনা কবিকে বিষণ্ণ বেদনায় আহত করেছে প্রতিনিয়ত। এই যন্ত্রণাক্ষুব্ধ চিত্তই ভাষায় জটিল এবং শব্দে দুরূহ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর কবিতায়।

বিষ্ণু দে ॥ "উর্বশী ও আর্টেমিস", সন্দীপের চর", "অন্বিষ্ট", "নাম রেখেছি কোমল গান্ধার" বিষ্ণু দের প্রধান কাব্যগ্রন্থ। বিষ্ণু দের কবিভাষাও ছিল অত্যন্ত জটিল এবং দুর্বোধ্য। এই জটিলতা কি কবির অধ্যয়নের প্রাচুর্য এবং মননের বিচিত্রমুখী জটিলতারই ফল? তাঁর কবিতায় এই অধ্যয়ন গভীরতার চিহ্ন শব্দ ও চিত্রে রূপ পেয়ে পাঠকের বোধগম্যতাকে বাধা দিয়েছে। কিন্তু বিষ্ণু দের কবিতা ক্রমেই সরল হয়ে আসছে। তাঁর উপলব্ধিতে মার্ক্সবাদী গণপ্রীতি, সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস, শোষকদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু চিন্তার ও উপলব্ধির স্বাতন্ত্র্য এদের আদৌ প্রচারধর্মী হয়ে উঠতে দেয় নি। ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণ নিপুণতার মধ্যে রোমান্টিক অনুভূতির চকিত প্রকাশ তাঁর কবিতাকে রমণীয় করে তুলেছে।

অমিয় চক্রবর্তী ॥ অনুভূতি ও মননের সুন্দর সমন্বয় হয়েছে অমিয় চক্রবর্তীর কবিতায়। তিনি জ্ঞানসাধকের দূরত্ব নিয়েও বিশ্বপৃথিবীকে ভালবেসেছেন।

নিরাসক্তের এ আসক্তি তাঁর কবিতাকে বিচিত্র স্বরে পূর্ণ করেছে। "খসড়া", "একমুঠো", "মাটির দেওয়াল", "পারাপার" তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ।

এ পর্বের অন্যান্য বিশিষ্ট কবি হলেন অজিত দত্ত, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি। একান্ত তরুণদলের মধ্যেও বেশ কয়েকজন ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা নিঃসন্দেহে নিজেদের স্থান করে নেবেন।

॥ তিন ॥

নাটক

ভূমিকা

এই পর্বের নাট্যসাহিত্যের আধুনিকতা কাব্য বা কথাসাহিত্যের ন্যায় তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। উৎকর্ষের দিক থেকেও পূর্বোক্ত দুটি ধারাকে স্পর্শ করবার যোগ্যতা পায় নি বাংলা নাটক। মোটামুটিভাবে গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের ধারায়ই বাংলা নাটক চলেছে। তবে মঞ্চ ব্যবস্থার আধুনীকিকরণের সঙ্গে সঙ্গে নাট্য-আঙ্গিকে কিছু নবীনতা এসেছে। তাছাড়া অপেশাদারী নাট্যান্দোলন নাট্যপরিবেশনায় পেশাদারী মঞ্চের গতানুগতিকতাকে অস্বীকার করায় নূতন ধরনের অল্প দু'চারখানা নাটকের আবির্ভাব ঘটতে লাগল। তাছাড়া যে সব সাহিত্যিক মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত নন তাঁরা নূতন ধরনের নাটক রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। সমকালীন সাহিত্যধারার সঙ্গে যাঁদের সামান্যও সংযোগ আছে এমন নাট্যকারদের রচনায়ও কিছু নবীন রুচির স্পর্শ লাগল।

যোগেশ চৌধুরী ॥ "সীতা", "দিগ্বিজয়ী", "বাংলার মেয়ে" প্রভৃতি নাটকের রচয়িতা যোগেশ চৌধুরী চরিত্রসৃষ্টিতে কিছু গভীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন। অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর চরিত্রগুলিকে জটিল ও প্রাণময় করে তুলেছিল। এদের তাই অভিনয়সাফল্যের উপরেও কিছু সাহিত্যিক মূল্য স্বীকার্য।

মন্মথ রায় ॥ "একাঙ্কিকা"র নবআঙ্গিকে তিনি একরূপ সিদ্ধিলাভ করেছেন। প্রগলভ প্রবৃত্তি-সংক্ষোভ এই নাটিকাগুলির সংহত ও সংক্ষিপ্ত অবয়বে ঝড়ের কম্পন এনে দিয়েছে। "দেবাসুর", "কারাগার", "শ্রীবৎস" প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকে তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যর্থ সাধনাকে অনেকটা সফল

করে তুলেছেন। পুরাণ-ঘটনার পরিবেশে একালীন জীবনজিজ্ঞাসা ও চরিত্র-প্রত্যয় নিয়ে এসে তিনি নূতন প্রাণরস এদের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন।

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ॥ "গৈরিক পতাকা", "সিরাজদ্দৌলা", "ধাত্রীপান্না", "রাষ্ট্রবিপ্লব", "স্বামীস্ত্রী", "তটিনীর বিচার", "নার্সিং হোম" প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক রচনা করে শচীন্দ্রনাথ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। প্রথম দিকের ঐতিহাসিক নাটকগুলিতে স্বাদেশিকতা ও ভাবাতিরেক থাকলেও পরে তিনি সংহত অন্তর্দ্বন্দ্বসঙ্কুল মননপ্রবুদ্ধ নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কিছু আদর্শবাদের প্রভাব সত্বেও এদের সাফল্য স্বীকার্য। তাঁর সামাজিক নাটকগুলি একালের অতি জটিল সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে রচিত।

তুলসী লাহিড়ী ॥ "দুঃখীর ইমান", "পথিক", "ছেঁড়া তার" প্রভৃতি নাটকে তুলসী লাহিড়ী একদিকে প্রগতিশীল চিন্তাধারা অন্যদিকে সুপরিচ্ছন্ন নাট্যবোধের পরিচয় দিয়েছেন। সামাজিক সমস্যাজনিত সংঘাত এবং ব্যক্তির সমস্যা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁর নাটকগুলিতে অনেকটা সমন্বিত হয়েছে। বাঙালী মুসলিম সমাজের পটভূমিতে ব্যক্তির ও সমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব ছেঁড়া তার নাটকে প্রথম সম্যক নাট্যরূপ লাভ করেছে।

প্রমথনাথ বিশী ॥ প্রমথনাথ বিশীর "ঋণং কৃত্বা", "ঘৃতং পিবেৎ" এবং "মৌচাকে ঢিল" ব্যঙ্গ নাট্যের ইতিহাসে একক স্থানের অধিকারী। পুরাতন প্রহসনের রুচিহীনতা এদের স্পর্শ করে নি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথসুলভ স্মিতহাস্যও এখানে প্রত্যাশিত নয়। ব্যঙ্গের তীব্রতা এদের কটু আস্বাদে বিশিষ্ট করে তুলেছে।

বনফুল (বলাই চাঁদ মুখোপাধ্যায়) ॥ "শ্রীমধুসূদন" এবং "বিদ্যাসাগর" লিখে বাংলা জীবনীনাট্যের উদ্বোধন করলেন। "দশভাণ" প্রভৃতি গ্রন্থে বিবিধ নাট্য-আঙ্গিক নিয়ে তিনি পরীক্ষা করেছেন। তাঁর সূক্ষ্ম নাট্যচেতনা এই রচনাগুলির মধ্যে প্রকাশিত।

অন্যান্য নাট্যকারদের মধ্যে নামোল্লেখ করতে হয় জলধর চট্টোপাধ্যায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য, মহেন্দ্র গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রভৃতির।

॥ চার ॥

প্রবন্ধ-সাহিত্য

বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্য এই পর্বে পূর্ববর্তী পর্বের তুলনায় কোন বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য নিয়ে উপস্থিত হয় নি। বাংলা প্রবন্ধে যে বিষয়গুলির চর্চায় দুর্বলতা

ছিল তা এ পর্বেও দূরীভূত হয় নি। প্রধানত দর্শন, সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস চর্চায় বাংলা বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ আত্মনিয়োগ করেছে। রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনায় কিছু জোয়ার এসেছে। বিশেষত সাম্যবাদী চিন্তাধারা নিয়ে নানা গ্রন্থ লিখিত হয়েছে। ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিচারে এবং সাহিত্য সমালোচনায় মার্ক্সবাদীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

রম্যরচনা নামে একটি কথার বহুল প্রচলন হয়েছে। কিন্তু এর যথাযোগ্য সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া যায় নি। আত্মগৌরবী রচনার ক্ষেত্রে ভাবগভীরতা এবং সৌন্দর্যদৃষ্টির প্রভাব কমেছে, লঘু চটুলতা, আলাপচারী মনোভাব এবং ঠাট্টা ও রসিকতার ভাব প্রাধান্য পেয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর প্রভাবে বাংলা প্রবন্ধে মননশীল, বুদ্ধিচাতুর্যে দৃপ্ত, বাচনভঙ্গির প্রাখর্যে উজ্জ্বল একদল প্রাবন্ধিক দেখা দিলেন। কিন্তু অপর একদল চিন্তার মৌলিকতাকে এড়িয়ে শুধু ভাষার বক্রচতুর খেলাকেই প্রমথ চৌধুরীর উত্তরসূরীত্ব বলে চালাতে শুরু করলেন। বাংলা প্রবন্ধের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কাজেই সম্প্রতি নিশ্চিন্ত করে কিছু বলা কঠিন।

বিষয়গৌরবী প্রবন্ধ রচনায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুশীল কুমার দে, রাজশেখর বসু, নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন সংস্কৃতির নানা দিকে দৃক্‌পাত করেছেন; শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দাশগুপ্ত, প্রমথনাথ বিশী সমালোচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন; রাধাগোবিন্দ নাথ দার্শনিক প্রবন্ধে মনীষার পরিচয় দিয়েছেন; বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় রাজনৈতিক প্রবন্ধে সফল হয়েছেন। প্রমথ চৌধুরীর ধারার লেখকদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান পেতে পারেন অতুলচন্দ্র গুপ্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। নানা জাতীয় আত্মগৌরবী সৃজনধর্মী প্রবন্ধে বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, মুজতবা আলী, মনোজ বসু, প্রবোধ কুমার সান্ন্যাল, কুমারেশ ঘোষ, রঞ্জন, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

নির্ঘণ্ট

হ

ক্ষ